আমার তরুণ বন্ধুদের উদ্দেশে

ভূমিকা

সাহিত্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আমার নানা প্রবন্ধ ও ভাষণের এক নির্বাচিত সঙ্কলন এই গ্রন্থ। প্রত্যেকটির রচনাকাল সূচিতে নামের পাশে দেওয়া হল। কোনো কোনো কথার কিছু পুনরাবৃত্তি যে বিভিন্ন রচনায় আছে সে সম্বন্ধে আমি অবহিত। এক সাধারণ প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে লেখার জন্যে এটা কিয়ৎ পরিমাণে ঘটেছে। তাছাড়া, কোনো কোনো বক্তব্যের উপর জোর দেবার জন্যেও আমি পুনরুক্তি করেছি হয়তো আরো একটু ব্যাখ্যাসহ। সমস্ত লেখা একসঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারলে কিছু অদল-বদল করা যেত, কিন্তু বই ছাপার তাড়াহুড়োয় তার সময় আমি পাইনি। তবু আমি আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকা একে ক্ষমার অযোগ্য ত্রুটি ব'লে মনে করবেন না এবং আমার সমগ্র বক্তব্য বিবেচনা ক'রে দেখবেন। কিছু মুদ্রণ-প্রমাদও হয়েছে। সেজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

সূচি

সাহিত্যে স্বজনক্রিয়া : উৎস এবং অববাহিকা

জানি আমি বিপদের জমিতে পা বাড়াচ্ছি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অস্ত্রধারী ব্যূহ রয়েছে আমার সামনে, পাশে। তবু আমি এক নিরস্ত্র সহজ ভাবনাকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আমার মস্তিষ্ক এক্ষেত্রে শিশুর মতোই সরল ও অপরিণামদর্শী। অন্তত আমি চাই সে অমনভাবেই এগোক।

যাকে বলা হয় স্বজনী সাহিত্য, ইংরিজিতে creative literature, তার উৎসমুখের দিকে আমার যাত্রা। অর্থাৎ এ সাহিত্যের উৎসরণ কীভাবে হয়, কোথা থেকে হয়, তাই খুঁজে দেখা। নানা বিভাগ আছে এ সাহিত্যের, যথা কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক। কোন্ সেই একভূমি যেখানে এদের সকলের শিকড় গাড়া থাকে এবং যে-জন্যে এরা একই গোষ্ঠীভুক্ত হয়? আর একটা শ্রেণী আছে যার নাম সাহিত্য-আলোচনা বা সাহিত্য-সমালোচনা। তাকেও মূলত স্বজনী সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলব না কেন? ওদের নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে করতে তার কাছেও যে পৌঁছোনো যাবে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কাব্য সম্বন্ধে সমস্যাটা তেমন জটিল নয়। কাব্য বলতে বোঝাচ্ছি সেই কাব্য যা লিরিক নামে প্রচলিত, কাহিনী-কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এসব নয়। লিরিক কবিতাকে লেখকের দৃষ্টি ও অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে স্বষ্টি করে, অর্থাৎ দৃষ্ট ও অনুভূত বিষয়ের সঙ্গে লেখক-সত্তার ব্যবধান থাকে না। অভিজ্ঞতার অভিঘাত (impact) লেখকের মনের উপর যেমন যেমন পড়ে, তেমন তেমন রূপ নেয় কবিতায়। তাতে পূর্ব-পরিকল্পনা থাকে না। অথবা একটা কবিতা লিখব, এই সঙ্কল্প নিয়ে বিষয়বস্তুর সন্ধানে বেরোতে হয় না। যদি কাউকে তা করতে হয় তাহলে এটাই বোঝা যায় যে, তিনি কবি মনের অধিকারী নন। কেন না, বাইরের সঙ্গে অথবা বলা যায় মানুষী অস্তিত্বের যে-কোনো দিকের সঙ্গে সংস্পর্শই কবি-মনকে কথা বলতে প্রবৃত্ত করায়। সে-মন যখন কথা বলে তখন বহু মনকে প্রতিফলিত করে বলে, না, শুধু একলার কথাই বলে, সেটা আলাদা প্রশ্ন। সেখানে উপলব্ধির গভীরতা ও ব্যাপকতার প্রশ্ন নিহিত, অর্থাৎ প্রতিভার ভূমিকা তাতে জড়ানো। কাব্যস্বষ্টিতে সচেতনতা এবং চেতনার অভাবও অন্যতম

লক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। কিন্তু সে-ও এক আলাদা প্রশ্ন। চেতনা, বরং বলা উচিত আত্মচেতনা যার আর এক পিঠ হল পর-চেতনা, তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ভর করে এক দিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবর্তনে লেখক-ব্যক্তির মানসিক অবস্থিতির উপর এবং অন্যদিকে সমাজ যে-অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা থেকে উপলব্ধ জ্ঞানের উপর। এই জ্ঞানকেই ইতিহাসের এক একটা সময়ে কোনো বিরাট প্রতিভা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন এবং প্রয়োগের উপযোগী করে তার আকার দেন। যেমন, বর্তমানকালে মার্কস্‌, লেনিন এবং মাও-ৎসে তুং। কিন্তু এসব পরের পর্ব। আমি বলছি কবিতার উৎসরণের কথা। এই উৎসরণ এক বিশুদ্ধ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক এই অর্থে যে, বিশ্বজগতের সঙ্গে কবি-মনের তথা কবি-হৃদয়ের ব্যবধানহীন সংস্পর্শ থেকে তার জন্ম। সেখানে পরিকল্পনা, অধীত বিদ্যা, অর্জিত জ্ঞান, আহরিত তথ্য ইত্যাদির ভূমিকা নেই, অন্তত উৎসরণের মুহূর্তে নেই। নির্মাণের স্তরে তারা আসতে পারে, তবে কবিতার ক্ষেত্রে না আসলেও চলে।

বিদ্যানির্ভরতাহীন, জ্ঞাননির্ভরতাহীন সত্তা যেখানে পৃথিবী ও মানুষের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই কবিতার জন্মস্থান। শিল্প-সচেতন যে-নির্মাণ, তার মধ্যে বুদ্ধি এবং হয়তো অর্জিত জ্ঞানবিদ্যার ভূমিকা থাকে, সে-কাজটা আসে পরে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও এই বুদ্ধি ও জ্ঞানের ভূমিকা যদি এমন হয় যে, পাঠককে তা ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এবং মানে বের করার জন্যে তার কোমর বাঁধা ছাড়া আর উপায় থাকে না, যেমন কোনো জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের বেলায় ঘটতে পারে, তাহলে সে-রচনাকে সত্যিকার কবিতা বলব কি করে? কেননা, এক গভীর সহমর্মিতা সৃষ্টিই তো কবিতার মূল ক্রিয়া। সেটা কি ঐভাবে হয়? ব্যাপক স্তরে দেখলেও তা বোঝা যায়। যখন কোনো জাতের মনের প্রকাশ প্রধানত যুক্তি বুদ্ধি ও জ্ঞানের পথ ধরে, তখন তার কবিতার রূপ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। সতেরো আঠারো শতকের ফ্রান্স কি তার এক নিদর্শন নয়? শুধু দানের ক্ষেত্রেই নয়, গ্রহণের ক্ষেত্রেও যুক্তির নির্দেশ এবং বিধিবিধানের বেড়াজালের মধ্যে জাতির সংবেদনশীলতা তখন অন্ধকারে লুকোয়। কবিতার সহমর্মী হবার জন্যে তার মন তখন সাড়া দেয় না (অবশ্য মনোভাবের এই পরিবর্তন মূলত সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার পরিবর্তনেরই প্রতিফলন)। নইলে ষোড়শ শতাব্দীর সর্ব-বন্দিত প্রতিভা রঁসার কেন অবলুপ্ত হয়ে গেলেন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে? কেন তাঁকে পুনরুজ্জীবনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে

হল ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী রোমান্টিক সাহিত্য-কাল পর্যন্ত যখন আবার দেখা দিল হৃদয়াবেগ, মানুষের সঙ্গে রক্তমাংসের আত্মীয়তার অনুভূতি এবং নিসর্গ সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া? বাস্তবিক, মস্তিষ্কের খেলা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, এমন ভয়ঙ্কর যে, কবিতার অপমৃত্যু ঘটে যায়। কবিদের উদ্যম তখন আর পাঠকের মনকে বাজিয়ে দেয় না, তাকে হয় গোলকধাঁধার পথ খুঁজতে লাগিয়ে দেয়, নয় তাকে দিয়ে ফর্মুলা ভাবায়।

আমি কিন্তু এমন কথা আদৌ বলতে চাইছি না যে, কবিদের পক্ষে জ্ঞান ও বিদ্যা নিষিদ্ধ অথবা কারো জ্ঞান ও বিদ্যা থাকলে তার দ্বারা কবিতা লেখা হবে না। এ দুয়ের অর্জন সকলের পক্ষেই কাম্য, সুতরাং কবিদের পক্ষেও। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, কবিতার উদ্ভাসে তাদের ভূমিকা নেই। তাহলে কবিদের মননহীন হলেও চলে? মোটেই না। বরং আমার বিশ্বাস, বিনা মননে কবিতায় বেশি কিছু করা যায় না। স্বভাবকবি হওয়া খুবই শ্লাঘার বিষয়, তা স্বাভাবিক ক্ষমতারই লক্ষণ; কিন্তু নিছক স্বভাবকবিত্ব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না, এক ছোট বৃত্তে আটক হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। কবিতা সম্বন্ধে চিন্তা কবির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সব সময়ের চিন্তা। কবিতার দ্বারা ভাবিত না হলে নতুন নতুন আবিষ্কার কী করে সম্ভব? এ এক একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা, বলা যায় এক গোপন গবেষণা। এখানে জ্ঞান ও বিদ্যার কিছু ভূমিকা আছে মনে হয়, কিন্তু তা পরোক্ষভাবে। মননের সংগঠনে তা থাকতে পারে, কিন্তু কবিতার প্রতিমাগঠনে তাদের হস্তাবলেপ মারাত্মক।

কবিতার সমস্যাটা অপেক্ষাকৃত সরল মনে হয় এই কারণে যে, তার সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদিকে সরাসরি জড়াবার দরকার হয় না। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ অমন নিষ্কণ্টক নয়। উপন্যাস, গল্প ও নাটক রচনার বিষয় অনুযায়ী জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনের যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। তথ্য সংগ্রহ তো একটা বড় প্রাথমিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। রচনার পরিকল্পনা প্রস্তুত করাও লেখকের এক প্রধান দায় সেখানে। এদিক থেকে মহাকাব্য খণ্ডকাব্য এই শ্রেণীর রচনার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু কাজের এই যে প্রস্তুতি, এটা কি পরের পর্ব নয়? সত্যিকার সৃষ্টিশীল মন নিয়ে আমি যখন কোনো উপন্যাস বা গল্প বা নাটক বা কাহিনী-কাব্য লিখতে উৎসুক হই, সেই প্রথম মুহূর্তে জ্ঞান বা বিদ্যা বা পরিকল্পনা আমাকে উদ্রিক্ত করে না, উদ্রিক্ত করে আমার নিজের দৃষ্টি এবং অনুভূতি, আমার অন্তরের এবং বাইরের অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ এখানেও মূল

সেই একই : আমার নিজস্ব সত্তার উপর পৃথিবী ও মানুষের অভিঘাত। আমার লিখবার তাগিদ তা থেকেই প্রথম আসে। আমার দৃষ্ট এবং অনুভূত বিষয়কে এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমার বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে স্থাপন করবার জন্যে তখন আমি পরিকল্পনা করি, তথ্য আহরণ করি, যে-জ্ঞান আমার রচনার নির্ভর হবে তা অর্জন করি। বিশেষ বিষয় অনুসারে উপন্যাস গল্প নাটকের পক্ষে এই জ্ঞান অপরিহার্য। এটাই কাজের স্বাভাবিক অনুক্রম। এর উল্টোটা নয়। অর্থাৎ আমি একটা উপন্যাস বা নাটক লিখব বলে শূন্যে মনস্থির করে তারপর বইয়ের পাতায় বিষয় ও বক্তব্য খুঁজে বেড়াই না। অবশ্য কেউ কেউ যে এরকম করতে পারেন না বা করেন না তা নয়। কিন্তু সে-রকম লেখা কি সত্যিকার লেখকের লেখা হয়? তার কৃত্রিমতা এবং অসার্থকতা কি যে-কোনো শিল্পবোধ-সম্পন্ন পাঠকের চোখে প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না?

আর একটা ব্যাপারও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। রচনার এই যে প্রকারভেদ, যথা কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, এও তো এক স্বভাবজ ঘটনা। কোন্ লেখক কী লিখবেন তা তাঁর সৃজনমুখী প্রবণতা ভেতর থেকেই ঠিক করে নেয়। তাঁর বিদ্যা বা জ্ঞান তা ঠিক করে দেয় না। যে-লেখক-মনের উপর অভিঘাত পড়ে, সেই মনই একটা বিশেষ 'ফর্ম' স্বাভাবিকভাবে বেছে নেয়। বরং আমার মনে হয় বলা উচিত অভিঘাতটাই এক একজনের ক্ষেত্রে প্রকাশের এক একটা বিশেষ 'ফর্ম' তৈরি করে দেয়। এ যেন একটা ধাতুর পাতের উপর বালি রেখে তার ধার ঘেঁষে বেহালার ছড় টানা, যার ফলে বালিকণাগুলো আপনাআপনি বিশেষ নক্সায় বিন্যস্ত হয়ে যায়। অবশ্য কোনো অনড় নিয়ম এখানে নেই। একজনের ক্ষেত্রেই একাধিক 'ফর্ম' তৈরি হতে পারে মনোভাব, বিষয় ও সময়ের তারতম্য অনুসারে। আবার ঐ কারণ ছাড়াও সঠিক প্রকাশের গরজে একজনই এক প্রকার থেকে অন্য প্রকারে চলে যেতে পারেন।

আমরা অবশ্য জানি যে, সাহিত্যে মানুষের প্রথম সৃষ্টিই ছিল কাব্য। নিসর্গের দিকে তাকিয়ে যা সে ভেবেছিল যা অনুভব করেছিল তারই স্বতোৎসারণ। তা প্রথম আশ্রয় করেছিল মানুষের সঙ্গীত-স্বভাবকে, তারপর আলাদা করে মহাকাব্যের ঘর গড়েছিল। সমস্ত প্রকারেরই বীজ তার মধ্যে ছড়ানো ছিল। মহাকাব্যে ব্যক্তিগত অনুভব ও কল্পনা, দীর্ঘ কথন, কাহিনী-বিস্তার, সবই আছে। তা যেন কবিতা নাটক উপন্যাসের এক আদিম সহাবস্থান। সর্বপ্রকার সৃজনী সাহিত্যের মূল যে এক, এ কি তারই এক প্রমাণ নয়?

তারপরে এবং আজ পর্যন্তও তো দেখতে পাই একটা নির্দিষ্ট প্রকারের রচনায় অন্য প্রকারের সংমিশ্রণ, কখনোবা প্রাধান্য। যেমন, রবীন্দ্রনাথের নাটকে কাব্য, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নাটক, বিভূতিভূষণের উপন্যাসে কাব্য। বিদেশী সাহিত্যে এরকম নিদর্শন তো ভূরিভূরি। সে যাই হোক, প্রকার হিসেবে এই যে স্পষ্ট পৃথকীকরণ, এটা নিশ্চয় ঘটেছে সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ফলে। এক এক সৃষ্টিশীল মন এক এক উপায় অবলম্বন করেছে।

উপন্যাস নাটক ইত্যাদি রচনার কাজে জ্ঞানবিদ্যা অর্জনের কথা যখন উঠল তখন বই পড়ার বিষয়ে একটু ফিরে আসা যাক। সৃজনশীল লেখকেরা এমনিতে বই পড়বেন না, নিজের অভিজ্ঞতা সম্বল করে শুধু লিখে যাবেন এমন সিদ্ধান্ত আমি করছি না। সেটা হাস্যকর। কেন না, কোনো লেখক তো ইতিহাসে কোনো বিচ্ছিন্ন একক মানুষ নয়। এক ধারাবাহিকতায় সে স্থাপিত। তার নিজের অবস্থিতি এবং তার পরিপার্শ্ব তার আত্মপ্রকাশের পটভূমি। সে সম্বন্ধে সচেতনতা তার নিজের গরজেই আসে এবং আরো জানার চেষ্টা ঐ একই গরজে স্বাভাবিক তা বই পড়েই হোক বা দেখে আর শুনেই হোক। এছাড়াও লেখকের পক্ষে বই পড়ার আর একটা তাৎপর্য আছে। তা হল অভিঘাতের ভূমিবিস্তার। অন্যের অভিজ্ঞতার অঙ্কুশ তার মনকে মুহূর্তে সক্রিয় করে তুলতে পারে। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা পরোক্ষ। পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তা মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে তার কোনো মূল্য নেই যদি না তা পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে যুক্ত হয়। তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি যুক্ত হয় তবে তা এমন অভিঘাত সঞ্চার করতে পারে যা তাকে নিজের সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করবে। কাব্য উপন্যাস নাটক সব বিভাগেই এরকম ঘটা সম্ভব। অভিজ্ঞতার এই অন্বয় যেখানে হয় না সেখানে ঐ বইয়ের অভিজ্ঞতা শুধু পণ্ডিতীজ্ঞানের একটা বিষয় হয়ে থাকবে অথবা সুযোগ হলে বক্তৃতা দেবার। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি। ফরাসী কবি র‍্যাঁবোর একটি কবিতা আছে: "নেশার সকাল"। এ কবিতায় তিনি মানুষী অস্তিত্বকে যে-দৃষ্টিতে দেখছেন এবং যে-ভাবনায় ভাবিত হচ্ছেন তা এক hallucination-এর মতো, শব্দের ওলটপালটে যেভাবে এক রহস্যময় পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করতে চাইছেন তা সাধারণ বোধের অন্তর্গত নয়। এ কবিতা যখন আমি পড়ি তখন কবির ক্ষমতায় বিস্মিত হই, তবে অনেক দূর পর্যন্ত তা আমাকে নাড়ায় না, কিন্তু আমাকে আমূল নাড়িয়ে দেয় শেষ দুই বাক্য যখন র‍্যাঁবো বলেন: "আমরা জানি

কীভাবে আমাদের জীবন দিতে হয় প্রত্যেক দিন সম্পূর্ণভাবে। / এটা হল খুনীদের কাল।" এই উচ্চারণ সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের এবং প্রত্যেক দিনের অভিজ্ঞতাকে আলোড়িত করে তোলে এবং আমি যদি লেখক হই তবে তা আমার সৃজনক্রিয়ার একটা পথ খুলে দেয়। শুধু কাব্য নয়, অন্য কোনো বিষয়ের গ্রন্থও, যেমন ইতিহাস বা দর্শন বা মনস্তত্ত্ব, এই সৃজন-উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারে যদি তা পাঠকের (যিনি লেখকও) দৃষ্ট ও অনুভূত বাইরের ও ভেতরের অভিজ্ঞতায় অনুরণন তোলে।

এই পর্যন্ত আসার পর আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমি হয়তো ইতিমধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে ফেলেছি। কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন পাণ্ডিত্যকে নানাভাবে কটাক্ষ করাই বুঝি আমার উদ্দেশ্য। না, তা নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি, সৃজনের এবং পাণ্ডিত্যের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। তারা যেন সৌরমণ্ডলে বিচরণশীল দুই উজ্জ্বল-দূর নক্ষত্র, ক্বচিৎ কখনো তারা কাছাকাছি আসে, যা আনন্দের বিষয়, কিন্তু না এলেও ক্ষতি নেই।

এবার যেখানে আমি প্রবেশ করছি সেটাই সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল এলাকা। সাহিত্য-আলোচনা বা সাহিত্য-সমালোচনা এমন এক জায়গা যার চৌহদ্দি অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় কাঁপতে থাকে। এত দৃষ্টিকোণ এত পদ্ধতি এত তত্ত্ব এত সূত্র এত অভিমতের শব্দ এখানে যে, আমার মতো জ্ঞানহীন লোক প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। সুতরাং আমার সরলভাবে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। আমি এই বুঝি, দেখে দেখেই বুঝি যে, সাহিত্য-সমালোচনায় কোনো সাহিত্যিক গুণ বা অগুণ প্রমাণ করা যায় না, সুতরাং এমন কোনো রায় দেওয়া যায় না যা সর্বগ্রাহ্য হতে পারে। একজনের যুক্তি আর একজন খণ্ডন করেন, একজনের রায় অন্যের হাতে নাকচ হয়। অমুক কী বলেছেন তমুক কী ভাবছেন, এসব অবশ্য অনবরত বলা হয় (যদিও তার চেয়ে আমি কী ভাবছি বলা আরো প্রাসঙ্গিক), কিন্তু তাতে সত্যিই কি কিছু আসে যায় সিদ্ধান্তের দিক থেকে? তবে এর একটা উপকারিতাও আছে। এই তর্ক, বিবিধ সমর্থক ও বিরোধী মতামতের প্রচার এবং নিত্যনতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে আবহাওয়াটা বেশ জীবন্ত থাকে, এবং অতীত ও সমকালীন চিন্তাবিদ্‌দের বাক্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বলে আমাদের জানার সীমানা বাড়ে, এবং আমাদের বুদ্ধিতেও শান পড়ে। এটা ভালো, অবশ্য যদি তার দ্বারা আমার নিজের চিন্তা রুদ্ধ হয়ে না যায়। সেই দুর্ঘটনা অনেক সময়ই ঘটতে দেখি, এই যা দুঃখ।

সাহিত্য-আলোচনায় যদি কোনো সত্যকে মূর্তভাবে প্রমাণিত না করা যায়, তাহলে আগ্রহের বিষয় যা থাকে তা তো লেখকের দৃষ্টির উপলব্ধির অভিনবত্ব, সে-অভিনবত্ব প্রকাশের রূপ এবং তার সাড়া জাগাবার ক্ষমতা। অর্থাৎ আমরা সৃজনী সাহিত্যের কাছ থেকে যা পাই অথবা প্রত্যাশা করি। তবে সাহিত্য-আলোচনার একটা শ্রেণী আছে যার সম্বন্ধে এসব কথা প্রযোজ্য নয়। তা হল গবেষণামূলক অথবা ঐতিহাসিক আলোচনা। সেখানে প্রধান ভূমিকায় থাকে শ্রম, পাণ্ডিত্য এবং তথ্যবিচার-শক্তি। যাঁরা জ্ঞানবিদ্যা চর্চায় নিয়ত, এটা বিশেষভাবে তাঁদের কর্মক্ষেত্র। সে জন্যে প্রধানতঃ অধ্যাপকরাই এই অঞ্চলের অধিপতি। অতীত এবং বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কিত অনেক অজানা তথ্য তাঁরা আবিষ্কার করেন, অনেক হারানো সম্পদ উদ্ধার করেন, অনেক সুদূর কীর্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁদের উদ্যম আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিক, আমাদের কী আছে কী নেই সে সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করুক, এ আমরা সব সময় কামনা করব। কিন্তু এই উদ্যম জীবন্ত সাহিত্যকে বিষয়বস্তু করলে অনেক সময় মুশকিল দেখা দেয়। কারণ কোনো বিধিবদ্ধ ধারণা বা সূত্রের বা শেখা মাপকাঠির প্রয়োগক্ষেত্র এটা নয়, এটা সংবেদনার ক্ষেত্র, যে-সংবেদনা সহজাত এবং যা কোনো বৃত্তির উপর নির্ভরশীল নয়। সাহিত্য-সমালোচনার অন্তর্গত পুস্তক-পরিচয় ও লেখক-পরিচয় ব্যাপারটাকেও এইভাবে দেখা যেতে পারে। যতক্ষণ তা পরিচয়দানে সীমাবদ্ধ ততক্ষণ তা শিরোধার্য। কিন্তু যখনই তা জ্যামিতির প্রতিপাদ্যের মতো 'অতএব'-এ যেতে চায় তখনই সমস্যা দেখা দেয়। কেননা, তখন 'অতএব'-এ 'অতএব'-এ কাটাকুটি শুরু হয়। তথ্য আর যুক্তি কারো হাতে তো কম থাকে না। অর্থাৎ এটাই স্পষ্ট হয় যে, তত্ত্বগত বা সূত্রগত সিদ্ধান্ত বাস্তবে আমাদের কোথাও পৌঁছে দেয় না। এমন কি কোনো দৃষ্টি-কোণ বা বিচার-দর্শন যদি যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, তবুও সাহিত্যগুণের নির্ণয়ে খুব সাহায্য হয় না। কোনো বিশেষ সাহিত্য বা রচনার উৎপত্তির কারণ, তার পটভূমি, তার অন্তর্নিহিত ভাব বা ভাবনা ইত্যাদির হদিস সে দিতে পারে, কিন্তু সে কিছুতেই বলে দিতে পারে না কোথায় তা সাহিত্য হয়ে উঠল। প্রকাশের রূপে অভিভূত হবার, শব্দের গূঢ় আবেদনে সাড়া দেবার অনুভব যার থাকে তার থাকে, সেই অনুভব বা সংবেদনার আবিষ্কারযাত্রায় পাণ্ডিত্য বা তত্ত্বদর্শন অবান্তর।

সাধারণভাবে সাহিত্য আলোচনার বেলাতেও ঐ একই কথা আসে।

যদি কিছু অকাট্যভাবে প্রতিপন্নই না করা গেল, তবে কোন্ দিক থেকে সে-আলোচনার তাৎপর্য বুঝব? আমার ধারণা, তাৎপর্য তার সৃজন-ধর্মে। সৃষ্টিশীল মনই একমাত্র সেইরকম রচনার জন্ম দিতে পারে। সে-মনের উপর যখন জীবনের অভিঘাত পড়ে, তখন সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করে সে তার নিজের দৃষ্টি ও উপলব্ধির কথা বলে এবং এমনভাবে বলে যা অন্য কারো কথাও হয় না, ভঙ্গিও হয় না। সে তার স্বকীয় সৃজন। এ রকম মনের অধিকারী যিনি, তিনি পণ্ডিত বা অধ্যাপক হতেও পারেন, না হতেও পারেন। এ প্রশ্নই সেখানে আসে না। উনিশ শতকের ফ্রান্সে তো বাঘা-বাঘা সব 'বিশুদ্ধ' অধ্যাপক সাহিত্য-আলোচক হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। কিন্তু ক'জন আজ যায় তাঁদের কাছে? সকলেই তো ভক্তের মতো যায় দেখি য়্যুগো, বোদল্যার, মালার্মের কাছে, এমনকি বালক র‍্যাঁবোর কাছেও। এঁরাও কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারেন না, কিন্তু পাঠককে বিচলিত করতে পারেন, অভিভূত করতে পারেন। এবং অন্যের সৃজনশীলতার অনুরণিত আবিষ্কারেও তাঁরা আমাদের সঙ্গী করে নেন। সাহিত্যের সেই অনির্বচনীয় আস্বাদ আলোচনা-সাহিত্যের প্রাণ।

গদ্য প্রসঙ্গে

এক

'কি কষ্ট হচ্ছে তোমার ?'

'আমার ভয় হচ্ছে আমার কথাগুলো না ব্যাকরণে বেঠিক হয়ে যায়।'

এ-সংলাপ দুই বন্ধুর মধ্যে, যাঁদের একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে ঝিদ। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। কথাই যাঁর অস্তিত্ব, আর অল্প সময় পরে তিনি চিরকালের মতো নীরব হয়ে যাবেন। অন্তিম যন্ত্রণা সম্বন্ধে বন্ধুর ব্যাকুল প্রশ্নের এই উত্তর তাঁর মুখ থেকে শোনা গেল। আঁদ্রে ঝিদের লেখা যাঁরা ফরাসীতে পড়েছেন তাঁরা জানেন এবং অন্যেরা হয়তো অনুবাদেও আন্দাজ করতে পারেন কী অনন্য তাঁর ভাষা। সৌষ্ঠব এবং উষ্ণতার সম্মিলন সে-ভাষায়। তা যেন এক প্রাণবন্ত ভাস্কর্য। ব্যাকরণ-চিন্তা বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি, তার কোনো সংক্রমণ তাতে নেই। অর্থাৎ নীরসতা বা যান্ত্রিকতা বা স্থূলতা বা আড়ষ্টতা বা অসমতা, এ-রকম কোনো লক্ষণ। অথচ মৃত্যুকালেও তিনি তাঁর বাক্যের ব্যাকরণ নিয়ে ভাবিত। এটা কেমন করে হয় ? এই প্রশ্ন নিয়ে একটু বিচলিত হলে আমাদের কিশোর-বয়সী বাংলা গদ্যের পদক্ষেপে বোধ হয় কিছু সাহায্য হয়, কেননা বিবিধ জরুরী বিষয় এতে জড়িত এবং কৈশোরেই বিপথগমনের লোভ আশেপাশে টানতে শুরু করে।

ঝিদের এই ব্যাকরণ-আনুগত্যের ব্যাখ্যা কী হতে পারে ? শুধু ঝিদ নন, ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফরাসীরা এ-বিষয়ে প্রখরভাবে সচেতন। তার নিদর্শন পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায়। সমকালীন রচনায় শব্দপ্রয়োগ বাক্যগঠন ইত্যাদি নিয়ে অনেক সাময়িকপত্রেই নিয়মিত আলোচনা করা হয়। শব্দ ও বাক্যের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা এবং অভিনবত্ব সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ বিচার-বিবেচনা সেখানে চলতেই থাকে। ঝিদ নিজেও তাঁর দিনপঞ্জিতে তা করেছেন এবং নিজেও অন্যের বিচারের বিষয় হয়েছেন। বিরুদ্ধতা ও সমর্থনের বেশ এক জীবন্ত আবহাওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বিতর্ক নীরস নয়, অনেক সময় তা

রচনা হিসেবেই রীতিমতো উপভোগ্য। যেমন, ল্য ফিগারো লিতেরের (Le Figaro Littéraire)-এর সাপ্তাহিক সংখ্যায় যে-ভদ্রলোক ছদ্মনামে লিখতেন, তাঁর বিশ্লেষণে মিশত কৌতুক। বাঁকা ভঙ্গি তাঁর আলোচনাকে মজাদার করে তুলত।

ঝিদের ভাষা-মনস্কতা ও নিজস্ব গদ্য-শৈলী এবং সাধারণভাবে নানা পর্যবেক্ষকের নিয়মিত বিশদ পর্যালোচনা, এই লক্ষণের পেছনে রয়েছে এক দূরবিসারী পটভূমি, যেখানে ফরাসী গদ্যের দীর্ঘ বিবর্তন এবং বহু প্রতিভার কীর্তি বিধৃত। সেদিকে তাকালে দেখি গদ্য ও পদ্য সমান্তরালভাবে বহু শতাব্দী ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ব'য়ে এসেছে এবং আধুনিক পর্ব শুরু হয়েছে সতের শতকে। (ইংরিজিও অবশ্য তুলনীয় এ বিষয়ে।) প্রসঙ্গত, ষোল শতকে রাবলে ও মঁতেঞ-র বিস্ময়কর গদ্য-কীর্তিরও উল্লেখ করা যায় যদিও ভাষা-লক্ষণে তা আধুনিক নয়। ফরাসীতে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ অথবা কোনো বচন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আধুনিক অভিধানে যে-সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তা থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর লেখকরা বাদ পড়েন না। অবশ্য ফরাসীদের ভাষা-ভাবনা প্রায় আদিকাল থেকে। ১৫৪৯ খ্রীস্টাব্দে কবি দ্যু বেলে-র লেখা বিখ্যাত নিবন্ধের অন্যতম বিষয় ছিল ফরাসী ভাষাকে আরো শব্দসমৃদ্ধ করার উপায়-নির্দেশ।

ফরাসী গদ্যের খ্যাতি অনেককাল থেকেই পৃথিবী-জোড়া। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় থাক বা না থাক সবাই এক নিঃশ্বাসে ব'লে দেন ফরাসী গদ্য দারুণ। তার গুণ এমন প্রবাদে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যই এ তার বাহাদুরির এক প্রমাণ। তবে স্বতঃসিদ্ধের মতো এই গুণগ্রহণে বিপত্তিও কিছু ঘটেছে। এই ধারণা ছড়িয়ে গিয়েছে যে, ফরাসীতে উৎকৃষ্ট গদ্যই শুধু হয়েছে এবং হয়ে থাকে, অন্য বিভাগগুলো তেমন কিছু নয়। (খোদ ফরাসীদের উক্তি ও উৎসাহও এজন্যে অনেকখানি দায়ী।) কোনো কোনো ইংরেজ, এমনকি বাঙালী মনীষীও এ ধারণার শিকার হয়েছেন। ইংরেজদের বেলায় হয়তো মনস্তত্ত্বে তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। কেননা এ-দুই ভাষা ও সাহিত্যের বাস্তব উৎকর্ষ সম্বন্ধে সচেতনতার নিচে কোনো এক কোণে অহঙ্কার থাকা অস্বাভাবিক নয়। সে-কারণে এমন-সব এলাকা রাখতে দরকার হয় যেখানে একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাঙালী ধারণা সম্বন্ধে কী মনে করব? ইংরেজের প্রভাব? আরো পরিচয়ের অভাব? প্রমথ চৌধুরীর নিবন্ধ পড়লে সেজন্যে আশ্চর্য হতে হয় এবং ফরাসী কবিতার কথা ভেবে দুঃখ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ঠাকুরের অনুবাদ প'ড়ে সে-দুঃখ দূর হয় না, বরং আরো বাড়ে। উনিশ এবং বিশ শতকে ফরাসী কবিতার কর্মকীর্তি কি মাঠে মারা গেল? আহা দুয়োরাণী!

যাই হোক, ফরাসী গদ্যের এই পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করলে মনে হয় ঝিদের এবং অন্যান্যদের ব্যাকরণ-আনুগত্য এক বিশেষ মানসিকতা অথবা চরিত্রের প্রতীক। ভাষাগতভাবে। তাকে ভাষার ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠা ব'লেই অভিহিত করতে হয়। কিন্তু তা গোঁড়ামির নামান্তর নয়। অবশ্য গোঁড়ার দলও আছেন। না থাকলে চলেও না। ঘাত-প্রতিঘাতে সমস্যাগুলো উপরে উঠে আসবে, নতুন সম্ভাবনার পথ দেখা যাবে, মৌলিকতা চিহ্নিত হবে, সেই তো বিতর্কের সার্থকতা। কিন্তু ও-আনুগত্য গোঁড়ামি নয়। তা হলে ঝিদের মতো গদ্য লেখা যায় না। আর্য প্রয়োগে এবং অন্যান্যভাবে শব্দ ব্যবহারে তিনি যে-স্বাধীনতা নিয়েছেন, তা নিয়েও আবার তর্ক লেগেছে। এবং গোঁড়ামির আবহাওয়া যদি ব্যাপ্ত হত তা হলে নতুন কিছু জন্মাত না, গদ্যকে নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে বিচিত্র করবার এত লেখকও উদ্ভূত হতেন না। গোঁড়ামি নয়, ভাষার স্বভাবের প্রতি বিশ্বস্ততা। মানে ভিতটাকে বারে বারে দেখা, যাতে নতুন নির্মাণ তার উপর ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে।

ভিতের প্রশ্নই উঠে পড়ে শেষ পর্যন্ত। অবশ্য তার আগে একটা মোটা দাগের কথা: কাকে বলি গদ্য আর কাকে পদ্য। নানা মুনির নানা মত, কচকচিও অনেক। কেউ বলেন, যে-ভাষা ছন্দোবদ্ধ নয় তাই গদ্য, ছন্দোবদ্ধ হলে পদ্য। তা হলে কি গদ্যে ছন্দ থাকতে পারবে না? আর পদ্যের সঙ্কীর্ণ ধারণা যখন বিস্তৃত হয়ে কবিতার মোহনা হয়ে যায়, সেই রূপান্তরের সংজ্ঞা কী হবে? কারো মতে গদ্যে প্রধান হয়ে থাকবে বুদ্ধি, কল্পনা পরে; পদ্যে তার উল্টো। তা হলে কি বুদ্ধির আধিপত্যে লেখা হলে পদ্য আর পদ্য থাকবে না? কেউ আবার এই সিদ্ধান্ত করেন যে, গদ্য হল বাস্তবকে প্রকাশের ভাষা আর পদ্য সম্ভাব্যতাকে। তবে কি কোনো সম্ভাব্যতার চিত্রণ গদ্যে উপযুক্তভাবে করা চলে না? এইরকম নানান জটিলতা। দিশেহারা না হওয়ার জন্যে কোথাও তো দাঁড়াতে হবে। আমার প্রত্যয় এই যে, সমাজ-ব্যবহার এবং সমাজ-বোধ্যতার প্রশ্নে গেলেই তবে আমরা গদ্যের আসল প্রকৃতিকে চিনতে পারি। গদ্যরচনায় যে-বিভিন্নতা, যে-বৈচিত্র্য আসে, তা অনেকটা প্রতিমা গড়ার মতো। মূল কাঠামোর উপরে লেখক তাঁর নিজস্ব শিল্পরূপ তৈরি করেন। অবশ্য সবটা নিয়ম-বাঁধা পরিকল্পিত সজ্জা নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের

প্রতিফলনই তাতে আসল। গদ্যপদ্যের এই মৌল বিভাজনের দিক থেকে মলিয়ের-এর প্রহসন ল্য বুর্ঝোয়া ঝাঁতিয়ম (Le Bourgeois Gentilhomme)-এর দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের একটা সংলাপ আমার মোক্ষম মনে হয়, যেখানে নতুন ধনী মসিয়ো ঝুরদ্যাঁ সম্ভ্রান্ত হওয়ার জন্য মাস্টার রেখে ভাষাশিক্ষার পাঠ নিচ্ছেন। একরকম শিক্ষা আমাদেরও হয় মজা পেতে পেতে। সুতরাং উদ্ধৃত করা যাক :

ঝুরদ্যাঁ—আপনাকে আমার একটা গোপন কথা বলতে চাই। আমি এক অত্যন্ত অভিজাত রমণীর প্রেমে পড়েছি। একটি ছোট চিঠিতে কিছু লিখে আমি তাঁর চরণে নিবেদন করতে চাই। আমার ইচ্ছে চিঠিটা লিখতে আপনি আমায় সাহায্য করেন।

শিক্ষক—খুব ভালো কথা।

ঝুরদ্যাঁ—সেটাই তো প্রেমিক সুলভ হবে, তাই না?

শিক্ষক—নিশ্চয়। তা আপনি কি তাঁকে পদ্যে লিখতে চান?

ঝুরদ্যাঁ—না, না, পদ্য নয়।

শিক্ষক—তা হলে আপনি শুধু গদ্য চান?

ঝুরদ্যাঁ—না, আমি গদ্যও চাই না, পদ্যও চাই না।

শিক্ষক—দুটোর একটা তো হতেই হবে।

ঝুরদ্যাঁ—কেন?

শিক্ষক—এই কারণে যে, আমাদের মনোভাব প্রকাশের জন্যে আছে শুধু গদ্য অথবা পদ্য।

ঝুরদ্যাঁ—শুধু গদ্য অথবা পদ্য?

শিক্ষক—হ্যাঁ। যা কিছু গদ্য নয় তাই পদ্য এবং যা কিছু পদ্য নয় তা গদ্য।

ঝুরদ্যাঁ—তা হলে লোকে যখন কথা বলে, সেটা কী?

শিক্ষক—গদ্য।

ঝুরদ্যাঁ—অ্যাঁ! আমি যখন বলি, 'নিকল, আমার চটিজোড়া নিয়ে এসো আর আমার রাতের টুপিটা দাও' তখন সেটা হল গদ্য?

শিক্ষক—হ্যাঁ মশায়।

ঝুরদ্যাঁ—কি আশ্চর্য! আমি চল্লিশ বছর ধ'রে গদ্য বলছি, অথচ তা জানতে পারিনি। আমাকে আজ এটা শেখালেন ব'লে আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ।

কথা বলার সঙ্গে গদ্যের এই যে জন্ম-সম্পর্ক একে অবহেলা করা যায় না। করলে খুব মুশকিল। কেননা তাতে গদ্যের প্রকৃতি বদলে যায়। তখন তা কবিতা হতে পারে কিংবা এমন কোনো গদ্য যার সূত্রপাত সবে হল এবং যা আমাদের বক্তব্য কী ভাবে প্রকাশ করলে বোঝা যাবে তা ঠাওর করতে পারছে না। বাংলা গদ্যের আলোচনা করতে গেলেও এ-প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আসে। কারণ ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো সর্বত্রই একরকম। সুতরাং ফরাসী ভূমিকা অপ্রাসঙ্গিক নয়, বরং ঐ ভাষায় পরিণত গদ্যের যাঁরা কারিগর তাঁদের অভিজ্ঞতা ও আচরণ জানলে আমাদের উপকার হতে পারে।

দুই

বাংলা সাহিত্যে গদ্যের জন্মকাণ্ডটাই সৃষ্টিছাড়া। এমন কৃত্রিম জন্ম আর কোনো বড় ভাষায় হয়েছে বলে জানি না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বয়ে আসছিল কাব্যের ধারা, কিন্তু গদ্যের কোনো খাত তার পাশে ছিল না, হঠাৎ আঠার শতকের শেষে নজরে এল গদ্য নেই, অমনি শুরু হয়ে গেল তার নির্মাণ। ফরাসীতে বা ইংরেজিতে সেরকম হয়নি। পদ্যের কিছু পরে গদ্যের সৃষ্টি হয়েছে মনের স্বাভাবিক তাগিদে এবং দুই ধারা পাশাপাশি এগিয়ে গিয়েছে। বাংলার বেলায় গদ্যের জন্ম আরো কৃত্রিম এই কারণে যে, তার অভাব প্রথম ধরা পড়ে বিদেশীদের চোখে এবং তাঁরাই প্রথম তার লিখিত রূপ গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। পর্তুগীজ পাদ্রীরা সূত্রপাত করেন বিচ্ছিন্নভাবে এবং অচিরে ইংরেজ পাদ্রীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেই কর্মযজ্ঞে অবতীর্ণ হন। সেইসঙ্গে অন্য ইংরেজদের উদ্যমও ছিল। কর্মযজ্ঞই বলব, কেননা শুধু গদ্যভাষারই নির্মাণ নয়, গদ্যের অবলম্বনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ-উন্মোচন তাঁরাই করেন। বাংলার ব্যাকরণ, অভিধান, বিশ্বকোষ তাঁরাই প্রথম প্রণয়ন করেন, মুদ্রণের জন্যে বাংলা অক্ষর তাঁরাই তৈরি করান এবং সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার আরম্ভও তাঁদের উদ্যোগে। অবশ্য নিজেদের প্রয়োজনেই এ-সব তাঁরা করেছিলেন, ধর্মীয় ও শাসনকার্যিক স্বার্থসাধনের প্রয়োজনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন ছাপিয়ে জেগে উঠেছিল শ্রদ্ধা প্রীতি এবং জ্ঞানান্বেষা।

আশ্চর্য এই যে, তখনো পর্যন্ত আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থে সে-

প্রয়োজন বোধ করিনি। অথচ কি ফরাসী কি ইংরেজ তাঁরা ত আপন গরজেই এককালে তাঁদের ভাষায় গদ্যরচনার প্রবর্তন করেছিলেন। আমরা কেন এমন উদাসীন ছিলাম তার সঠিক কারণ হয়ত পণ্ডিতদের জানা আছে। আমি জানি না। আমার মনে নানা কথা এলোমেলো আসে। এই ঔদাসীন্যে দীর্ঘ পরাধীনতার একটা বড় ভূমিকা নিশ্চয় ছিল। তের শতকের মাঝামাঝি তুর্কী বিজয় (স্মরণ করা যেতে পারে তের শতকের প্রারম্ভেই ফরাসী সাহিত্যে প্রথম গদ্যরচনার আত্মপ্রকাশ); তখন থেকে পর পর একটানা বিদেশীদের শাসন, যাদের ভাষা ছিল অন্য। সেন রাজারা যদি টিঁকে থাকতেন, তা হলে কেন্দ্রিত রাজশক্তির আশ্রয়ে ক্রমে সমস্ত আঞ্চলিকতার টানাপোড়েন পার হয়ে একটা সর্ববাঙালি-গ্রাহ্য নিখিলবঙ্গ ভাষা সম্ভবত প্রচলিত হত, যার ফলে গদ্য-সাহিত্য অনিবার্য হয়ে উঠত। কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। গদ্য-ব্যবহারে দায়িত্ববোধের প্রশ্ন আর দেখাই দিল না, তার খণ্ড খণ্ড অস্তিত্বে কোনোরকমে-কাজ-চলে-যাওয়াটাই যথেষ্ট হয়ে রইল। যেটুকু বাংলা সরকারি কাজে ব্যবহার্য হল তার শব্দাবলীতে বিদেশী রাজভাষার সংক্রমণ দেখা দিল। সে-ভাষা যে গ্রামসমাজী বাঙালির মুখের ভাষা ছিল না তাতে সন্দেহ নেই। জনসাধারণের বাস্তব জীবন এবং তার ঘাত-প্রতিঘাত পর্যবেক্ষণ করে অনুভব করে গদ্যেই ফুটিয়ে তোলা স্বাভাবিক ছিল। মনের তাগিদে। কিন্তু এই পরাধীন অবস্থায় সে-আগ্রহ থাকার কথা নয়। এবং সম্ভবত সে-সাহসও।

এ কথাও বলা হয় যে, গদ্যের পথে একটা মস্ত বাধা ছিল মুদ্রাযন্ত্রের অপ্রচলন। পদ্যকে স্মৃতির সাহায্যে মৌখিকভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জীইয়ে রাখা সম্ভব, কিন্তু গদ্যকে নয়। তা ঠিক। এবং একটা পরাধীন জাতির পক্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনে উদ্যোগী হওয়া সম্ভবও নয়। তবে মুদ্রাযন্ত্রের অভাবকে একটা বড় কারণ বলে মেনে নিতে বাধে। অনুলিপির পদ্ধতি ত ছিল। আবার স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রথম ফরাসী গদ্যরচনার আবির্ভাব ইয়োরোপে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের শ আড়াই বছর আগে।

এই বহিরঙ্গ অবস্থার সমান্তরালে এক অন্তরঙ্গ অবস্থাও ছিল যার মধ্যে এই গদ্য-বিমুখতার গূঢ় কারণ নিহিত মনে হয়। একটা ভৌগোলিক সীমা-নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সম্বন্ধে চেতনা অর্থাৎ সেই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা যারা একই ভাষায় কথা বলে তাদের সম্বন্ধে চেতনা বাস্তব অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্যে গদ্যকে অবলম্বন না করে পারে না। সেখানকার লেখক-মানুষের মনে এ দায়িত্ব আপনা থেকেই

অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের জাতীয় চেতনা ইংরেজ আসার আগে আমাদের কখনো ছিল না। একদিকে আমাদের ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ, রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে যার ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল না। অন্য দিকে ছিল এমন এক জীবনবোধ যা বাস্তবকে গৌণ বিবেচনা করত এবং কাব্যের মারফত যা জনসাধারণের মধ্যে অহরহ প্রচারিত হত। ধর্মীয় মহাকাব্যের আখ্যান বা পৌরাণিক কাহিনী অথবা বিবিধ দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে লোক-পুরাণ, এইসব নিয়েই যুগের পর যুগ কাব্যকথন কিংবা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কাব্যের অবলম্বনে প্রত্যক্ষ বাস্তবের ঊর্ধ্বে মানবিক বা দার্শনিক সত্যের কোনো স্তরে উঠে যাওয়া। সেইসঙ্গে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের সমাজকর্তাদের মস্ত একটা লাভও হত। কাব্যশ্রোতা জনসাধারণকে ঐহিক বাস্তবের প্রতি উপেক্ষাপ্রবণ করে দেবমহিমায় মুগ্ধ রাখা যেত। মানে স্থিতাবস্থা বজায় থাকত। পণ্ডিত-ব্যক্তিবা অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞেরা ত দেশীয় ভাষাকে অবজ্ঞাই করতেন। এটা সাধারণ দেশবাসীর প্রতি তাঁদের অবজ্ঞারই নামান্তর, নইলে তাঁরা জাতির জীবন নিয়ে সংস্কৃত গদ্য লিখতে পারতেন। ফরাসী ভাষার জননী লাতিনেরও দেবভাষার মর্যাদা ছিল, সেই ভাষাতেই ফ্রান্সের প্রথম ইতিবৃত্ত (রাজকাহিনী) রচিত হয় সেখানে এবং তা থেকে দেশীয় ভাষায় চলে আসতে ফরাসীদের খুব বেশি দেরি হয়নি। আমাদের দেশের মতোই, সব দেশের মতোই, ফ্রান্সেও দেশীয় ভাষায় আদি সাহিত্য ছিল পদ্য। তাতে সমাজ-জীবনের কিছু কিছু বিবরণ থাকত, যেমন প্রাচীন বাংলা কাব্যেও দেখা যায় (তবে ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রে রং চড়িয়ে যে-ধরনের মহাকাব্য—Chanson de geste—ফ্রান্সে লেখা হত, আমাদের এখানে তা হয়নি)। কিন্তু সে-সব বিবরণে কবি-কল্পনা বাস্তবের যথেষ্ট রূপান্তর ঘটাত, তাকে অন্য বাতাবরণে মুড়ে দিত। প্রথম ফরাসী গদ্য লেখক ভিলআরদুঁয়্যা সেই কল্পনার জগৎ ভেঙে দিলেন ১২১০ খ্রীস্টাব্দে। তার জায়গায় দেখা দিল 'বাস্তব পৃথিবী, যাকে চালনা করে রাজনৈতিক দুরাকাঙ্ক্ষা, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং স্বর্ণলিপ্সা।' গদ্যে তিনি লিখলেন চতুর্থ ক্রুসেড-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত। ধর্মের সূত্রে ঐতিহাসিক বাস্তবের চিত্রণ। এই বাস্তব-চেতনার কোনো উন্মেষ আমাদের এখানে দেখি না। যেন মানসিকতারই তফাত।

কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা বদলে গেল ইংরেজ আগমনে। ইংরেজদের রাজস্ব-ব্যবস্থা, বাণিজ্য এবং পরে শিল্প আমাদের স্বনির্ভর গ্রামজীবনের কাঠামো ভেঙে

ফেলল এবং আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক উল্টে-পাল্টে দিল। জনসাধারণকে অনেক বেশি বৈষয়িক দুর্গতির দিকে ঠেলে দিতে লাগল। সেই সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনে তারা এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষারও সূত্রপাত করল। ইংরেজদের কাছে ত নয়ই, আমাদের কাছেও এখন প্রত্যক্ষ বাস্তব আর উপেক্ষণীয় থাকল না। অবস্থাটা একেবারেই বদলে গেল। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় উপলব্ধি করলেন যে, বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে নির্বিকার থেকে দেবদেবী নিয়ে চিরাচরিত কাব্যরচনা সম্বল করে থাকলে আর চলবে না। এ যাবৎ বুদ্ধিজীবী নেতারা ইতরভদ্রের উদ্দেশে যে-সাহিত্যধারাকে সযত্নে বহতা রেখেছিলেন, তার কালোপযোগিতা ঘুচে গেল। নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে-রচনা অপরিহার্য হয়ে উঠল, তা গদ্য, ধারাবাহিক অক্লান্ত গদ্য, বিষয়ানুগ বিশদ গদ্য। ইংরেজের অনুসরণে ইংরেজকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন থেকেই আমাদের সাহিত্যে গদ্যের যাত্রা শুরু। এই প্রয়োজনের পেছনে জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারে হোক 'নেশন' সম্বন্ধে একটা বোধ নিশ্চয় কাজ করেছে।

জানি না আমার এইরকম ভাবনা সর্বতোভাবে ভ্রান্ত কিনা। যদি তা হয়ও, তবু একটা সত্য থেকেই যায়। সেটা এই যে, ইয়োরোপীয়েরা বাংলা গদ্য রচনায় হাত দেওয়ার আগে আমাদের সাহিত্যে গদ্য ছিল না। সামান্য যে-কয়েকটা নমুনা আছে, তা প্রায় প্রত্নতত্ত্বের বিষয়।

বিদেশীরা যে-গদ্য বানালেন, তা অস্বাভাবিক। সে-রকম না হয়ে পারে না। বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা অর্থাৎ কথ্যভাষা ছিল না, তার মানে তাঁদের শরীর ও মনের নড়াচড়া বাঁচার সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না। তাঁদের প্রয়াসটা ছিল গবেষণাগত, পুঁথিগত এবং সেই প্রয়াসে তাঁরা তৎকালীন বিদেশী অর্থাৎ প্রচলিত আরবী ফারসী শব্দ বর্জন করে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দাবলী ব্যবহারে যত্নবান হলেন। (আরবী ফারসী শব্দ বিতাড়নকে পুরনো রাজশক্তির বিরুদ্ধে নতুন রাজশক্তির সর্বাঙ্গীণ অভিযানের অঙ্গ বলে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়।) এইসঙ্গে আবার তাঁদের মাতৃভাষার বাক্যগঠনের অভ্যাস সক্রিয় রইল। ফলে তা হয়ে দাঁড়াল এমন এক গদ্য যাকে আমাদের গদ্য বলে চেনা মুশকিল। তবু সূত্রপাত তাঁরাই করলেন এবং কালক্রমে কিছু উৎকর্ষেরও পরিচয় দিলেন। তাঁদের পরে আরম্ভ করলেন আমাদের লেখক ও মনীষীরা। তাঁদেরও সেই প্রথম পদক্ষেপ। লক্ষণও অনেকটা একরকম : জননী সংস্কৃতের শরণ নেওয়া, এবং বাক্যগঠনে আড়ষ্টতা, খানিকটা অনিশ্চয়তাও বটে। কারো

কারো শৈলীতে অবশ্যই প্রতিভার ছাপ রয়েছে, কিন্তু তবু এখন পড়তে গেলে ভাষার অস্বাভাবিকতা ব্যাঘাত ঘটায়। এই অস্বাভাবিকতা কিন্তু স্বাভাবিক ছিল, কেননা তখন ত হাতড়ে হাতড়ে পথ খোঁজার পর্ব। তারপর থেকে ক্রমাগ্রগতি, যার অনেকখানি, জুড়ে বিশাল রবীন্দ্রনাথ।

ভাষার অগ্রগতি ত শেষ হয় না, চলতেই থাকে। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলে, ব্যক্তিগত প্রকাশ-ক্ষমতার নানান বৈশিষ্ট্যে তা বিচিত্রও হয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই স্বচারিত্র্য থেকে তার বিচ্যুত হওয়া চলে না, অন্তত গদ্যভাষার, অন্তত সেই গদ্যভাষার সর্বসাধারণ যার পাঠক। কারণ তার উৎস কোনো প্রাচীন বা নবীন সাহিত্যগ্রন্থ নয়, অন্য কোনো ভাষার আচরণ নয়। তার আসল উৎস লোক-ব্যবহার অর্থাৎ সেই ভাষায় সাধারণ মানুষের কথা বলার অভ্যাস। সেটাকে উল্টে-পাল্টে দিলে শৈল্পিক রহস্য হয়ত তৈরি হয়, কিন্তু পাঠক-সাধারণকে কিছু বলবার জানাবার বোঝাবার পথও বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

এখানে লিখিত গদ্যের একটা বিশেষত্বের কথা বলতেই হয়, যে-বিশেষত্ব গোড়া থেকেই এক সমস্যার মতো আমাদের উপর চেপে বসে। তা হল সাধুভাষা, যা কথ্যভাষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এমন বিভাগ অন্য কোনো ভাষায় আছে বলে জানি না। একদা লাতিনে ছিল: লেখ্য লাতিন আর কথ্য লাতিন। তা সেই লেখ্য লাতিন পুরনো পুঁথির পাতাতেই আটক থেকে গেল আর কথ্য লাতিন কালক্রমে জন্ম দিল নতুন নতুন ভাষাব এবং সাহিত্যের: ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, রুমানীয়, কাতালান, প্রভাঁসাল। মানে মুখের ভাষার প্রাণ যে অফুরন্ত এবং সমস্ত নতুন প্রকাশ যে একমাত্র তা থেকেই উৎসারিত হতে পারে সেটাই প্রমাণিত হল। আর বাংলা ভাষা নিজেই তো এক প্রমাণ, কেননা তারও উদ্ভব পুঁথিগত সংস্কৃত থেকে স'রে-আসা প্রাচীন কথ্য ভাষা থেকে। কিন্তু মাঝখানে এই ভাগ দেখা দিয়েছে, সাধু আর চলিত। অবশ্য লেখ্য ও কথ্য ভাষার একটা ভেদ সর্বত্রই ছিল এবং এখনো অনেক ক্ষেত্রে আছে। কিন্তু তার জাত অন্য। সে-ভেদ মূলত মার্জিত ও অমার্জিত রূপের, আঞ্চলিকতা ও সাধারণ্যতার। কিন্তু এটা কোনো অনড় পাঁচিলও নয়, এখানে-ওখানে ভাঙে। এখন ত দেখছি আগুয়ান অনেক ভাষা-এলাকায় ভাঙছে। এমন কল্পনা করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয় যে, শিক্ষাবিস্তার এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, সমস্ত আঞ্চলিকতাকে সাধারণ্যতায়

মিলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিন কোনো এক ভাষায় এ ভেদ লুপ্ত হবে। কোনো এক ভাষায়, কোনো দুই ভাষায়, কোনো তিন ভাষায়, সব ভাষায়। যাই হোক, এই কাল্পনিক ভবিষ্যৎ থাক। আলোচ্য অতীত ও বর্তমানে ফিরি।

বাংলার সাধুভাষা ও চলিত ভাষার ভেদ যেন দুই ভাষার ভেদ। কেননা তারা নিছক মার্জিত অমার্জিতে অথবা আঞ্চলিক সার্বিকে পৃথক নয়। তাদের সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের 'ফর্ম'-পৃথক। এবং আমাদের এই সাধুভাষা কেউ কোথাও বলে না, শুধু লেখাতেই তার অস্তিত্ব। এই সাধুভাষার উৎপত্তি ঠিক কিভাবে হয়েছিল আমি জানি না, বিশেষজ্ঞেরা হয়তো বলতে পারেন। সাধারণ পাঠক হিসেবে আমি এতে দেখি আঞ্চলিকতা এবং সংস্কৃত দুইয়েরই প্রভাব। ক্রিয়াপদগুলো যে আঞ্চলিক 'ফর্ম' থেকে এসেছে তা প্রমথ চৌধুরী দেখিয়েছেন (যেমন 'আসিতেছি' 'করিয়া' ইত্যাদি)। সর্বনামের 'যাহা' 'তাহা' ইত্যাদি রূপ কি মূলত আঞ্চলিক? বাংলার মতো মিশ্র ভাষায় এ-সব রূপ মৌখিক-ভাবেই আগে প্রচলিত ছিল, এমন অসম্ভব নয়, যে-কারণে প্রত্ন-গদ্যে তাদের ব্যবহার। এইসব রূপের সঙ্গে চলিত শব্দের সহযোগে বসানো হয়েছে ভারি ভারি সংস্কৃত শব্দ। এবং এই যোগফল হল তথাকথিত সাধুভাষা। বিদেশী পাদ্রীদের সংস্কৃতায়নের উৎসাহে এ গদ্যভাষা আরো কৃত্রিম হয়ে দাঁড়ায়। লেখ্য গদ্যের জীবনময়তা সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ার ফলে এই কৃত্রিমতার ভার আমাদের প্রথম গদ্য-লেখকদের ঘাড়েও চাপে। অবশ্য ক্রমে ক্রমে গদ্যে জীবন সঞ্চারের দায়িত্ব প্রকাশ পেতে থাকে, যার সর্বশেষ পরিণতি আজকের এই প্রায় সর্বব্যাপী লেখ্যগদ্য যা কথ্য ভাষার লিখিত রূপ।

আমাদের অনেকের মনে অনেক দিন ধ'রে এই ধারণা শিকড় গেড়ে ছিল যে, তথাকথিত সাধুভাষা আমাদের প্রকৃত লেখ্য ভাষা এবং কথা বলার সময় যে ভাষাই ব্যবহার করি না কেন লেখার সময় ঐ ভাষা ব্যবহার না করলে ঐতিহ্যবিচ্যুতি ঘটে। অর্থাৎ দুই-জাতি তত্ত্বের মতো দুই-ভাষা তত্ত্ব। অবশ্য প্রাচীনপন্থী গোঁড়ামি বাদ দিলে এই মনোভাবের পেছনে standardization-এর একটা বাস্তব ভাবনাও নিশ্চয় ছিল। এ ভাবনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সর্বসাধারণের ব্যবহারের কাছ থেকে সরে এসে কৃত্রিমভাবে এমন কোনো স্ট্যানডার্ড ভাষা কি তৈরি করে দেওয়া যায় যা বরাবর টিকে থাকবে। যায় না যে তা সাধু ভাষার কোণঠাসা দশা এখনই স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। আর ঐতিহ্য? লিখিত গদ্যভাষা শুরু হওয়ার পর মাত্র শ খানেক শ দেড়েক বছর

ধ'রে কিছু লেখক যেভাবে লিখেছেন সেটা ঐতিহ্য হয়ে যায় কি ? ভাষার ক্ষেত্রে একমাত্র ঐতিহ্য তো লোকব্যবহার যা একটা কোনো নির্দিষ্ট রূপে অনড় নয়। তাই বারে বারে লেখকদের ঘুরতে হয় সেই উৎসের দিকে। মুখের কথার বিবর্তনের সঙ্গে লিখিত ভাষাও বিবর্তিত হয়। 'আসিতেছি' (আসত্যাছি) এক সময় হয়ে দাঁড়ায় 'আসছি'। এখানে অবশ্য স্ট্যানডারডাইজেশন এবং ডায়ালেক্ট-এর প্রশ্ন আসে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি অনুসারে স্বতস্ফূর্ত-ভাবেই এর সমাধান হয়। ভাষা এবং উপভাষার মধ্যে তফাত ত আপেক্ষিক। কোনো একটা ডায়ালেক্ট শেষ পর্যন্ত মুখ্য হয়ে ওঠে এবং স্ট্যানডার্ড ভাষার জায়গা নেয়। যাবতীয় প্রধান অপ্রধান জীবন্ত ভাষার মূল এই। প্রাচীন পুঁথিগত ভাষা এবং পরিকল্পিত ভাষাই শুধু এই প্রাণধর্মের বাইরে। কিছু সরলীকরণে ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত ধরা যাক না। রোমক শক্তির পতনের পর ফ্রান্সে কথ্য লাতিন ক্রমে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত হয়ে যায়। একাধিক রাজবংশের উত্থান-পতন এবং সামন্ত প্রভুদের প্রভাব বিস্তারের মধ্যে ভাষার এই অবস্থা অনেক কাল চলে। তখন কোনো স্টানডার্ড ভাষা নেই। অবশেষে ইল-দ্য-ফ্রাঁস অর্থাৎ প্যারিস বেড়করা অঞ্চল থেকে উদ্ভুত রাজশক্তির অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা এবং তার নেতৃত্বে শাসনকার্যের কেন্দ্রীকরণ আর ফ্রান্সের ঐক্য সাধন। ঐ ইল-দ্য-ফ্রাঁসের ডায়ালেক্টই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল ফরাসী ভাষা, সারা ফ্রান্সের ভাষা। শুধু রাজশক্তির আশ্রয়েই নয়, ভাষার অন্তর্গত ধ্বনি, উচ্চারণ-সৌকর্য ইত্যাদি কারণে, শিক্ষিত শ্রেণীর নির্বাচন ও দৃষ্টান্ত স্থাপনে, প্রতিভার অবদানে আপনা থেকেই একটা স্ট্যানডার্ড তৈরি হয়ে যেতে পারে। সেরকম প্রক্রিয়া আমরা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে দেখছি। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে 'সাধুভাষা' প্রবন্ধে এ দিকটার অল্প-কিছু আলোচনা করেছেন। তবে এ ভাষাও চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে যায় না। নানারকম গ্রহণ-বর্জন, যোগ-বিয়োগ, অদল-বদলের মধ্যে দিয়ে বিবর্তন চলতেই থাকে, প্রথম পর্যায়ের মতো অত বেশি না হলেও রূপান্তর ঘটেই। সুতরাং কোনো লেখক, তা তিনি যত বড় প্রতিভাধরই হোন, ভাষার আদর্শ রূপে নির্দিষ্ট হয়ে থাকতে পারেন না। ভাষার মধ্যে দিয়ে তাঁর যে-লেখকগুণ প্রকাশ পায় তা শিক্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু তাঁর ভাষার অনুকরণে কোনো মহত্ত্ব সৃষ্টি হয় না, তার দ্বারা শুধু ভাষার জীবনকে অস্বীকার করা হয়।

আমাদের লিখিত সাধু গদ্যভাষা যে কৃত্রিম এবং তাকে যে মানুষের মুখের

কথার কাছাকাছি যেতে হবে, তা প্রথম আমলেই আমাদের লেখক ও মনীষীরা উপলব্ধি করেন। আলালী ও হুতোমী গদ্য ত লেখাই হয়েছে। যাঁরা ও রীতিতে লেখেননি, তাঁরাও ভাষার কথ্য রূপ ব্যবহারের প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য শব্দের উপরই জোরটা দিয়েছেন বেশি, এবং তাঁর ভাষা-বিভাগ মানতে আমরা এখন হয়তো সম্মত হব না, কিন্তু মুখের ভাষাকে যে তিনি কৃত্রিম ভাষার উপরে স্থান দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত, চলতি ভাষা ও সাধু ভাষার একটা তুলনা আপনা থেকেই আগ্রহজনকভাবে ফুটে ওঠে লিখিত বাংলা গদ্যের আদি পর্বে। বাংলা গদ্যের প্রথম গ্রন্থ (অবশ্য রোমান হরফে) পর্তুগীজ পাদ্রী মানোয়েল দা আস্সুম্পসাউ-র 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ভাওয়ালের উপভাষায় লেখা আর পরবর্তী অনুবাদ-রচনা উইলিয়াম কেরীর 'ধর্মপুস্তক' সাধু ভাষায়। কিন্তু ঐ উপভাষার রচনাই অনেক বেশি জীবন্ত ও মনোজ্ঞ। কেরীর নিজের রচনাও আরো চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে যখন তিনি কথ্য ভাষার দিকে এগিয়েছেন, যেমন 'কথোপকথন'-এ।

গদ্য ভাষা লিখতে হলে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাতে পরিবর্তন আনতে হলে কাজটা খেয়াল-খুশি মতো করা যায় না। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে করতে হয়। যখন আমি গল্প উপন্যাস লিখে কোনো মৌলিকতা দেখাই, তা সে প্রতিভার তাগিদেই হোক বা তাক লাগাবার ইচ্ছেতেই হোক তখন গদ্যকে খুশি মতো ভাঙচুর করা চলে। সে আমার শিল্পসৃষ্টির জন্মগত অধিকার। তাতে কারো আপত্তি হওয়া উচিত নয়। শিল্পপ্রেমিক পাঠকরাই বুঝবেন তাঁদের রসিক আত্মা কী উপভোগ করছে, আনন্দ, না যন্ত্রণা। কিন্তু যে-গদ্য লেখা হয় কোনো বিষয় উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করবার জন্যে, কোনো বক্তব্য বা অভিমত অন্যকে জানাবার জন্যে কোনো অবস্থার বিবরণ দেবার জন্যে অর্থাৎ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচনা, প্রতিবেদন যাই হোক তা, সে-গদ্যকে নিয়ম মেনে চলতেই হবে, ব্যাকরণের নিয়ম। আমরা সকলেই অবশ্য জানি ব্যাকরণ আগে নয়, ব্যাকরণ পরে। ব্যাকরণ অনুসারে ভাষা তৈরি হয় না, ভাষার আচরণ লক্ষ ক'রে তাকে বিধিবদ্ধ করা হয় ব্যাকরণে। ব্যাকরণকে অলঙ্ঘ্য বিধানের ব্যবস্থাপত্র হিসেবে না দেখে ভাষার সমসাময়িক (এবং প্রসঙ্গত পূর্বতন) আচরণের বিবরণ হিসেবেই দেখা উচিত। বিধান অলঙ্ঘ্য হলেই ভাষার মৃত্যু। তখন তা ধ্রুপদী মর্যাদা নিয়ে প্রাচীন গ্রন্থের স্ফটিক-আধারে শুয়ে থাকে।

এ দিক থেকে ফরাসী ও ইংরেজি usage শব্দটা আমার ভালো লাগে। একটি অত্যুৎকৃষ্ট আধুনিক ফরাসী ব্যাকরণের নাম ঐ শব্দ দিয়েই। বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ এখনো রচিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। বাংলা ব্যাকরণ বলে যা আমাদের উপর আগে চাপিয়ে দেওয়া হত, তা মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণ। তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ।

ভাষার নিয়মের ক্ষেত্রে লোকব্যবহারের দিকেই আমাদের ফিরতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ লোকে কিভাবে প্রয়োগ করে, কোন্ অবস্থায় কোন্‌টাকে কিভাবে বদলায়, কোন্‌টার পরে কোন্‌টা বসিয়ে সংযোগ গড়ে, কিভাবে বাক্যকে সম্পূর্ণ ক'রে অর্থবহ করে, সেই তো ভাষার ব্যাকরণ। লোকের বলার অভ্যাস বদলের সঙ্গে একটা ভাষার ব্যাকরণও বদলায়। বিভিন্ন কাল অনুযায়ী একই ভাষার বিভিন্ন ব্যাকরণ। অতএব আজ আমি অন্যের উদ্দেশে যে-গদ্য লিখব, তাকে মেলাতে হবে লোকে যেভাবে কথা বলে তার সঙ্গে অর্থাৎ আমি নিজে যেভাবে অন্যের সঙ্গে কথা বলি তার সঙ্গে। শব্দের রূপ-পরিবর্তন এবং শব্দের বিন্যাস হল আসল, তাঁকেই ভিত্তি ক'রে আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতার স্ফূরণ। বিভিন্ন প্রকার শব্দকে এক বিশিষ্ট পদ্ধতিতে সাজিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত করার এবং সেইভাবে বাক্যকে অর্থসমন্বিত করার যে-অভ্যাস সকলের গ'ড়ে ওঠে, আমার ধারণা তার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। কেননা এই অন্বয়কে যদি গোলমাল ক'রে দেওয়া হয়, তা হলে ভাষার অর্থ অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন আমাদের ভাষাকে আর আপন মনে হয় না।

নবীন বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে অন্বয় এবং শব্দপ্রয়োগ পদ্ধতি বদলে বিপত্তি ঘটাবার দু-রকম উদ্যম লক্ষ করা যায়। একটা ঘোরানো পেছন দিকে, আর-একটা পাশে। একটাকে বলা যায় হিন্দু গদ্য। উনিশ শতকের গোড়ায় ফিরে যাওয়া এবং তখনকার ধাঁচে গদ্য লিখে ধ্রুপদী হওয়া, উপরন্তু মৌলিকতা সৃষ্টির জন্যে প্রচলিত রীতি অগ্রাহ্য ক'রে বিভিন্ন প্রকার শব্দকে খুশি মতো প্রয়োগ করা। প্রথম যুগের বাংলা গদ্যে অন্বয়ের যথেষ্ট গোলমাল থাকত। সম্ভবত ধ্রুপদী বিশুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষায় এখন তাকে একেবারেই নস্যাৎ করা হচ্ছে। মাতৃভাষার মুখ চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরী পণ্ডিতী গদ্য এবং হিন্দু গদ্য প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। বেঁচে থাকলে আজও নিশ্চয় জানাতেন। কিন্তু এরকম গদ্যের সার্থকতা কী তাই তো বুঝি না। বাঙালী

সাধারণ এর সামনে গিয়ে সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তবে কী উদ্দেশে এবং কাদের উদ্দেশে এরকম লেখা? গল্প উপন্যাস ব্যঙ্গ-রচনা ইত্যাদি ব্যক্তিগত সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে প্রাচীন ধাঁচে অপ্রচলিত গন্থ ব্যবহার করা যায় কিংবা গন্থকে নানাভাবে উদ্ভবও করা যায়। ফরাসীতে একটা শব্দ আছে : 'পাস্তিশ' (pastiche)। মানে পূর্বগামী কোনো লেখক বা লেখক-গোষ্ঠীর ভাষা-শৈলীর অনুকরণ। সেটা করা হয় কোনো রীতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে অথবা বিবিধ রীতির ভিন্নতা দেখাবার জন্যে অথবা ব্যঙ্গ করবার জন্যে। মাঝে মাঝে বিশেষ কোনো ফরাসী লেখক এরকম রচনায় উদ্যোগী হন। কিন্তু প্রবন্ধে তা করা চলে না। প্রতিভার বরপুত্র হলেও কারো পক্ষে ভাষাকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তা হলে তো ইতিহাসকেই পিছিয়ে দেবার দায় ঘাড়ে নিতে হয়।

অন্য এক উদ্যম হল বিলিতি গদ্যের। এক্ষেত্রেও বাংলার শব্দপ্রয়োগ-পদ্ধতি এবং অন্বয়কে বিপর্যস্ত করা হয়! একটা বাক্যে যেভাবে খণ্ডবাক্য যোজনা করা হয়, তা প্রচলিত বাংলায় আমরা করি না, ইংরেজরা তাদের ভাষায় করে। ফলে এরকম ভাষা বাঙালির বুঝতে কষ্ট হয়। তার উপর যদি মৌলিকতার আগ্রহে শব্দসংযোগ দারুণ অভিনব করা হয় তা হলে তো বোঝাই যায় না। আমি কিছুদিন আগে এক পত্রিকায় আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়ি। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, লেখকের ভাষা ভালো বুঝতে পারিনি ব'লে তাঁর বক্তব্যও আমি বুঝতে পারিনি, তবে ঐ ভাষায় অতখানি লেখার জন্যে আমি তাঁর লেখন ক্ষমতার মনে মনে প্রশংসা করেছি এবং সেইসঙ্গে ঐ ভাষায় অতখানি পড়ার জন্যে আমার পঠন-ক্ষমতারও! বিষয়টা যখন আধুনিক কবিতা তখন তার আলোচনার ভাষাও দুর্বোধ্য হবে, এমন ধারণা যদি কারো হয় তো তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। আমাদের চোখের সামনে দৃষ্টান্ত অন্যরকম। ভারতবর্ষের বাইরে আধুনিক কবিতার যে-সব পুরোধার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ছিল, তাঁরা যখন গন্থ লিখেছেন তখন তা ভাষারীতিতে দৃঢ়সম্বদ্ধ, সর্বজনবোধ্য। যেমন ভালেরি, এলিয়ট, এল্যুয়ার। আমার জানা একমাত্র ব্যতিক্রম মালার্মে। তিনি গদ্যে অন্বয় উল্টেপাল্টে দিতেন, শব্দের রীতিবিরুদ্ধ যোজনায় ব্যাপৃত হতেন। কিন্তু মালার্মের গদ্যকে আজ কে তেমন স্মরণ করে? কিংবা বলা যায়, কে বা তাকে একরকম কবিতা ছাড়া আর কিছু ভাবে? আমাদের বাংলার ঐ দুই ধরনের গদ্যকে কদর্থে ধাঁধা এবং সদর্থে কবিতাই

ভাবা যায়। অক্ষমতার প্রশ্ন যদি না আসে তা হলে এরকম প্রাবন্ধিক গদ্যকে স্বেচ্ছা-নির্বাসনের প্রতীক বলে ধরে নেওয়া যায়। আমার এক অসাধারণ বক্তব্য আছে, আমি চাই না সাধারণজনে তা বুঝুক, আমি জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশিষ্ট, হয়ত কোনো অভিমান এই মনোভাবের জন্ম দেয়। কিন্তু এতে কারো কোনো উপকার হয় না। না সাহিত্যের, না পাঠকের, না লেখকের নিজের।

ভাষা নিয়ে কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা হবে না, কোনো অজানা অভিযানে পা বাড়ানো যাবে না, এমন দাবি কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে করতে পারে না। ক্ষমতাবান লেখক ভাষাকে নিশ্চয় নতুন বিকাশ-পথে নিয়ে যাবেন, নিজস্ব উপায়ে তার প্রকাশ শক্তিকে অমোঘ করবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তা ভাষার জীবন্ত রীতিকে উপেক্ষা ক'রে নয়, তাকে অবলম্বন ক'রে। বস্তুত মুখের ভাষায় এবং লেখার ভাষার সম্পর্ক হওয়া উচিত পারস্পরিক প্রভাবের। ভাষার সম্মুখ-গতি তাতেই আসতে পারে। লেখার ভাষার দিক থেকে আমাদের কালে সবচেয়ে প্রভাবশালী মাধ্যম সংবাদপত্র। আমাদেব সৌভাগ্য এই যে, বাংলা সংবাদপত্র আজ কথ্য ভাষাকেই বরণ ক'রে নিয়েছে। ভাষার জীবন সম্বন্ধে মনোযোগেরই তা নিদর্শন অর্থাৎ যারা ভাষা বলে তাদের সম্বন্ধে। পক্ষান্তরে, তাদের ব্যবহৃত প্রভাবিত করতে পারে সংবাদপত্র, কিন্তু সে-প্রভাবের চেষ্টা কখনো স্বেচ্ছাচারের দিকে যায় না, যেতে পারে না, কারণ বাঙালিসাধারণের পক্ষে বোধ হওয়ার প্রয়োজন তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এটাই আদর্শ সম্পর্ক। অবশ্য সংবাদপত্র বহু লেখকের দ্রুত লেখনের সমাহার, সুতরাং কোথাও কোথাও তালভঙ্গ হয়, কিন্তু সমগ্রের পটে তা তুচ্ছ। প্রবন্ধ-সাহিত্যে লেখক ও পাঠকের মধ্যে এই সম্পর্কই থাকা দরকার। পাঠকের ভাষাকে উপেক্ষা নয়, তার সম্বন্ধে সচেতনতা প্রবন্ধ-লেখকের প্রাথমিক দায়িত্ব। মুখের কথা ভাষাকে যে-রীতিতে অর্থবহ করে তার উপর ভর রেখে নিজেকে প্রকাশ করা, সব নতুনত্ব সেই ভিতের উপর গড়ে তোলা। মনে হয় না এ ছাড়া এগিয়ে যাবার আর কোনো পথ আছে।

সাহিত্যিক সমালোচনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে প্রাপ্তবয়স্কতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কবিতায় গল্পে উপন্যাসে আমরা এখন যে-কোনো আগুয়ান দেশের সঙ্গে ল'ড়ে যেতে পারি, এমন দাবী মাঝে মাঝে শোনা যায়। একেবারে শূন্যগর্ভ আস্ফালন মনে হয় না। লড়াই হলে আমরা জিতব না নিশ্চয়, কিন্তু চট ক'রে মাটি নেব না, এটা ঠিক। অবশ্য নাটকটা এখনো তত সুবিধের নয় ব'লে আক্ষেপ রয়েছে; তবে সরকারী বেসরকারী তৎপরতা যে ভাবে সক্রিয় এবং জনসাধারণের উৎসাহ যে রকম বর্ধমান তাতে আশা করা যায়, অচিরে এ ক্ষেত্রেও আমরা তাল ঠুকতে পারব। রঙ্গমঞ্চ থেকে মল্লমঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না। চিন্তা হল সমালোচনা-সাহিত্য নিয়ে। কিছুতেই যেন তার কৈশোর কাটছে না। বালকবীরের বেশে আজকাল আর বিশ্বজয় করা যায় না।

সমালোচনা-সাহিত্য মানে সাহিত্যের সমালোচনা। অন্তত বর্তমান উল্লেখ সেই অর্থে। সমালোচনার জাত এক নয়, একাধিক। সব কটিই যে সমান অপরিণত তা নয়। যেমন, অধ্যাপকী অথবা পণ্ডিতী সমালোচনা। নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে আমরা এগিয়েছি। অনেক ভারী ভারী বই ও প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, নানাভাবে ঐতিহাসিক আলোকসম্পাত চলেছে, বিবিধ টীকাভাষ্যে অতীতের জটিলতাকে সরল করা হচ্ছে কিংবা সরলতাকে জটিল। এ সমালোচনার কাজ প্রধানত তথ্য নিয়ে। তত্ত্বও আসে। সব কিছুকে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা, ধারা নির্ণয় করা, একজনের উপর অপরজনের প্রভাব খুঁজে বের করা এবং আলোচ্য বিষয়কে ছাত্র বোঝানোর মতো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা এতে থাকে। এর প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিক মতামত গ্রহনীয় না হলেও, এমনকি হাস্যকর হলেও অন্তত নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যায়, কিছু ভুল শুধ্রোয়। পণ্ডিতেরা গাছের জন্যে বন দেখতে পান না, এ অনুযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু কি করা যাবে? বন দেখবার চোখ তো পাণ্ডিত্যে ফোটে না। এবং গাছগুলো চিনবারও দরকার আছে। পণ্ডিতেরা যে গাছ চেনাবার

দায়িত্ব নেন, সেই যথেষ্ট। আনন্দের কথা, বাংলাদেশে তথ্যসন্ধানী অধ্যাপকী আলোচনা বেড়েছে। বিশেষত, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর কল্যাণে এর দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কয়েক মাসে যত বই যত প্রবন্ধ লেখা হল, কোনো একজন ব্যক্তিকে নিয়ে ঐ সময়ের মধ্যে কখনো কোথাও এত লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ (অবশ্য সবই পণ্ডিতী লেখা নয়)। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটা বড় উপকার হল। বিষয় যদিও একই, তবু হাত তো খুলে গেল, এরপর হয়তো অন্যান্য বিষয়েও প্রাচুর্য দেখা দেবে। রবীন্দ্রনাথের এ আরেক আশ্চর্য দান। শুধু নিজের সৃষ্টির ঐশ্বর্যই তিনি দিয়ে গেলেন না, নিজেকে বিষয়বস্তু ক'রে গিয়ে সাহিত্যের একটি বিভাগকে পরোক্ষে অভূতপূর্ব-রূপে সমৃদ্ধ করলেন।

সাহিত্যে তত্ত্বেরও একটা দিক আছে। সেটা ঠিক সমালোচনা নয়। পৃথকভাবে তা শাস্ত্রীয় পর্যায়ের। কিন্তু সমালোচনার সঙ্গে তার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী, কারণ তাকে সাহিত্য ঘেঁটেই সূত্র ও সংজ্ঞা বের করতে হয় এবং সাহিত্যেই প্রয়োগ করতে হয়। এটা যেন প্রদর্শন-মূলক সাহিত্য-বিজ্ঞান। এদিকেও আমরা চোখ বুজে নেই। রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, ইত্যাদি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা একেবারে অনুপস্থিত নয়। প্রতীক, ব্যঞ্জনা, রূপক, চিত্রকল্প (হালের বাক্‌প্রতিমা ?) ইত্যাদির ব্যাখ্যা হচ্ছে এবং তা দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির বিচার। তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের মতামতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটানো হয় বটে, তবে কার্যত প্রধান পথপ্রদর্শক যুক্তিসঙ্গতভাবেই ইয়োরোপীয় বিশেষজ্ঞরা। যাই হোক, আলোচনাটা উপকারক। আরও খুশী লাগে যখন দেখি, এই রকম বিশেষজ্ঞ আলোচনায় আধুনিক বাংলা কবিতাও অন্তর্ভুক্ত। তবে এ আলোচনায় দুটো মুশকিল আছে। প্রথমত, তত্ত্বেই বিস্তর কূটকচাল। এক তাত্ত্বিকের সঙ্গে আর এক তাত্ত্বিকের মতের মিল হয় না। একজন বললেন, প্রতীকের সংজ্ঞা এই, তো আর একজন বললেন, না, এই। রস, সৌন্দর্য, শিল্প সব নিয়েই অনন্ত বিতর্কের অবসর। তবু ব্যাপারটা উৎসাহজনক। কারণ এ রকম বিচার-বিতর্কে বুদ্ধিতে শান পড়ে, অনুসন্ধানের জেদ বাড়ে এবং হয়তো কোনো কোনো অস্পষ্ট ধারণা পরিষ্কার হয়। দ্বিতীয় মুশকিল হল প্রয়োগের ক্ষেত্রে অথবা যার ভিত্তিতে সূত্র ও সংজ্ঞা তৈরী হয় সেই দিকে। উদাহরণ দিয়ে বড়জোর দেখানো যায়, এটা এই। কিন্তু আর একটু এগিয়ে যদি কেউ বলেন, এই হল উচ্চস্তরের প্রতীক কিম্বা

এই হল শিল্প-রসের সার্থক নিদর্শন, তাহলেই গোলমাল। তাত্ত্বিকের সব ব্যাখ্যা শোনার পরও উদাহরণটি প'ড়ে আমার এমন মনে হওয়া খুবই সম্ভব যে, প্রতীকটা অত্যন্ত অর্থহীন কিম্বা রস যদি কিছু থেকে থাকে তা গেঁজে গিয়েছে।

সাহিত্যের পণ্ডিতী সমালোচনা প্রসঙ্গে মনে আসে 'ফরাসী সভ্যতা' পুস্তকের লেখক অধ্যাপক গেরার-এর উক্তি: 'যখন পংক্তি-সমালোচনা জমি তৈরী করল, যখন ইতিহাস মহৎ গ্রন্থটি রচনার আবহাওয়া পুনরুদ্ধার করল, যখন গবেষণা তার চরম ক'রে ছাড়ল, তখন সব কিছুরই হিসেব নিকেশ ঠিক হ'য়ে গেল, শুধু বাকী রইল আসল কাজ। সাহিত্য-সম্পদের একটি মাত্র যে চাবি আছে তা পাণ্ডিত্য নয়, সহানুভূতি।'

কিন্তু সহানুভূতি কোনো নির্দেশে জন্মায় না, চালিতও হয় না। বিশুদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনার সেই হল বিপদ। সঙ্গীতের সঙ্গে (আধুনিক গান নয়) একটা তুলনা দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গীতে একটা কঠোর নিয়ম-বিধি আছে, সেটা মেনে দীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, অভ্যাস করতে হয়। সাহিত্যে সে বালাই-ই নেই। এখানে পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা, অক্ষরটা শেখার শুধু ওয়াস্তা। যদি মাতৃগর্ভে অক্ষর-পরিচয়ের কোনো সুবিধে হয় তাহলে ভূমিষ্ঠ হয়েই সাহিত্য রচনা শুরু করা যেতে পারে। এ দিক থেকে সঙ্গীত আপেক্ষিক-ভাবে সীমাবদ্ধ এবং বিচারের উপযোগী। তা সত্ত্বেও এই সঙ্গীতেও একটা স্তর আছে যেখানে নিয়ম খাটিয়ে আর প্রমাণ করা যায় না কে সরেস আর কে কম সরেস। গায়ক 'ক' এবং গায়ক 'খ', দুজনেই নিয়মে নির্ভুল, আলাপ লয় তানকর্তবে ত্রুটিহীন, এমনকি ইচ্ছে ক'রে নিয়ম যদি ভাঙেন তাহলেও মনে হয় তা নির্দোষ এবং তাতে সৌন্দর্য বাড়ল। কিন্তু আমার 'ক'-এর গান বেশী ভাল লাগবে এবং আর একজনের হয়তো 'খ'-এর। দুই গায়কের মুখে ললিত শোনার পর বিদগ্ধ সমালোচক যতই বলুন, আহা, 'খ' যেমন দুই মধ্যম লাগান এমন আর কারো কাছে শোনা যায় না, আমি তাতে সায় দেব না। আমি দুই মধ্যম চিনি এবং আমার মনে হবে না, তাঁর গান অতুলনীয়। আমি বলব এ ব্যাপারে 'ক'-এর তুলনা নেই। অপর পক্ষ সুন্দর সুন্দর বাক্যে 'খ'-এর গুণপনা ব্যাখ্যা করলে আমিও সুন্দর ক'রে 'ক'-এর স্তুতি করব। অপর পক্ষ যদি দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার ক'রে তাঁর মতের গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেন, আমিও তাই করব, সম্ভবত আরো দুর্বোধ্য ভাষায়। আর এ সব যদি আমার না আসে তবে চুপ ক'রে থাকব, কিন্তু 'খ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করব না।

কারণ আমি ভাষায় বোঝাতে না পারলেও আমার অনুভব আমাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে অন্য কথা বলছে। সহানুভূতি নির্ভর করে আমার ব্যক্তিগত গ্রাহিতার উপর; সেখানে তর্কের কোনো প্রভুত্ব নেই।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও বিভ্রান্তিকর। কারণ লেখকের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ এবং সমালোচকের কখনো ভাষার অভাব হয় না। এ বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় সাহিত্যের সাহিত্যিক সমালোচনাকে সাহিত্য হিসেবেই দেখা।

'হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল সাদাকে বলেছিলি লাল', এ ঝগড়া সাহিত্য-ইতিহাসের প্রায় পাতায় পাতায়। আজ যিনি বাপের ঠাকুর, কাল তিনি ধুলোয় গড়াগড়ি যান; কাল যিনি ছিলেন মাথার মণি, আজ তিনি কাঁচের টুকরো এবং আগামীকাল আবার মুকুটে উঠতে পারেন। এ এক চমৎকার কৌতুক। যাদের সাহিত্য-প্রবাহ বহুকাল ধ'রে জীবন্ত তারা বহুকাল ধ'রেই এই কৌতুক উপভোগ ক'রে এসেছে। তবে এ প্রসঙ্গে যুগ-প্রবণতার কথাও ওঠে। যেমন, ফ্রান্সের রঁসার ষোড়শ শতকের ইয়োরোপে ছিলেন কবিকুল-চূড়ামণি, তাঁর দিগ্বিজয়ী প্রতিষ্ঠা ছিল, রাজরাজড়ারা তাঁকে সম্মান করতেন। সেই রঁসার মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই বিস্মৃত হলেন, এবং বিস্মৃত হ'য়ে থাকলেন দু'শ' বছর। তারপর আবার তাঁর উজ্জীবন। যদি যুগ-প্রবণতার বদল এর জন্যে দায়ী হয়, তাহলে স্বীকার করা উচিত যে, সাহিত্যের ভাগ্য-নির্ধারণে যুগ-প্রবণতা প্রবলতম শক্তি। এবং এও মানা উচিত যে, বিশেষ অবস্থার জন্যে কোনো এক ভূখণ্ডে যুগ-প্রবণতা বিকৃত বা বিভ্রান্ত হতে পারে, অতএব সাহিত্যের স্বার্থেই যুগকে পালটানো দরকার। রঁসারের কাব্যের উপর আবার হুমড়ি-খেয়ে-পড়া যুগটারও বিশ্লেষণ না করলে চলে না। কিন্তু ব্যক্তিগত সাহিত্যিক রুচি এবং মতভেদের দিকটা একেবারেই গোলকধাঁধার মতো। যে যখন যতটুকু ক্ষমতার অধিকারী হয়, মুখর হবার সুযোগ পায়, তখন তা কাজে লাগায়। প্রচারের একটা ফলও ফলে। সব সময়ই এটা দেখা যায়। কি পুরনো কালে কি হাল আমলে। কাতুল মঁাদেসকে আজ ক'জন জানে? অথচ জীবিতকালে তাঁর প্রভূত প্রতিষ্ঠা ছিল, মালার্মে পর্যন্ত একবার সাহিত্য ব্যাপারে পরোক্ষে তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর চারপাশে যত লেখকের ভিড় হত, র‍্যাঁবো রম-এ তা হত না। কিন্তু তাঁর বড়ত্ব পরে টিঁকল না। প্রথম জোর আঘাতটা হানলেন আঁদ্রে জিদ। মঁাদেস-এর মৃত্যু উপলক্ষে এক নির্মম

রচনায় তিনি মৃত লেখক সম্বন্ধে তাঁর মত অকপটে প্রকাশ করলেন। জিদ তখন খ্যাতির শিখর-পথে। তলিয়ে গেলেন কাতুল মঁদেস। মালার্মের অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। 'পার্নাস কঁতাঁপরঁ্যা-র শেষ সঙ্কলন থেকে তাঁর কবিতা আনাতল ফ্রাঁস বাদ দেন যেহেতু আনাতল ফ্রাঁস তাঁকে যোগ্য কবি মনে করেননি। এও স্মরনীয় যে, তাঁর প্রথম ভক্তদলের বিশিষ্ট কয়েকজনও পরে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। র‍ঁ্যাবোর কথাও ধরা যেতে পারে। আমাদের এই বাংলা দেশে তাঁর নাম এখন মুখে মুখে ফেরে, এমনকি আমরা রবীন্দ্রনাথের উপরেও তাঁর প্রভাব আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছি। র‍ঁ্যাবোর প্রতিভা আলোকসামান্য ব'লে খ্যাত এবং নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সে-প্রতিভার প্রকৃতি ও অবদান ব্যাখ্যা ক'রে এযাবৎ অজস্র আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাতে এতিয়ঁ্যাব্‌ল্‌কে ঠেকানো যায়নি। তিনি কয়েক খণ্ড গ্রন্থ লিখে র‍্যাবো সম্পর্কিত ধারণাকে ছিন্নভিন্ন করেছেন। যে-ধরণের শ্রেষ্ঠত্ব র‍ঁ্যাবোতে আরোপ করা হয় তা বহুলাংশে মনগড়া, এই তাঁর বক্তব্য। তর্ক ক'রে এতিয়ঁ্যাব্‌ল্‌কে হটানো সম্ভব নয়, কারণ তিনি দুর্ধর্ষ তার্কিক এবং রীতিমতো বিদ্বান। ফলে সমালোচকেব সমালোচককে বলতে শুনি: যুক্তিতর্ক সবই বুঝলাম, কিন্তু র‍ঁ্যাবোর কবিতাগুলো তো সামনে রয়েছে। মজার কথা, এতিয়ঁ্যাব্‌ল্‌ও তাই বলেন: র‍ঁ্যাবোর কবিতাই হল বিচারের আসল উপাদান। দুই পক্ষের একই কথার তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, সাহিত্যের গুণ বা অগুণ নিরূপণে সাহিত্যিক যুক্তি ও বক্তৃতার দৌড় বেশীদূর নয়। যার যেমন লাগল, শেষ পর্যন্ত সেইটাই তার কাছে ঠিক।

রুচি ও মতভেদ যে শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঘটে তাই নয়, এক ব্যক্তিতেও ঘটে। সময়ের সঙ্গে একই ব্যক্তির মেজাজ বদল হয় এবং সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত। আমাদের রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই তো সে কাণ্ড দেখেছি। ইয়োরোপে এককালে যে বড় সাহিত্যিকরা তাঁকে মাথায় ক'রে নেচেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ পরে উল্টো সুর গেয়েছেন।

কাজেই কোনো লেখা বা লেখক সম্বন্ধে সাহিত্যিক সমালোচনা এক নিরালম্ব বস্তু। তার সিদ্ধান্তের দাম হিসেবে কেউ যদি একটা কানা কড়িও বের করে তাহলে তাকে অতিরিক্ত সরল ছাড়া আর কি ভাবা যাবে? যে যেমন ইচ্ছে অনুভব করতে, পছন্দ অপছন্দ করতে এবং সেটা সেইভাবে বিবৃত করতে পারে, আপত্তি নেই। কিন্তু রায় দিলেই মুশকিল হয়। আমার মতো

সাধারণ মানুষ কার রায় মানবে এবং কেন মানবে? যদি সমালোচক আমার মতো অনেক মানুষের সঙ্গে একটা কোনো ভিতের উপর দাঁড়িয়ে কিছু বলেন তাহলে আমরা সকলে মিলে খানিকটা বুঝতে পারি এবং মানতেও পারি। অনুভব ও সহানুভূতির একটা হদিসও তখন হতে পারে। বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সমালোচক যে রায় দেন তার কোনো সাধারণগ্রাহ্যতা নেই। সাধারণগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত সম্ভব শুধু সেই নিরীখে যাকে বিশুদ্ধ সাহিত্যিকরা বলেন 'অসাহিত্যিক'। ধর্মীয়, সামাজিক, মানবতান্ত্রিক যাই হোক তা। যে-ভাবনা মানুষের একটা সমষ্টিকে একসঙ্গে নাড়ায়, সে-ভাবনার দিক থেকে না দেখালে সাহিত্যকর্মের কোনো মহত্ত্ব বা অমহত্ত্ব পাঠকসাধারণের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সঙ্কীর্ণভাবে ধরলে এ নিরীখ রাজনৈতিক হতে পারে, উদারভাবে ধরলে জীবননৈতিক। নিছক রাজনৈতিক হলেও আপত্তির কিছু দেখি না, কারণ তাতে অন্তত ব্যাপক মনোভাবের আবেগের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার মতো সিদ্ধান্তে আসা যায়। নইলে সাহিত্যিক সিদ্ধান্তের নৈরাজ্যে আমাদের দিশেহারা হ'য়ে ঘুরে মরতে হবে। অবশ্য অন্য একটা সমাধান আছে। কোনো বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সমালোচক যদি ডিক্টেটর হয়ে হুকুম জারী করেন যে, তাঁর অভিমতই সবাইকে মেনে নিতে হবে তাহলে আর গোলমাল থাকে না। কিন্তু তা কোনো দিনই ঘটবে মনে হয় না, কারণ সে-ও তো রাজনীতি।

তাহলে কি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সমালোচনা নিন্দনীয়? আদৌ নয়। তা অত্যন্ত উপাদেয় জিনিষ, যেমন উপাদেয় কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক। জজিয়তি করার ইচ্ছে না রেখে যদি সৃষ্টির দিকে মন দেওয়া যায়, তাহলে সাহিত্যের এই বিভাগটি আশ্চর্য হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। আমার ভালো লাগা মন্দ লাগা আমার ব্যক্তিগত, সেটা মনে রেখে যদি আমি লিখি এবং যথেষ্ট কল্পনাশক্তি, আবিষ্কারস্পৃহা এবং লিপিচাতুর্য প্রয়োগ করি, তাহলে আমরা সমালোচনা সাহিত্য হিসেবে অত্যন্ত উপভোগ্য হবে।

দুই

বাংলাদেশে সাহিত্যিক সমালোচনার গতানুগতিক ধারা ইয়োরোপ থেকে পাওয়া। কিন্তু তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি বেশী কিছু নেই। মামুলী মতামত প্রকাশের নিষ্ফল অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে এখন নতুন পথে পা বাড়ানোই ভালো।

কিন্তু উদ্বেগ হয় সমসাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা দেখে, বিশেষত কাব্যের। তার আবহাওয়াটা এই উদ্যমের অনুকূল নয়। সেখানে বৈঠকখানার ব্যক্তিগতকে ছেড়ে সাহিত্যের ব্যক্তিগতে যাবার লক্ষণ কম। একেবারে যে নেই তা নয়, কোনো কোনো লেখায় খোলা মনের সাক্ষাৎ অবশ্যই মেলে, তবে মোটের উপর অবস্থাটা খুব সুবিধের নয়। অবশ্য মাঝে মাঝে বিলিতী বা ফরাসী হাওয়া আসে, তখন একটা গম্ভীর চেষ্টা হয় সমালোচনা কর্মটিকে ঠিকঠাক করবার। কিন্তু তা টেঁকে না, আমরা আবার ফিরে আসি আমাদের আদি স্বভাবে। তবে এ কথা মানতে হবে যে, আজকাল ভাষার বেশ উন্নতি হয়েছে, গদ্যে ভালো ভালো শব্দ ও শব্দগুচ্ছ আমরা ব্যবহার করতে শিখেছি। ফলে বেশীর ভাগ লেখা অন্তত ভাষার দিক দিয়ে খারাপ লাগে না। কিন্তু বক্তব্যে তা চার দেয়াল পার হয় না। বেশ ধরতে পারা যায়, সমালোচকের বন্ধুবান্ধব কারা এবং কাদের চলন তাঁর কাছে বাঁকা লাগে।

সঙ্কলনের প্রসঙ্গও এখানে আসে। কারণ সঙ্কলনও একরকম সমালোচনা। তা থেকে সঙ্কলকদের সাহিত্যিক মতামত খানিকটা প্রকাশ পায়। কোনো কোনো সঙ্কলন কী অনবদ্য, বিশেষত কবিতার সঙ্কলন। হয়তো দেখা গেল, সঙ্কলনকর্তার রচনাই গ্রন্থের একটা প্রধান সম্পদ কিম্বা দেখা গেল, সঙ্কলনে এমন লেখকরা রয়েছেন যাঁদের সঙ্গে ঐ গ্রন্থের বাইরে বিশেষ সাক্ষাৎ ঘটেনি। যাঁরা নেই তাঁরা কেন নেই তা পাঠকের সর্বপ্রকার সাহিত্যবোধের অগম্য। সুতরাং কারণ হিসাবে এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় থাকে না যে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-প্রতিমদের অত ঠাসাঠাসি আসরে যোগ্য অযোগ্য বিচার ক'রে জায়গা দেওয়া সম্ভব ছিল না এবং সঙ্কলনকর্তার মনোভাব সম্ভবত এই যে, কারো রচনার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা নির্ণয়ের পক্ষে ব্যক্তি হিসেবে তাকে পছন্দ বা অপছন্দ করাটা অপরিহার্য। পাঠকদের দিয়ে এরকম ভাবানো কিন্তু খুব বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। রুচির প্রশ্ন না হয় বাদ দেওয়া গেল।

এ ধরণের ব্যাপার সমালোচনায় ঘটলে তা আরও বেশী প্রকট হয়। কারণ মতামত সেখানে লিখিতভাবে প্রকাশিত। কবিতার ক্ষেত্রেই সমালোচকরা সর্বাধিক সক্রিয়। তার হেতুটা দুর্বোধ্য নয়। কবিতা লেখবার লোক সবচেয়ে বেশী এবং পড়বার লোক সবচেয়ে কম। উপরন্তু, চারদিকের জীবন থেকে স'রে থাকার একটা চেষ্টা কবিতার জগতে রয়েছে। এ অবস্থায় যতটা সম্ভব ঘোষণা করবার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া, সমালোচকদের পক্ষে

কবিতা এক অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্রেও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রাধান্যে সে বিচরণের সাহিত্যিক সম্ভাবনা খর্বিত। যেসব আলোচনা সমালোচনা লেখা হয়, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে মোটের উপর সেগুলি এক ধাঁচের। তার কেন্দ্রীয় ধ্যান সমসাময়িক কিছু নামের উল্লেখ ও অনুল্লেখ, যা এক এক রচনায় এক এক রকম এবং যার তাৎপর্য সাহিত্যের দিক থেকে উপলব্ধি করা কঠিন। এতে ব্যক্তিগতভাবে কার কতখানি লাভ বা লোকসান হয় জানি না, কিন্তু সাহিত্য নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমালোচনা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ কমে, কারণ বিশেষ বিশেষ সমালোচকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে সে কৌতূহলী নয়। কিন্তু প্রধান ক্ষতি এই যে, সাহিত্যের যে বিভাটিকে রীতিমতো রোমাঞ্চকর ক'রে তোলা যায়, সেটি রুগ্ন হয়ে প'ড়ে থাকে।

কবিতার সাহিত্যিক সমালোচনা কী আগ্রহেরই না হতে পারে যদি আমরা নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে একবার কাজে নেমে পড়ি। যাবতীয় রচনার তুলনায় কবিতা সবচেয়ে স্থিতিস্থাপক। তাকে ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ফেলা যায়। যে কোনো দিকে অবাধে চ'লে যাবার এমন সুযোগ অন্য কিছুতেই নেই। তাছাড়া, সাবেকী পদ্য লেখার যুগ শেষ হওয়ার পর সাধারণভাবে কবিতার একটা গভীর-গভীর চেহারা হয়েছে। ইচ্ছে করলে এ গভীরতাকে অতলস্পর্শও মনে করা যেতে পারে। সুতরাং যে কোনো কিছু সন্ধানের জন্যে নিচে নেমে যাওয়ারও বাধা নেই। আধুনিক যুগে অবশ্য চেতনাপ্রবাহ, বস্তুব্যাখ্যান ইত্যাদি নানান্ ছাপ নিয়ে গল্প উপন্যাস নাটকও এ বিষয়ে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, তবু কবিতার ধারে কাছে তারা এখনো আসতে পারেনি। অথচ এইসব সুবিধে অবহেলিত হচ্ছে।

সাহিত্যের ব্যক্তিগতে পৌঁছতে হলে সমালোচকের যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিক হওয়া প্রয়োজন। মানে বৈঠকখানার গণ্ডী তাঁকে ছাড়াতে হবে। তাহলে নিজের অনুভব সংবেদনশীলতা, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, অনুসন্ধান, আবিষ্কার—এই সব দিয়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনা-সাহিত্য তৈরী করা সম্ভব হবে। কারো সঙ্গে মত মিলল কি মিলল না তা এখানে অবান্তর। কারণ এ সমালোচনা সৃজনধর্মী। আবিষ্কার বলতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উপর বোদল্যার র‍্যাঁবোর প্রভাব আবিষ্কারের মতো বস্তু নয়। ইদানীংকার এ প্রচেষ্টার তুলনায় পণ্ডিতেরা যে সনাতন পদ্ধতিতে প্রভাব আবিষ্কার করেন তা অনেক বেশী পরিণত। না,

এ নয়, আরও মৌলিক হওয়া দরকার। তবেই সমালোচনা সৃজনী সাহিত্যের পর্যায়ে উঠবে। এমনকি, তা গোয়েন্দা-কাহিনীর মতো কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারবে।

এই রকম প্রয়াস ফ্রান্সে লক্ষ্য করা যায়। আগে থেকেই ছিল, এখন আরও বেগবান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপর ফরাসী কবিদের প্রভাব না খুঁজে যদি আমরা ফরাসী সমালোচকদের কাছ থেকে প্রেরণা নিই, তবে একটা কাজের কাজ হয়। ফরাসীদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং সাহিত্য বিষয়ে মস্তিষ্কচর্চার ইতিহাস তাদের অনেক কালের। সুতরাং সমালোচনায় নতুন ফরাসী কৃতিত্ব প্রণিধানযোগ্য।

সম্প্রতি দুখানি বই বেরিয়েছে। লেখক হলেন ওয়েবর এবং ব্যুতর। প্রথম গ্রন্থকার বিভিন্ন কবির কাব্য আলোচনা ক'রে কবিতার উৎস নির্ণয় করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থকার বোদল্যার-এর একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ ক'রে কবির রচনা ও জীবন-ধারার উপর আলোকসম্পাত করেছেন। গ্রন্থ দুটির পরিচয় প্রসঙ্গে ঝাঁ-পিয়ের আতাল সমালোচক দুজনকে সাহিত্যিক গোয়েন্দা আখ্যা দিয়েছেন এবং ইংরেজদের পক্ষে গৌরবের কথা, তিনি প্রথম জনকে কনান ডয়াল সৃষ্ট শার্লক হোম্স্-এর সঙ্গে এবং দ্বিতীয় জনকে আগাথা ক্রিষ্টি-সৃষ্ট এরক্যূল পোয়ারোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেন করেছেন বলি।

প্রথম লেখকের বক্তব্য এই যে, শৈশবের কোনো একটি বিশেষ ঘটনার অভিজ্ঞতা সমস্ত শিল্পসৃষ্টির কেন্দ্রে। তা থেকেই সৃষ্টির 'অদ্বিতীয় প্রসঙ্গটি' নির্ধারিত হয়। 'সৃষ্টি করার অর্থ হল অনিরূপিতভাবে অচেতনভাবে শৈশবের সেই লুপ্ত পরিস্থিতির সমীপবর্তী হওয়া।' শার্লক্-হোম্স্-এর পদ্ধতি অনুসারে যেমন একটি চুল, একটি সিগারেটের টুকরো, একটু কাদার দাগ কিম্বা কোনো এক সুবাস থেকে খুনীকে বের ক'রে ফেলা যায়, তেমনি এই সমালোচকের মতানুসারে শৈশবের একটা স্মৃতি এবং বার বার কবিকর্মের যেসব শব্দ বস্তু ও গঠনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা থেকে শৈশবের সেই মূল ঘটনাকে বের করা যায় এবং তা দিয়ে সমগ্র সৃষ্টিকে অনুধাবন করা যায়। যেমন মালার্মের ক্ষেত্রে বের করা যাবে যে, তিনি বালক বয়সে অন্যান্য বালকদের মতোই গাছে চ'ড়ে পাখির ছানা চুরি করতেন এবং একবার নিশ্চয়ই এই রকম চুরি করার সময় বাসা ভেঙে প'ড়ে কয়েকটা কচিকাচা মারা গিয়েছিল। তার ফলে তাঁর কাব্যের দায় হল প্রায়শ্চিত্ত। 'যা কিছুর পতন ঘটে, যা কিছু বিবর্ণ হয়ে মরে

তার প্রতি মালার্মের আকর্ষণ', তাঁর কাব্যে ডানা, উড্ডয়ন, পতন, নীলিমা, এই সবের ক্রমাগত উল্লেখ। অনেক কবিতা বিশ্লেষণ ক'রে সমালোচক চিহ্নগুলো ধরেছেন এবং মূল প্রসঙ্গটি আবিষ্কার করেছেন। তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'মালার্মের কবিতা অস্পষ্টভাবে অজ্ঞাতসারে হতে চায় গান-গাওয়া পাখির কণ্ঠ। মালার্মে তাঁর সব চেয়ে মনোহর এবং সবচেয়ে দুর্বোধ্য কবিতাগুলিতে নিজেকে তাঁর সেই মূল প্রসঙ্গগত গান-গাওয়া পাখির সঙ্গে এক ক'রে ফেলেছেন।' শুধু মালার্মে নয়, অন্যান্য লেখকদের সম্পর্কেও সমালোচক এই 'অদ্বিতীয় প্রসঙ্গ' আবিষ্কার ক'রে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করেছেন।

পোয়ারোর পদ্ধতি অন্যরকম। বাইরের চিহ্নে তাঁর আগ্রহ নেই। অপরাধীর সাধারণ কথাবার্তা, কোনো কাজের ভুল, কোনো মিথ্যাভাষণ, এই সবের প্রতি তাঁর অখণ্ড মনোযোগ। এবং তাঁর ব্যগ্রতা খুনীকে ধরবার জন্যে তত নয় যত মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের উদ্ঘাটনে। দ্বিতীয় সমালোচক বোদলের-এর একটি পত্র অবলম্বন ক'রে এই গোয়েন্দাগিরি করেছেন। পত্রটি বোদলের ১৯৫৬ সালের ১৩ই মার্চ ভোর রাতে উঠে তাঁর বন্ধু আস্‌লিনোকে লেখেন। তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, তার বৃত্তান্ত এতে দেন। স্বপ্নটির অর্থ বোদলের নিজে কিছুই বুঝতে পারেননি। কিন্তু সমালোচক তা সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছেন। তিনি তন্ন তন্ন ক'রে চিঠির সমস্ত কথা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার সূত্রে কবির জীবন, কাব্য এবং চিন্তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন।

এই হল মৌলিকতা। রচনার মুন্সীয়ানা অবশ্যই এর সঙ্গে যুক্ত। বিশুদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনা যে কী পরিমাণ আগ্রহজনক হতে পারে, এ দুটি গ্রন্থ থেকে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই আরও চমকপ্রদ করা সম্ভব। মতামতে কিছু আসে যায় না। সাহিত্যিক রায়ের কতটুকুই বা দাম? আসল হল রহস্যের সন্ধান, নতুন নতুন আবিষ্কারের ঝোঁক, কোনো সাহিত্যকর্ম যার নিমিত্তমাত্র। সমালোচক সেই আনন্দে লিখবেন যে-আনন্দে কবি কবিতা লেখেন, ঔপন্যাসিক উপন্যাস এবং নাট্যকার নাটক। অর্থাৎ সৃষ্টির আনন্দ। সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে সাহিত্য করা, সাহিত্যিক সমালোচনার এই লক্ষ্য হওয়া উচিত। পরিতাপের বিষয়, এদিকে আমরা একটুও মনোযোগ দিইনি।

কবিতা কী বলে কীভাবে বলে

দুর্বোধ্যতার অভিযোগ সামনে রেখেই আরম্ভ করা যেতে পারে। কারণ কবিতা কী বলে এবং কীভাবে বলে তার সঙ্গে অভিযোগটা বিশেষ রকমে জড়িত, অন্তত বর্তমান কালে। যদি কোনো কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য লেখা হত, যেমন প্রাচীনকালে হত অথবা কোনো সাধারণ বাস্তব দৃশ্য বা ঘটনা বর্ণনা ক'রে পদ্য, তাহলে সমস্যা ছিল না। অবশ্য সেখানেও প্রকাশ-ক্ষমতার প্রশ্ন থাকত, তবে বোধ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হ'য়ে। সমস্যা কালক্রমে দেখা দিয়েছে যখন লেখক সব কিছুর সঙ্গে তাঁর 'আমি'-কে জড়িয়ে দিয়েছেন, মানে যখন লিরিক কবিতার আবির্ভাব হয়েছে, তারপর। আর সবচেয়ে বেশি গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছেন বোধহয় ফরাসী কবি বোদলের, যার সূত্রপাত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর প্রথম প্রকাশে। তিনি তাঁর পূর্বসূরি রোমান্টিক কবিদের উচ্ছ্বাস, স্বপ্নচারিতা, আশাভঙ্গ বা শূন্যতাবোধ সঞ্জাত বিষাদ, নিসর্গপ্রেম ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে নিয়ে এলেন নিশ্ছিদ্র নির্মম আত্মচেতনা এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে কবি-জীবনের একাত্মতা। সেই সঙ্গে তিনি আপাতদৃষ্টকে অন্তরালবর্তী এক গোপন সত্যের প্রতীক হিসেবে দেখার কথা বললেন এবং নির্দেশ করলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের মধ্যে এক মৌল অভিন্নতা। (শব্দই তো বস্তু অথবা ভাবের প্রতীক, এখন তা হল তারও পেছনের আর কিছুর প্রতীক অর্থাৎ প্রতীকের প্রতীক।) এই মানসভূমিতে বোদলের তাঁর কাব্যের উপজীব্য করলেন শহুরে মানুষকে যার পা নরকে দৃঢ়প্রোথিত এবং হাত মাঝে মাঝে করুণভাবে স্বর্গ হাতড়ায়, যে-মানুষ জীবনের শিকার, যে-মানুষ তিনি নিজে। অর্থাৎ যুক্তিবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে শুধু হৃদয়াবেগ আর নয়, তাদের ছাড়িয়ে গূঢ় অনুভব। রোমান্টিক কবি-নায়কের উচ্ছ্বাস ও বিষাদ আর নয়। এ কবি-নায়কের মনে নিরবচ্ছিন্ন বিতৃষ্ণা এবং সমস্ত মনোহর প্রচ্ছদ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার ব্যগ্রতা। মনে হয়, যে-পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার যুগপৎ সমৃদ্ধি ও নিষ্ঠুরতার পরিবেশে অস্পষ্ট আশা ও নৈরাশ্যের দোলায় আগের যুগের কবিরা দুলতেন, বোদলের তাঁর সময়ে সেই ব্যবস্থার সর্বব্যাপী ধ্বংসক্রিয়া

তাঁর অস্থিমজ্জায় অনুভব করেন। বোদলেরের দৃষ্টির মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও বিকৃতি যতই থাক, তাঁর দেখার ভঙ্গি এবং তাঁর প্রয়াস কাব্যে আধুনিকতার প্রথম নিদর্শন ব'লে সাধারণত ধরা হয়। এই আধুনিকতার পরিণামে কবিতা অপেক্ষাকৃত সারল্য থেকে জটিলতায় প্রবেশ করেছে (বোধহয় আর তাকে লিরিকও বলা যায় না)। এবং এরই পরিণামে অনেকে কবিতার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। অনেকে বলতে আমি তাদেরই ধরছি যারা স্বাভাবিক-ভাবে কবিতায় আগ্রহী। সকলেই কবিতার অনুরাগী হবে এমন কোনো কথা নেই। পৃথিবীতে অনেক বিষয় রয়েছে যা কবিতার চেয়ে কম আকর্ষণের নয়। বস্তুত আর্টের ক্ষেত্রেই বলা যায় সঙ্গীত এবং অভিনয়ের আবেদন অনেক বেশি ব্যাপক (অবশ্য কবিতা মানে এখানে ব্যক্তিগত কবিতা, রামায়ণ মহাভারত জাতীয় কাব্য নয়)। তাদের পাশে কবিতা আজ গরীব আত্মীয়ের মতো জড়োসড়ো।

ফরাসী কবি-ঔপন্যাসিক ফ্রাঁসিস কারকো বলেছেন: Le poésie est comme la Foi ; elle n'illumine que ceux qui croient en Elle : কবিতা ধর্মবিশ্বাসেব মতো, সে আলোকিত করে শুধু তাদেরই যারা তাতে বিশ্বাসী। কিন্তু ব্যাপারটা যে অত সরল নয় তা পাঠকদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। প্রুস্ত-এর মতো পাঠকও তো আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন।

বোদলের যদিও তথাকথিত আধুনিকতার প্রবর্তক, কিন্তু তিনি কবিতার প্রচলিত গঠনকে ভাঙেননি। সে-গঠনে যেটুকু স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লেগেছিল তা আগেই লেগেছিল। ছন্দ যতি মিল স্তবক নিয়ে লিরিক কবিতার যাত্রা শুরু হয়েছিল, যে-কারণে সঙ্গীতের অনুষঙ্গে তার নাম হয়েছিল লিরিক। বোদলেরের কবিতায় তা মোটামুটি বজায় রইল। আর যে-গদ্যকবিতা তিনি লিখলেন তা তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। তিনি গদ্যকবিতা লিখলেন তাঁর পূর্বগামী আলোয়াজিয়ুস বেরত্রঁার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে। কিন্তু ক্রমে ভিতরের চাপে এবং ধারণার পরিবর্তনে বাঁধাধরা ছাঁচ ভাঙতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত কাব্যের বাহন হিসেবে গদ্য-পদ্যর ভেদটাই মুছে গেল। বোদলেরের পরে যাঁরা আসেন তাঁরা সবাই অবশ্য ফর্ম ভেঙে দেননি। তাঁর অনুবর্তীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ ক'রে বলা যায়, যাঁরা শব্দের প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে ব্যাপৃত হলেন, যাঁরা কবিতাকে সঙ্গীতের মতো বিমূর্ত উপলব্ধির বিষয়ে রূপান্তরিত

করতে চাইলেন অর্থাৎ "বিশুদ্ধ" কাব্যের প্রবক্তা হলেন (মালার্মের ভাষায়ঃ Donner un sens plus pur aux mots de la tribu), তাঁরা প্রচলিত ফর্মকেই বজায় রাখলেন। আর যাঁরা কবিতার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের পরিবর্তে অন্য এক জগতের উন্মোচনে অস্থির হলেন অথবা যাঁরা মানবিক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় গভীরভাবে আলোড়িত হলেন, তাঁরা ফর্মকে নানাভাবে ভাঙচুর করলেন।

এ কাণ্ড ফ্রান্সে ঘটেছিল বটে, কিন্তু তার কোনো কোনো লক্ষণ আগেই ইয়োরোপের অন্য অন্য দেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বোদলের এবং তাঁর অনুবর্তীদের কবি-সত্তায় সে-সব যেন কেন্দ্রীভূত হ'য়ে প্রবলভাবে উৎসারিত হয়। তার ঢেউ সব জায়গাতেই লাগে। অবশেষে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেশেও না লেগে উপায় নেই। কারণ সমাজের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা যখন সর্বত্রই একটা সাধারণ রূপ নিতে আরম্ভ করে, তখন কোনো নির্বিকল্প জাতীয়তা একটা বিশেষ দেশের শিল্পকে আর চিহ্নিত করতে পারে না। অবশ্য একটা দেশীয় বৈশিষ্ট্য অলঙ্ঘনীয়ভাবে বিদ্যমান থাকে। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার যে-মাধ্যম অর্থাৎ ভাষা তাই তো সেই বৈশিষ্ট্যের আদিস্বরূপ যা কখনো বর্জন করা যায় না। ইতিহাসগত ধারাবাহিকতা তার মধ্যে দিয়েই সঞ্চারিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে কোনো ছুঁৎমার্গী কাব্যরূপ আর কি কল্পনা করা যায়? ভোট, পার্লামেণ্ট, শ্রমশিল্প, মালিকানা, যোজনা, আমলাতন্ত্র, পুলিস, সৈন্যবাহিনী, আর্থিক সংগঠন, ফুটবল, ক্রিকেট —এ সব যদি পশ্চিমী ঐতিহ্য থেকে আমাদের ঐতিহ্যে এসে যায়, তাহলে সাহিত্য বাদ থাকবে কী ক'রে? এবং কেন বাদ থাকবে? প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য এখন আর পৃথক নয়। তা আমাদের ঐতিহ্যে যুক্ত হয়ে গেছে। মনে হয় প্রবলতর হয়ে উঠছে, যেহেতু সংশ্লিষ্ট সামাজিক ঐতিহ্য প্রবলতর হচ্ছে। এটা লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের দেশে যাঁরা "বিশুদ্ধ" সাহিত্যের উদ্গাতা তাঁরা কখনো বিশুদ্ধ ভারতীয়ত্বের কথা বলেন না। বলা সম্ভব নয়। কারণ, প্রথমত, ভারতীয় ব'লে কোনো সাধারণ সাহিত্য ধর্ম আমাদের নেই। বরং বাঙালী, মারাঠী, গুজরাটী ইত্যাদি বলা কম অবাস্তব। দ্বিতীয়ত, যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো কিছুই আর বিদেশী নেই। অতএব পাশ্চাত্যের নকলনবিশির যে-অভিযোগ সময় সময় করা হয়, তা ঠিক মনে হয় না। নকলনবিশির মূলে তো ক্ষমতার অভাব। সে-দোষারোপ

ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে করা যেতে পারে, কিন্তু সেখানে পূর্ব-পশ্চিম তফাৎ অবান্তর। যিনি এলিয়ট বা ভালেরিকে অনুকরণ করেন, ওঁরা সামনে না এলে তিনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকেই অনুকরণ ক'রে যেতেন। বৈদেশিক ঐতিহ্যের প্রভাব অন্য কথা। তার মূলে বাস্তব সামাজিক অবস্থার মিল।

এই বাস্তব সামাজিক অবস্থার কথাটা এড়ানো যায় না। বোদলের যে-আধুনিকতা কাব্যে প্রবর্তন করলেন, তা স্বপ্নাদ্য নয়। তাঁর বহুবিদিত ennui, তাঁর satanisme ইত্যাদি মানুষ হিসেবে তাঁর সামাজিক পরিস্থিতিরই প্রতিক্রিয়া। কাব্যে এই আধুনিকতার উৎসে রয়েছে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনাত্মীয়তার বোধ। যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে এত আবেগ উচ্ছ্বাস, সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই যখন বিপন্ন অথবা অর্থহীন হয়ে উঠল, তখন কবির পক্ষে অসহায় বোধ করা খুব স্বাভাবিক। ব্যক্তি হিসেবে সে বিপর্যস্ত, কোনো অবস্থাই তার আয়ত্তে নেই, যন্ত্রমালিক-নিয়ন্ত্রিত সমাজ তার সম্পর্কে নির্বিকার। বিক্ষোভে, যন্ত্রণায়, আত্মপীড়ক বিদ্রোহে এবং পলায়নের বাসনায় সে অস্থির। যে-সমাজে তার বাস, সে-সমাজ তার আপন নয়। এই অনাত্মীয়তাই তার লেখক-সত্তার বাসভূমি। অবশ্য এই বোধ কোনো একটা নির্দিষ্ট পথে আত্মপ্রকাশ করেনি, স্বভাবতই বিভিন্ন ও বিচিত্র পথ নিয়েছে। কখনো তা প্রকাশ পেয়েছে নির্মম আত্মবিশ্লেষণে অথবা আত্মানুসন্ধানের সূত্রে এক দুর্জ্ঞেয় মনোজগতের উদ্ঘাটনে, কখনো প্রকৃতির বা অতীতের মধ্যে আশ্রয় অন্বেষণে, কখনো মৃত্যুচিন্তায়, কখনো যৌনতায়, কখনো বা ইচ্ছাকৃত অসংলগ্নতায় এবং অতি-ব্যক্তিগত আচ্ছন্নতায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধকে উল্টে পাল্টে দেবার এবং ভাষাকে পর্যন্ত ভেঙেচুরে একাকার করবার চেষ্টাও এর আর একটা দিক। আধুনিক কাব্যের দুর্বোধ্যতার একটা কারণ এইখানে নিহিত। কিন্তু এর পাশাপাশি আর একটা ধারাও স্বাভাবিক নিয়মে দেখা দিয়েছে। মনের নতুন রাজ্য আবিষ্কারে উদ্যোগী হয়েও এবং ভাষাগত নতুন পদ্ধতিপ্রকরণ অঙ্গীকার ক'রেও তা সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেনি। এই ধারার লেখকেরা ক্রমে সামাজিক পরিবর্তনের কথা ভেবেছেন, এবং তাঁদের অসহায় একাকীত্বকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। মানুষের অন্য এক ভবিষ্যতের রূপ বা রূপাভাস তাঁদের দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। অতএব কাব্যে যে-আধুনিকতার কথা বলা হয়, তার মূল লক্ষণ দাঁড়ায় নিজের ব্যক্তিসত্তা

সম্বন্ধে কবির চেতনা এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধের অথবা বিরোধ-নিরসন-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

পশ্চিমে যা আগে এসেছে, আমাদের দেশে স্বভাবতই তা পরে এসেছে। কারণ সেখানকার অনুরূপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখানে গ'ড়ে উঠতে সময় লেগেছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের এই উপনিবেশে সামন্তযুগীয় ব্যবস্থা জীইয়ে রাখা হয়েছিল। এখানে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী হওয়া এবং দেশের মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর তীব্র চেতনাকে শেষ পর্যন্ত রহস্যময়তায় অস্পষ্ট ক'রে দেওয়া স্বাভাবিক ছিল। পশ্চিমী প্রবণতাকে ঠেকাবার আর একটা পাঁচিলও আমাদের ছিল। সে আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রাম। এই একটা আদর্শের প্রবল আবহাওয়া ছিল ব'লেই সাহিত্যিক টালমাটাল আমাদের মনকে পশ্চিমের মতো অমন অস্থির ক'রে তোলেনি। তবু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সামাজিক বিপর্যয়ের অভিঘাত আমাদের উপরও এসে পড়ে। সাহিত্যে তার প্রকাশ রবীন্দ্র-বিদ্রোহে, অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক জীবনদর্শন ও আদর্শবাদের বিরোধী মনোভাবে, যার পরিচয় পাই কল্লোল যুগের আন্দোলনে। বাস্তব সম্বন্ধে তখনকার সেই সাহিত্যিক চেতনা ও প্রকাশ যতই বালকসুলভ হয়ে থাকুক এবং যতই তা কাব্যে ধারাবদলের বৈশিষ্ট্যে নিজেকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়ে থাকুক, তবু তা ছিল বিদ্রোহ। তারপর যখন পরাধীনতা দূর হয়েছে এবং আমরা সব দিক থেকে দুনিয়ার ব্যবস্থার শরিক হয়েছি, তখন তো আমাদের কাছে পশ্চিমের সবরকম সাহিত্যিক আচরণের আগল খুলে গেছে, আমরা তার যথার্থ অংশভাগী হয়েছি। তার নিদর্শন আজ অহরহ চোখের সামনে।

আধুনিক কাব্যের দুর্বোধ্যতার একটা কারণ এবং মূল কারণ পরিবর্তিত মানব-সামাজিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া। অবশ্য ইচ্ছে ক'রে দুর্বোধ্য হবার প্রবণতাও কারো কারো মধ্যে দেখা যায়। তার কারণ হয় অক্ষমতা নয় অভিমান। পাঠককে বিমূঢ় ক'রে মহৎ হবার চেষ্টা অথবা বাস্তব ব্যর্থতার ফলে এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজের বেপরোয়া প্রভুত্ব জাহির। কবিতা দুর্বোধ্য লাগার আর যে-সব কারণ থাকে সেগুলো মনে হয় সাময়িক এবং বহুলাংশে পদ্ধতিপ্রকরণগত। প্রত্যেক যুগেই নতুন কবিতা তখনকার পক্ষে সাধারণ অর্থে আধুনিক। এই আধুনিকতাও সব কবিতা-পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হয় না। অনভ্যাসই তার মূলে। কবি নিজেকে, পৃথিবীকে, মানুষকে, প্রকৃতিকে, জীবনকে যেভাবে

দেখেন বা অনুভব করেন সে সম্বন্ধে কথা বলতে চান। এই বলাটা তো সমাজ-কর্মীর মতো হয় না, হয় শিল্পকর্মীর মতো। তিনি তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী শব্দাবলী বিশেষভাবে বিন্যস্ত ক'রে কল্পনা বা অনুভূতির ছবি আঁকেন। তাঁর বক্তব্য তাদের আশ্রয় ক'রেই বিকীর্ণ হয়। তাঁর ভাবনা এবং ইন্দ্রিয়গত সূক্ষ্ম স্থূল তথ্য তাঁকে ভিতরে-ভিতরে এমন অনন্যভাবে নাড়ায় যে, তিনি যখন সেই প্রতিক্রিয়া নতুনভাবে শব্দে সাজিয়ে অন্যের সামনে প্রথমে ধরেন, তখন তা সকলের কাছে হয়তো পরিচিত লাগে না। কারণ তখন তারা তাতে অভ্যস্ত হয়নি। কাজেই তা কিছু দুর্বোধ্য লাগতে পারে। পৃথিবীতে বহু মহৎ লেখককে এ অভিযোগ শুনতে হয়েছে। আমাদের রবীন্দ্রনাথকেও। কিন্তু আজ আর তাঁদের বিরুদ্ধে সে-অভিযোগ কোথায়?

শব্দার্থের সীমাবদ্ধতাও এ ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িত। আমরা প্রত্যক্ষ বক্তব্য বা দৈনন্দিন বক্তব্যের জন্যে যে-সব শব্দ ব্যবহার করি, তা দিয়ে সব ক্ষেত্রে কবির মনোভাব ঠিকমতো ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। এই কারণে তিনি নানারকম উপায় অবলম্বন করেন। কখনো নতুন শব্দ তৈরি করেন, কখনো বা পুরোনো শব্দকে অন্যভাবে প্রয়োগ করেন। কোনো কবি যখন তাঁর অনুভবের কথা বলেন, চকিতদৃষ্ট স্বল্পালোকিত মনোজগৎকে যখন দেখাতে চান, তখন ভাষাকে (যে-কোনো ভাষাকে) অত্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে হয়। সুতরাং ব্যবহার-মলিন এবং স্থাবর শব্দগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে নতুন ব্যঞ্জনায় স্থাপিত ক'রে তাঁর বক্তব্যকে আভাসিত করতে হয়। কবিতার বক্তব্য প্রকাশে বিশেষণ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, চিত্রকল্প ইত্যাদিরও বিশেষ ভূমিকা আছে। এসবের প্রয়োগও কবির বৈশিষ্ট্য এবং নিজস্ব দৃষ্টিকে এবং সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে যথেষ্ট ফুটিয়ে তোলে। তবে সমস্ত উপকরণের মধ্যে, আমার বিশ্বাস, সবচেয়ে মৌল ও সবচেয়ে স্বাভাবিক হল চিত্রকল্প (বাক্‌প্রতিমা ?)। লেখক তাঁর যে-অন্তর্লীন অভিজ্ঞতাকে কবিতায় ব্যক্ত করেন, তার অনেকটাই রূপ নেয় শব্দ-চিত্রে। কথা দিয়ে এই ছবি-আঁকাটা স্বতস্ফূর্তভাবে আসে। অবশ্য ছবির মাধ্যমে ভাবি আমরা সবাই, কবি অকবি সবাই। যেমন, কেউ যখন তার শৈশবকে স্মরণ করে, তখন তার মনে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আসে। শৈশব বলতে কোনো বিমূর্ত ধারণা তার মনে জন্মায় না। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট ছোট সাথী, দৌড়োদৌড়ি, আছাড় খাওয়া, পুতুল খেলা—এইসব টুকরো টুকরো ছবি।

কবিতায় চিত্রকল্প কিন্তু নিছক ছবি আঁকার খাতিরে ছবি আঁকা নয়। কোনো দৃশ্য বর্ণনা এইসব ছবির উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য কবির অনুভব ও মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলা। ছবি প্রায়ই একটা নয়, অনেকগুলো পরপর আসে। তারা সম্মিলিতভাবে কবিতার কেন্দ্রীয় ভাবকে গ'ড়ে তোলে। কবির ভাবনা ও গূঢ় অভিজ্ঞতা চিত্রকল্প থেকে বিচ্ছুরিত হয়। এবং তাঁর এই চিত্র-মণ্ডলে শুধু অতীত ও বর্তমানই নয়, ভবিষ্যৎও বিদ্যমান থাকতে পারে। এবং কবি স্বভাবতই আশা করেন তা সহৃদয় শ্রোতা ও পাঠককে অনুরণিত করবে। অবশ্য এসব ছবির উৎপত্তি কল্পনায়, অথবা তারা কল্পনার রঙে রাঙানো বাস্তবের কোনো অংশ। তারা কবির মনোভাব প্রকাশ করে মাত্র। কবিতায় চিত্র-কল্পের ভূমিকা যে সবচেয়ে স্বাভাবিক তাতে সন্দেহ করি না। অন্যান্য উপকরণ ভেবেচিন্তে ব্যবহার করা যায়, অদলবদল করা যায়, কিন্তু চিত্রকল্পের বেলায় তা করা যায় না। তা আপনা থেকে লেখকের মনশ্চক্ষে ফোটে। কবি-স্বভাবের মধ্যেই তার উৎস। চিত্রকল্পকে উপকরণ বলাও বোধহয় ঠিক নয়, কারণ তার সরাসরি যোগ কবিতার আত্মার সঙ্গে। চিত্রকল্প এবং চিত্রকল্প-গ্রথিত কাব্যরূপ পূর্ব-সঙ্কল্পের ব্যাপার নয়। বড়জোর তার অদৃষ্টে হয়-গ্রহণ-নয়-বর্জনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

কিন্তু কবি যে-ভাবনা ও অভিজ্ঞতাকে এইভাবে রূপ দেন, তা এই জগতেরই ভাবনা ও অভিজ্ঞতা। সুতরাং তাদের সঙ্গে অন্য মানুষের মনের যোগসূত্র কোথাও না কোথাও থাকে। যদি কৃত্রিমভাবে তৈরি-করা কথা না হয়, যদি বিভ্রান্তি তার জনক না হয়, তাহলে একলার কথা বাস্তবিক একলার কথা নয়, অনেকের কথা। প্রাথমিক অভিনবত্ব যতই দুর্গম মনে হোক, শেষ পর্যন্ত বহু পাঠক ও শ্রোতা তার মধ্যে আত্মীয়তা আবিষ্কার করেন।

নতুন দৃষ্টি ও বক্তব্যের চাপে পুরোনো ছাঁচ ভেঙে যায়। কাব্যের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট। আধুনিক পর্বারম্ভের সময় থেকে কবিতার প্রথাগত গঠনে ভাঙন শুরু হয়। কারণটা সহজ। নিয়মিত পংক্তি, মিল ইত্যাদি কবিতার রচনায় যেমন সাহায্য করে, তেমন অনেক সময় কবিতাকে বিপথগামীও করে, কখনো বা যান্ত্রিকতা চাপিয়ে দেয়। তাছাড়া, হিসেব-করা নক্সার মধ্যে অনুভবকে অথবা বক্তব্যের বিশেষ মেজাজকে সব সময়ে আঁটানো যায় না। আধুনিক কাব্যে তাই মিল প্রায়ই বর্জন করা হয় এবং প্রায়ই ব্যবহার করা হয় অসমান ছত্র। এখন গদ্যও তার এক প্রধান বাহন। সাধারণভাবে গদ্য হল যুক্তির অধীনে

পর্যবেক্ষণশীল বিচারশীল বুদ্ধির ভাষা, আর কাব্য হল মুখ্যত বোধ এবং গৌণত বুদ্ধির সাহায্যে সৃজনশীল কল্পনা ও অনুভূতির ভাষা। প্রাচীনেরা সর্বদা লিরিক কাব্যকে শ্রুতি ও গঠন সৌষ্ঠবে চিহ্নিত করতেন। কিন্তু আধুনিকেরা আধারের মুখ চেয়ে আধেয়কে খাটো করতে চান না ব'লেই গদ্য-পদ্য ভেদ শিথিল ক'রে দিয়েছেন। অনুভূতি ও কল্পনাকে সৃজনশীলভাবে নিযুক্ত করা যদি কবির উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শব্দের একটা বহিরঙ্গ বিন্যাস তাঁর পক্ষে আবশ্যিক হবে কেন? ব্যাকরণ অনুযায়ী গদ্যে তা প্রকাশ করলে কবিতা না হয়ে উঠবার কোনো কারণ নেই। অবশ্য কবিতায় ধ্বনির একটা মস্ত ভূমিকা থাকে। সেদিক থেকে ছন্দ মিল ইত্যাদির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আবেগ এবং আবেশ সঞ্চারের তারা বড় উপায়। স্পষ্টতই গদ্য-কবিতা ঐভাবে কিছু সঞ্চার করতে চায় না। কিন্তু গদ্যে কবিতা মানে গদ্যে প্রবন্ধ নয়। ধ্বনির ভূমিকা তাতেও আছে এবং তারও এক অন্তর্গত ছন্দ থাকে, যতি থাকে। কার্যত তা টের পাওয়া যায় যখন কোনো একটা শব্দ বদলানোর চেষ্টা করা হয়। তবে আমার মনে হয় না সচরাচর আগে থেকে সঙ্কল্প ক'রে গদ্যে বা গদ্য-ঘেঁষা পদ্যে বা নিটোল পদ্যে কবিতা লেখা হয়। অনুভূতি ও কল্পনা যে-শব্দমালাকে আশ্রয় করে তাই আকার নেয় তাদের কোনো একটায়।

বাইরের এইসব বাধা পার হতে বেশি সময় লাগে না। পাঠকের পুরোনো অভ্যেসের জায়গায় নতুন অভ্যেস তৈরি হয়। তখন কবিতার কোনো 'সৃষ্টিছাড়া' রূপ তাকে আর প্রতিহত করে না। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে যে-প্রশ্ন থেকে যায় তা হল পাঠকদের সঙ্গে সংযোগের প্রশ্ন। কারণ তা কবিতার বক্তব্যের প্রশ্ন। সেটাই আসল। বোধ্য হবার একটা দায় লেখকের থাকেই। তা যদি না থাকত, তাহলে কবিতা লিখে অন্যের কাছে প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কোন লেখক তাঁর মনের অন্দর মহলে কী লুকোচুরি খেলছেন এবং কত কায়দা ক'রে তাঁর কী কথা গোপন রাখছেন তা জানবার জন্যে গলদ্ঘর্ম হবার কোনো আগ্রহ মানব-সমাজের থাকতে পারে না। সুতরাং সংযোগের প্রশ্ন অপরিহার্য।

কবিতা নানারকমের লেখা হয়। বাইরের কোনো ফরমাসের ব্যাপার এটা নয়। যে-কবির যে-স্বভাব এবং যে-মেজাজ সেই অনুযায়ীই তিনি লেখেন। কেউ লেখেন দার্শনিক ভাবণের মনোভাব নিয়ে, কেউ লেখেন নিছক শিল্প-

সৃষ্টির অভিলাষে, কেউ লেখেন মস্তিষ্ককে প্রবল রেখে (মস্তিষ্ক নিশ্চয় সর্বদাই জাগ্রত থাকে, নইলে শব্দের নির্বাচিত বিন্যাস কী ক'রে সম্ভব ? স্বয়ংচল রচনা কি সত্যিই স্বয়ংচল ?), আবার কেউ লেখেন হৃদয় ও অনুভব থেকে। আমার দৃষ্টিতে হৃদয়-সংবেদ্যতাই কবিতার স্বধর্ম। বুদ্ধির খেলা দেখবার জন্যে লোকে কবিতার কাছে যাবে কেন ? কবিতার গভীর উৎস হৃদয় এবং তার লক্ষ্যও হৃদয়। কবিতার শব্দাবলীর জন্ম অনুভবে, কল্পনায় তাদের পুষ্টি এবং তারা প্রতিধ্বনি জাগাতে চায় অনুভবে। বুদ্ধির ভূমিকা কবিতার সৃষ্টি এবং কবিতার উপলব্ধি উভয়তই গৌণ মনে হয়।

পাঠকের হৃদয় কি শর্তে সাড়া দেবে সেই হল সংযোগের সমস্যা। একটা সমভূমি সেজন্যে নিশ্চয় প্রয়োজন। সেটা কী হতে পারে সকলের সাধারণ চেতনা ছাড়া ? স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে তা হল সমাজ-চেতনা। মানবিক পরিস্থিতির পটভূমিতে যদি শিল্পসৃষ্টি বিধৃত হয় তবেই তা অন্যের মধ্যে অনুরণন তুলতে পারে। মানব-সমাজের পরিমণ্ডল কবিতার পক্ষে তেমন, যেমন মাছের পক্ষে জল। সামাজিক ভ্রাতৃত্বই কবি ও পাঠকের মধ্যে আসল সম্পর্ক। আর তাই যদি না হবে, তাহলে বোদলের প্রায় সওয়া শো বছর পরে এই বঙ্গরঙ্গ ভূমিতে তাঁর আত্মীয়-স্বজন খুঁজে পাবেন কেন ? যাঁরা সমাজ-চেতনারহিত বিশুদ্ধ শিল্পের কথা বলেন, তাঁদের মনের মধ্যেও এই চেতনা কোনো একভাবে থাকে, যার জন্যেই ও-কথা তাঁরা বলেন। সমাজ-চেতনা তাঁদের মনের পক্ষে এমন পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যে, তাঁরা হয় তা থেকে পালাতে চান, নয়, তা থেকে পাঠকসাধারণের মন সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করেন।

পাঠকদের সঙ্গে বিস্তৃত সংযোগ তখনই ঘটে যখন কবির নিজের কথা শুধু তাঁর নিজের আর থাকে না। আগের বিভিন্ন কালে ধর্ম এবং সমাজ অথবা নতুন সমৃদ্ধি থেকে উদ্ভূত একই মানসিক আবহাওয়ার ভিতরে কবি ও তাঁর পাঠক বা শ্রোতার এক সহজ যোগাযোগ ছিল। এখন সে-সংযোগ বিনষ্ট। বর্তমান আজ বিচ্ছিন্নতার প্রতিরূপ। এখনকার সংযোগ এখনকার মতো ক'রেই ঘটতে পারে। সমাজ-বাস্তবের যে-যন্ত্রণা আজ মানুষের অস্থিমজ্জায় এবং ভবিষ্যতের যে-আকাঙ্ক্ষা তার রক্তে অথচ যা নিয়ত প্রতিহত, কবি ও পাঠকের মধ্যে সেই তো একমাত্র সাধারণ ভূমি। সেইখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে তা শোনবার জন্যে পাঠকদের উৎসুক হওয়া স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে

যা দুর্বোধ্য, সে-ক্ষেত্রে বেশি দিন তা দুর্বোধ্য থাকে না। অবশ্য তার মানে এই নয় যে প্রত্যেক রচনাকে এক বিশেষ ছাঁচে ফেলতে হবে। এমন প্রস্তাব নিতান্তই হাস্যকর। বস্তুত, কোনো সৃজনশীল ক্ষমতা সেরকম যান্ত্রিকতাকে মেনে নিতে পারে না, মেনে নেয় না। তা নয়। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির অন্তরঙ্গ আবহাওয়া যদি সাধারণ জীবনের আবহাওয়া না হয়, তাহলে তা থেকে মানুষ দূরে স'রে যাবেই।

বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও আধুনিক কবিতা

আমি কল্পনা করতে পারি না ষোড়শ শতকে কোনো বাঙালী কবি বলছেন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে রচনার বিভিন্ন আঙ্গিক আমাদের বেছে নিতে হবে, প্রচলিত গতানুগতিক ছাঁচ বাতিল করতে হবে, কিন্তু আমাদের লিখতে হবে সংস্কৃতে নয়, মাতৃভাষা বাংলায় এবং তাকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত দেশজ শব্দাবলী গ্রহণ করতে হবে আর সেই সঙ্গে নতুন শব্দ তৈরি করতে হবে। এবং একথা কবি বলছেন গদ্য-নিবন্ধে। আমি কল্পনা করতে পারি না সপ্তদশ শতকে সমস্ত বাঙালী কবি ও লেখক দুই দলে বিভক্ত হয়ে গদ্যে ও পদ্যে—প্রধানত গদ্যে—দারুণ তর্কে মেতে উঠেছেন: এক পক্ষ বলছেন সংস্কৃত সাহিত্যের পদ্ধতিপ্রকরণ আমাদের অনুকরণীয়, অপর পক্ষ বলছেন তা আমাদের আদর্শ হতে পারে না, কারণ আমরা সেই সময়ের লেখকদের চাইতে জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে এসেছি এবং প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় আমাদের নতুন সৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে শ্রেষ্ঠ। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ ঘটনা অকল্পনীয়। কিন্তু যদি 'সংস্কৃত' শব্দটির জায়গায় বসাই 'লাতিন' ও 'গ্রীক' এবং 'বাংলা' শব্দটির জায়গায় 'ফরাসী', তাহলে দেখতে পাই এ ঘটনা এক ঐতিহাসিক সত্য। ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে "প্লেইয়াদ" গোষ্ঠীর মুখপাত্ররূপে প্রখ্যাত কবি দ্যু বেলে লিখেছিলেন: Défense et Illustration de la Langue francaise (ফরাসী ভাষার সমর্থন এবং মহত্ত্বসাধন), যাতে কবিতার সংস্কার সম্বন্ধে উপরের ঐসব অভিমত প্রচার করা হয়েছিল। আর সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে ফ্রান্সে চলেছিল প্রাচীন ও নবীনের ঐ বাদ-বিতণ্ডা, যা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে La Querelle des Anciens et des Modernes (প্রাচীন ও আধুনিকদের বিবাদ) নামে খ্যাত। ষোড়শ শতকে শুধু ফ্রান্সেই নয়, ইংলণ্ডেও একই রকম ঘটনা ঘটে: স্যর ফিলিপ সিড্‌নি রচনা করেন তাঁর কাব্যবিষয়ক চিন্তা ও বিচার, সম্ভবত ফরাসী দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েই। আর সপ্তদশ কিংবা পূর্ববর্তী ষোড়শ শতাব্দীই বা কেন, আমরা যদি আরো আড়াইশ বছর পেছিয়ে ইতালীতে যাই, তাহলে দেখতে

পাব দান্তে তাঁর প্রথম প্রধান গ্রন্থ লিখছেন ভাষা ও সাহিত্যের সমস্যা সম্বন্ধে। যদিও সে-গ্রন্থের রচনা লাতিন গদ্যে, কিন্তু তাতে তিনি সাহিত্যিক পরিস্থিতি বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন যে. কাব্যের আদর্শ ভাষা হল সর্বসাধারণ-কথিত উপভাষা, এবং এই ঘোষণার সঙ্গেই তিনি বিচার করছেন কাব্যে বিভিন্ন ছন্দ ও বিষয়ের উপযোগিতা। ইতালীর সেই পথ-প্রদর্শনের পরিণামে পরবর্তী-কালে সাহিত্যের নবজন্ম ঘ'টে যায় ফ্রান্সে আর ইংলণ্ডে।

আমাদের কাছে এক পরম বিস্ময় এই বিচার, এই বিতর্ক, এই সিদ্ধান্ত। কেননা আমাদের এখানে ওসব উদ্যম সুদূরপরাহত ছিল। প্রতিভাবান কবিরা অবশ্য কার্যত অর্থাৎ তাঁদের রচিত কাব্যে লোক-ভাষা ব্যবহারের নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। এদিক থেকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল আজও আমাদের চমৎকৃত করে। তার বিবরণে এই ভাষা ব্যবহার বাংলার প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবহাওয়াকে যেন আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ক'রে তোলে, যে-কারণে এমন এক সজীবতা—freshness—এ কাব্যে আমরা পাই যা প্রাচীন সাহিত্যে সুলভ নয়। কিন্তু আমাদের কবিরা কাব্যসাহিত্য বিষয়ে তাঁদের চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশ্যে কখনো খুলে বলেননি। এই নীরবতা চলেছে দীর্ঘকাল, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। সুতরাং তাঁদের এ বিষয়ে যুক্তি অনুসারী কোনো নির্দিষ্ট চিন্তা ও সিদ্ধান্ত ছিল কি না সে সম্পর্কেই সন্দেহ হয়। তাঁরা কাব্যভাষায় নিজস্ব নতুনত্ব যা প্রবর্তন করেছেন তা সহজাত বোধ থেকেই ব্যক্তিগত প্রেরণায় করেছেন, এইরকম ধ'রে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাঁদের সৃষ্ট কাব্যই এ ধারণাকে সমর্থন করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী একই ছাঁচে কাব্য রচনা ক'রে যাওয়া তো কোনো চিন্তার পরিচায়ক নয়, তা চিন্তাহীনতারই সাক্ষ্য। অবশ্য একটা বাস্তব অন্তরায় ছিল তাঁদের পথে—বাংলায় কোনো লেখ্য গদ্য ছিল না। গদ্য না থাকাটা আমাদের ইতিহাসগত সমগ্র সাহিত্যিক বিবর্তন ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যার চাবিকাঠি ব'লে আমার মনে হয়। গদ্যের অভাব যেমন এক বাহ্যিক অবস্থার পরিচয়বহ, তেমন এক মানসিক অবস্থারও। কেন গদ্যের সৃষ্টি হয়নি, এই প্রশ্নে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তব এবং জীবনদর্শন, সবই একাধারে জড়িত।

আমরা তো জানি মানুষ আত্মপ্রকাশের জন্যে প্রথমে অবলম্বন করেছে গান ও সুর। সেই সূত্রেই এসেছে কবিতা। মৌখিক থেকে ক্রমে লিপিতে। গদ্যের উদ্ভব অনেক পরে। কাজ-চালানো কথাবার্তা ছাড়াও অন্য কথা বলার

প্রয়োজন যখন সে অনুভব করেছে তখন। সে-প্রয়োজন দেখা দেয় বাস্তবের ক্রম-বিবর্তনে এবং বুদ্ধির ক্রম-প্রসারে। বাস্তব স্তরের অনেক কথা, যুক্তি-নির্দেশিত অনেক কথা সে অন্য সকলকে জানাতে চায় ব'লে গদ্য রচনার আশ্রয় নেয়। এমন বক্তব্য যা কবিতায় বললে চলে না। এ বক্তব্যের বিষয় নানারকম হতে পারে: বাইরের কোনো পরিস্থিতি, অপরের কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অথবা নিজেরই কাজ। যদি কবিতাই প্রসঙ্গ হয়, তাহলে আবার কবিতায় তা বলার তো মানে হয় না। অন্য সকলকে বলা, অন্য সকলকে জানানো—এটাই এখানে প্রধান কথা। আশ্চর্য এই যে, বহু শতাব্দীকাল আমাদের লেখকদের মনে এই প্রয়োজনবোধ জাগেনি। কখনো যদি জেগেও থাকে, তা প্রকাশ পায়নি। সেই জন্যে দেখি আমাদের ভাষায় উনিশ শতকের আগে কখনো কোনো ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লেখা হয়নি। না বাংলায়, না সংস্কৃতে, যদিও সংস্কৃতে গদ্যের প্রচলন ছিল। সংস্কৃতে গদ্য থাকা সত্ত্বেও যে সেরকম কোনো বৃত্তান্ত লেখা হয়নি, তা থেকে এক গূঢ়তর মানসিকতাই প্রকাশ পায়। তা হল দেশগত বাস্তব সম্বন্ধে নির্বিকারত্ব। আর সন্ধ্যাকর নন্দীর সংস্কৃত কাব্য 'রামচরিত'কে রামপাল-বিগ্রহপালীয় ইতিহাস রূপে ব্যাখ্যা করতে গেলে নিশ্চয় গলদঘর্ম হতে হবে। ও ধরনের রচনাকে ইতিহাস বলে না। অথচ অন্য দেশে ভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে। ফরাসী লেখ্য গদ্যের উদ্ভব যখন হয়নি তখন অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর ফ্রান্সের রাজবৃত্তান্ত লেখা হয়েছে লাতিন গদ্যে।

যে-কালে ধর্ম এবং ঈশ্বরের চিন্তা ছিল সর্বপ্রভাবী সে-কালে সমস্ত রচনায় তাই যে মূল বিষয় হবে সেটা স্বাভাবিক। আমাদের দেশের মতো অন্যান্য দেশেও তাই হয়েছে। কাব্য এবং নাট্য ছিল সেই সব রচনার মাধ্যম। কিন্তু এই ধর্মের সূত্রেই ফ্রান্সে গদ্যেরও জন্ম হয়। আধুনিককালে নয়, জন্ম হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ ঘটনা ঘটে ফ্রান্সে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের আড়াইশ বছরেরও বেশি আগে। আরো উল্লেখ্য, ফরাসী এবং বাংলা ভাষার জন্ম প্রায় একই সময়ে, বয়সে ফরাসী বাংলার চাইতে অল্প কিছু বড়। এ ফরাসী রচনা শুধু প্রথম গদ্যই নয়, প্রথম ইতিহাস। ভিলারদুয়ঁ্যা যোদ্ধা হিসেবে গিয়েছিলেন ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডে, তারই বৃত্তান্ত তিনি লেখেন তাঁর ধারাবিবরণীতে যার মধ্যে আমরা পাই মানুষের অর্থলোভ, ক্ষমতালিপ্সা, দ্বন্দ্ব ও আকাঙ্ক্ষার এক তথ্যসমৃদ্ধ চিত্রণ এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় পরিস্থিতির বর্ণনা। লেখক হিসেবে ভিলারদুয়ঁ্যার বৈশিষ্ট্যও তাতে স্পষ্ট। তার পরের দুই শতাব্দীতে

পরপর তিনজন অনুরূপ বিশিষ্ট ঘটনা-কথকের আবির্ভাব হয়। পক্ষান্তরে, আমাদের এখানে সেই যুগে দূরে থাক তার পরেও বহু যুগ কোনো লেখক এ দেশের বাস্তব ঘটনা বা অবস্থার বিবরণ লিখতে অগ্রসর হননি। যা কিছু ইতিহাস বা বৃত্তান্ত আছে, তা লিখেছেন বহিরাগত বিদেশীরা তাঁদের গদ্য-ভাষায়।

সমগ্রভাবে দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? মঙ্গলকাব্যে, বিশেষত মুকুন্দরামের মতো প্রতিভাশালী কবির রচনায় অবশ্যই বাঙালীর জীবনযাত্রার এবং বিভিন্ন মনুষ্যচরিত্রের ছবি ফুটে উঠেছে, কিন্তু সে তো সাহিত্যিক প্রাসঙ্গিকতা, দেশ-চেতনার সৃষ্টি তা নয়, যদি হত তাহলে দেবদেবীর ক্রিয়াকলাপ কাহিনীতে সরাসরি যুক্ত হত না। মুকুন্দরামের রচনায় চরিত্র-চিত্রণ বর্ণনা ইত্যাদির চমৎকারিত্বে সকলেই মুগ্ধ হন এবং কেউ কেউ উৎসাহিত হয়ে অনুমান করেন যে, তিনি আমাদের কালে জন্মালে ঔপন্যাসিক হতেন। তা হয়তো হতেন, কিন্তু প্রশ্ন হল তাঁর কালে হননি কেন। তাঁব কালেই তো একাধিক দেশে অসাধারণ সব কাহিনীকার জন্মেছেন, যথা—ফ্রান্সে রাব্‌লে এবং স্পেনে থেরভানতেস, যাঁদের রচনা মূলত ছিল তাঁদের অভিজ্ঞতার ও দৃষ্টির আলোকে মানব-সমাজ ও মানব-আচরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং সমালোচনা। তৎকালীন গদ্য-কাহিনীকার হিসেবে ইংলণ্ডের স্যর ফিলিপ সিড্‌নি এবং টমাস ন্যাশ-এর নামও করা যায়। গদ্য-কাহিনীর জন্ম অবশ্য আরো অনেক আগে ইতালীতে দান্তের প্রায় সমসময়ে যখন বোকাচ্চো লিখেছিলেন দশ দিনের কাহিনী 'দেকামেরন'। আসলে, অবাস্তব কথন যদি প্রশ্রয়ও পায় তবুও গদ্যের অবলম্বনে যেভাবে বাস্তবের সম্মুখীন হবার দায় থাকে, আমাদের লেখকদের মন তাতে সাড়া দেয়নি। তাঁদের এই উৎসাহহীনতার কারণ নির্ণয় গবেষণাসাপেক্ষ। আমার বিশ্বাস, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস এবং সাহিত্যশাস্ত্র বিশেষজ্ঞেরা তা আমাদের জানাতে পারবেন। এ বিষয়ে আলোকপাত করবার যোগ্যতা আমার নেই। তবে কয়েকটা কথা এ প্রসঙ্গে আমার মনে আসে, সহজ কথা। এই বাস্তব-উপেক্ষার মূলে একটা বড় ব্যাপার ছিল পরাধীনতা। বঙ্গের অধিবাসীরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই পরাধীন। বিদেশী মুসলমান শাসকদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল ভিন্ন। তবু তাঁদের কেউ কেউ যে হিন্দুদের সাহিত্য রচনাকার্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এ কথা ঠিক; কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁদের

রাজত্বের প্রতি মানুষকে ঘৃণাক্ষরে বিরূপ করতে পারে এমন রচনা তাঁরা বরদাস্ত করতেন না। তাহলে গদ্যের বিবরণ, গদ্যের বক্তব্য কী নিয়ে লেখা হবে? কেন লেখা হবে তাহলে গদ্য? আধ্যাত্মিকতা এবং পৌরাণিক ভিত্তিতে মানুষ ও দেবতাদের কল্পিত ঘনিষ্ঠতা বিষয়বস্তু হিসেবে নিরাপদ এবং তা রূপায়ণের পক্ষে কাব্যই প্রকৃষ্ট মাধ্যম। উপরন্তু, শাসকদের চোখে তা পরোক্ষ উপায়ে সহজে ক্ষমতা বজায় রাখার পক্ষেও অনুকূল। সুতরাং বুদ্ধিমান মুসলমান শাসকদের তো এমন পৃষ্ঠপোষকতা করাই স্বাভাবিক ছিল, যার সঙ্গে খ্রীষ্টান ইংরেজ শাসকদের হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মানুকূল্য নীতির তুলনা করা যেতে পারে।

তখনকার সেই নির্বিরোধ মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব ক'রেই কি আমাদের কালে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতো ব্যক্তি বলেন: "মুসলমানগণ না আসিলে দুই ধর্মের সংঘর্ষজনিত প্রেরণার ফলস্বরূপ আমরা হয়তো কবির, নানক প্রভৃতি সাধুদিগকে পাইতাম না, এমনকি হয়তো চৈতন্যদেবকেও পাইতাম না। বঙ্গ সাহিত্য চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে অসামান্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে তাহাও হয়তো সমপরিমাণে মুসলমান নবাব বাদশাহগণের উৎসাহে হইয়াছিল। মুসলমানগণ আসাতে আমাদের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইয়াছে, স্বর্ণ-দেউল ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা আমাদের রাজলক্ষ্মীর কুণ্ডলের প্রধান মণিগুলি অপহরণ করিয়াছেন এবং অনেক সময় অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের আগমন যে মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে ঘটিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"

কিন্তু সমস্তটা ঐ বাইরের ব্যাপারই শুধু ছিল না। তার মূল প্রোথিত ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায়, ধর্মমতবাদে, জীবনযাত্রা-সঞ্জাত মানসিকতায়। গ্রামভিত্তিক জীবন, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ এবং ঐহিককে তুচ্ছ ক'রে পারলৌকিকের উপর গুরুত্ব আরোপ মনোগতিকে চালিত রেখেছিল এক সঙ্কীর্ণ একমুখী খাতে। অর্থাৎ লেখকের চেতনা কখনো স্বদেশ এবং স্বজাতির জীবনের সর্বাঙ্গীণ বাস্তবকে ছোঁয়নি। ফলে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অথবা পদানত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কেউ তেমনভাবে বিচলিত হননি। সুতরাং গদ্যের আর বিশেষ প্রয়োজন কী?

আদিকালে মানুষের সৃজনশীল মন সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন কবিতাকেই অবলম্বন করেছিল, তেমন আজও তার প্রত্যক্ষ আবেগ-অনুভূতির প্রথম ও

প্রধান অবলম্বন কবিতা। কিন্তু মানুষ ইতিহাসের সময়ের স্রোতে যত অগ্রসর হয়েছে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা যত সঞ্চয় করেছে, তার দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে যত প্রসারিত হয়েছে, ততই সে তার বিবিধ ও বিশিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করবার জন্যে কবিতা ছাড়াও অন্য প্রকাশ-মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করেছে। গদ্য রচনা সেইভাবেই এসেছে। গদ্য ও পদ্য প্রথমে হয়তো লেখকভেদে রূপ নিয়েছে। কিন্তু ভেদটা কৃত্রিম, যে-কোনো সময়ে তা একজনের মধ্যেই লুপ্ত হতে পারে। কবিরা মনুষ্যসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ইতিহাসের বিবর্তনে তাঁদেরও বিবিধ বক্তব্য প্রকাশের উপলক্ষ্য সৃষ্টি হয়। তাঁরা কবিতার পাশাপাশি গদ্যেও তাঁদের বিশেষ বিশেষ বক্তব্য বলতে আরম্ভ করেন। যেমন ফ্রান্সে ষোড়শ শতকে এবং ইতালীতে চতুর্দশ শতকে ঘটে। আর শুধু গদ্যেই বা কেন, পদ্যেও বিষয়ান্তর দেখা দেয়, কবিতার বক্তব্যে ও রূপে বৈচিত্র্য আসতে থাকে। বাস্তবের অভিঘাত হৃদয়কে নাড়িয়ে নতুন কথা বলায়, নতুনভাবে বলায়। ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রান্স ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার মতোই অস্থির পরিস্থিতিতে ছিল: ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত এবং নানা অত্যাচার ও অনাচার সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ ক'রে তুলেছিল। সেই অবস্থায় রঁসারের মতো প্রেম ও প্রকৃতির কবিও তাঁর নতুন কাব্যরচনা 'দিস্‌কুর'-এ আহ্বান জানান অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের, এমনকি হিংসা দ্বারা হিংসা রোধের। তাঁর অভ্যস্ত ধারা থেকে স'রে এসে তিনি স্বদেশের দুঃখদুর্দশার কথা এবং তার পুনরুজ্জীবনের বাণী কণ্ঠে নিয়ে যে নতুন কাব্যধারা প্রবর্তন করেন, ঊনবিংশ শতকে ভিক্‌তর হ্যুগোর বিপুল কাব্যসৃষ্টিতে তা প্রতিধ্বনিত হয়। আর সদ্যপ্রয়াত লুই আরাগঁ তাঁর অসাধারণ কবিকর্মে সেই ধারাকেই আবার জীবন্ত ক'রে তোলেন এই শতাব্দীতে। এবং রঁসারের প্রায় সমকালেই আগ্রিপা দোবিন্যেঁ তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'ত্রাঝিক' লেখেন দেশাত্মবোধ এবং মানবপ্রেমের আবেগে। এই দীর্ঘ কাব্যে তিনি ব্যক্ত করেন স্বদেশ ধ্বংসের জন্যে দায়ী স্বৈরাচারীদের প্রতি ঘৃণা আর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা। ঈশ্বর বিশ্বাসই ছিল তাঁর অনুপ্রেরণা, কিন্তু তা তাঁকে প্রণোদিত করেছিল দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্যের অনুধ্যানে, কোনো পৌরাণিক অলৌকিকতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি।

এ রকম অন্য ভাবনায় আমাদের কবিদের আবেগ কখনো মথিত হয়নি। তাঁরা যেন স্থাণু হয়েছিলেন একই জায়গায়। অথচ প্রতিভার নিশ্চিত স্বাক্ষর

তাঁরা অনেকেই রেখে গিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমাবেগ-উৎসারিত লিরিক, এমনকি বহুকাল পরবর্তী রামপ্রসাদের ভক্তিগীতি তার নিদর্শন। আমাদের সাহিত্যের তা সম্পদ। কিন্তু লক্ষণীয় হল এই যে, মানুষের পার্থিব সুখদুঃখের সঙ্গে তা জড়িত নয়, মানুষের পারস্পরিক অনুভূতি তাতে ঘর পায়নি। প্রেমকে মানবিক স্তরে না রেখে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে। আর শাক্ত ভক্তিকাব্য তো সম্পূর্ণ ধর্ম-প্রাণিত ও ধর্ম-সর্বস্ব। আমাদের মধ্য-যুগীয় সামাজিক অস্তিত্ব এত দীর্ঘস্থায়ী হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আমাদের সাহিত্য পদ্ধতিপ্রকরণে পুনরাবৃত্তির পথ ধ'রেই চলে: পৌরাণিক দেবতা আর পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সরল ও অলীক কাহিনী বিন্যাস এবং দেবদেবীকে লক্ষ্য বা উপলক্ষ্য ক'রে আবেগের উৎসারণ। শ্রীচৈতন্য-অনুপ্রাণিত সাহিত্যকে অবশ্য কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবতা স্পর্শ করেছিল এবং সেই সঙ্গে তা সাহিত্যিক গুণেরও পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু তার বিষয় এবং উদ্দেশ্য তো স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পূতজীবন ও বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যান।

সমাজ-জীবনের স্তব্ধ গতি আমাদের সাহিত্য-জীবনে অবক্ষয়ই নিয়ে আসে। ভারতচন্দ্রের শব্দ-সচেতনতা এবং কাব্যকৃতির কুশলতা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর গতানুগতিক মঙ্গলকাব্য রচনা এবং হাস্যকর ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্ভাবন ও বর্ণন অবক্ষয়েরই নিদর্শন, যার মধ্যে সর্বপ্রকার জীবন-ভাবনা বর্জন ক'রে প্রধানত আদিরসকেই উপভোগ্য ক'রে তোলা হয়। এর অন্তিম পর্যায়ে কবির লড়াই, খেউড়, তরজা আর হাফ-আখড়াইয়ের মতো উপসাহিত্য বা অপসাহিত্যের আসর জমানো আশ্চর্যের কিছু নয়। সেটাই স্বাভাবিক।

আমাদের এ অবস্থাটা পরিষ্কার ফুটে ওঠে যদি পাশাপাশি অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের দিকে তাকাই। দেখতে পাই সারা শতাব্দী জুড়ে সেখানে সাহিত্য-সৃজন ও মননের ক্ষেত্রে বিপুল আলোড়ন। ভলতের-এর ক্ষুরধার রচনায় গতানুগতিক ধ্যানধারণা ছিন্নভিন্ন, রুসোর দৃষ্টি ও অনুভূতির প্রকাশে জীবনের নতুন পথ উদ্ভাসিত, আর দিদরো এবং তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিকষে সমস্ত কিছুর যাচাই চলছে বিশ্বকোষের খণ্ডে খণ্ডে। শুধু জনসমাজেই নয়, সৃজনী সাহিত্যেও প্রস্তুত হচ্ছে বিপ্লবের ক্ষেত্র। এই লিখন-তৎপরতার সবটাই অবশ্য গদ্যের আধারে। সাহিত্যের দিক থেকে আমি একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি। সেটা এই যে, ফ্রান্সের তৎকালীন এবং পরবর্তী সাহিত্যিক ঘটনা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে,

সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গদ্য ও পদ্যের ভিন্নতায় বন্দী হয়ে থাকে না, অর্থাৎ তাদের মধ্যে ভেদরেখাটা তাদের পরস্পর-সংযোগের, পরস্পর-পরিপূরণের বা পরস্পর-অনুবর্তনের পথে কোনো বাধা নয়। সেটাই প্রমাণিত হয় এ ক্ষেত্রে, কেননা রুসোর গদ্যরচনা এবং তাঁর কিছু পরে শাতোব্রিয়াঁর গদ্যরচনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রবল ফরাসী রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনের উৎসস্বরূপ। আধুনিক সাহিত্যে গদ্য-কবিতার প্রচলনও তার এক প্রমাণ।

আমাদের প্রচলিত সাহিত্যের বদ্ধজলায় এক আমূল আলোড়ন আসতে কিন্তু তখন আর বেশি দেরি ছিল না। সে-ধাক্কাটা এল বিদেশ থেকেই। আর আশ্চর্য, এল গদ্যেরই মারফৎ।

দুই

বাংলার সাহিত্যিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল উনিশ শতকের শুরুতে, যার সূত্রপাত গদ্যরচনায়। সেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব। ইংরেজ শাসকেরা তাদের রাজস্বার্থে এবং ইংরেজ ও অন্য শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজকেরা তাদের ধর্মস্বার্থে (দুই স্বার্থ অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে মূলত এক) বাংলা ভাষায় লেখ্য গদ্যের সূচনা করেন। তারপর শিক্ষিত বাঙালীরা তার চর্চা আরম্ভ ক'রে দেন। বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা তাঁদের বুঝিয়ে দিয়েছিল গদ্য লেখার প্রয়োজন কত। কেননা সকলের কাছে সকলের সামনে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপনের সেই ছিল প্রধান উপায়। এবং নিজেদের বক্তব্য মানেই নিজেদের সম্বন্ধে চেতনা—দেশ, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনৈতিক অবস্থা সব বিষয়ে। তাই বাঙালীর গদ্য-রচনার উদ্যম আত্ম-আবিষ্কার যাত্রারই নামান্তর। এখানে জরুরী কথা এই যে, আমাদের চিন্তাটা এসেছিল ইংরেজী শিক্ষার কারণে, সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চার দ্বারা নয়। বাংলা কবিতার নবজন্মের মূলেও ঐ শিক্ষা। কলকাতা শহর ছিল শিক্ষাকেন্দ্র, কাব্যের আধুনিকীকরণে তার স্থান অনন্য। কোনো লেখক যথাবিধি ইংরেজী না শিখে থাকলেও কলকাতার শহর-জীবনে তার সংস্পর্শ যে তাঁর পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, এটা সহজেই অনুমান করা যায়। যেমন হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে।

প্রথম পর্বে গদ্যই ছিল সর্বব্যাপী, হয়তো নতুন নির্মাণের উত্তেজনায়।

তারপর কবিতা এল গদ্যের পাশেই একেবারে নতুন চেহারা নিয়ে। এটা যেন এক অন্তবর্তীকাল যখন প্রাচীন কাব্যরীতি এবং আসন্ন নব কাব্যতৎপরতার মধ্যে ব্যবধান রচিত হচ্ছে। বাংলা গদ্য-চর্চার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটছে। কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় এতদিনকার অবহেলিত বাস্তব সম্বন্ধে যেমন ক্রমে বেশি সচেতন হয়ে উঠছেন, তেমনি ইংরেজীর মারফৎ পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির পরিচয়ে চমৎকৃত হচ্ছেন। তার ক্রিয়া পরিণতি পেল মাইকেল মধুসূদনের অভ্যুদয়ে। এই মধ্যবর্তী গদ্যপ্রধান কালের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যিনি তাঁর নিত্য-গদ্যের সঙ্গেই চর্চা করেন কাব্যের। কবি হিসেবে তিনি যতই অকবি হোন, তাঁর কাব্য যতই সাংবাদিকতাধর্মী হোক, আমি মনে করি একটি কারণে সমস্ত বাঙালী কাব্যপ্রেমিকের কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রাপ্য। কারণ তিনিই প্রথম বাংলা কাব্যের প্রচলিত পুরোনো ছক ভেঙে দেন এবং কবিতার মুখ ঘুরিয়ে দেন বাস্তব জীবনের দিকে। এই বাস্তব-বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ধানী দৃষ্টিতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে। কবিওয়ালাদের ধারায় ঈশ্বরচন্দ্রকে অনেক বিষয়ে দেখা হয় বটে, কিন্তু তাঁর সমস্ত কবিওয়ালা-সংযোগ সত্ত্বেও, তাঁর সমস্ত কাব্যিক রঙ্গব্যঙ্গ সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য দুস্তর। কেননা উভয়ের মানসিক অবস্থান দুই স্তরে। সংবাদপত্রের পরিচালক ও লেখক যিনি, তাঁর মন নিশ্চয় কবিওয়ালা সদৃশ নয়। বাস্তবকে ভাঁড়ামির খোরাক করা কিংবা লঘুতার খাতিরেই লঘুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর চারিত্র্য হতে পারে না, কেননা সেখানে গুরুতর সমাজ-ভাবনা ও মানব-ভাবনাই প্রধানত সক্রিয়। ঈশ্বরচন্দ্রের মানসিকতা যে কবিওয়ালার মানসিকতা নয়, 'সংবাদ প্রভাকর'-এর স্থাপনা ও পরিচালনাই তার প্রমাণ। এ সম্পর্কে এও মনে রাখা উচিত যে, তিনি ছিলেন প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও নায়ক, যেজন্যে তিনি এমনিতেই আমাদের নমস্য। ভারতচন্দ্র এবং কবিগান টপ্পা আখড়াই-রচয়িতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর যে-আগ্রহ ছিল তা তাঁর সমাজ-ভাবনারই অন্তর্গত। তা কতখানি যুক্তিপন্থী ছিল সে অন্য প্রশ্ন। তিনি যথারীতি ইংরেজী শেখেননি, তবুও ইংরেজী শিক্ষিতদের কেন্দ্রভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এক উচ্চতম বুদ্ধিজীবী বৃত্তিতে: সাংবাদিকতায়। সুতরাং তাঁর চরিত্র ও মানসিকতা যে সম্পূর্ণ পৃথক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরচন্দ্রের রঙ্গরস মূলত নিছক রঙ্গরস ছিল না, তার অন্তরালে একটা তিক্ততা ছিল, যা বেদনারই নামান্তর। এবং তাঁর আক্রমণ এবং তথাকথিত প্রতি-

ক্রিয়াশীলতা কোনো কোনো ব্যাপারে যে অহেতুক ছিল না তা আজ আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন নয়, বিশেষত আমাদের আজকের ইঙ্গ-বঙ্গ সামাজিক অভিজ্ঞতার পটে। ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজীবিদ ছিলেন না ব'লে তাঁর কবিতার হাবভাব পুরোপুরি তৎকালীন দেশী, কোনো বিদেশী সাহিত্যের আলো তাকে সরাসরি পথ দেখায়নি, যদিও বিদেশী সাহিত্যকে তিনি আদৌ অশ্রদ্ধা করতেন না। পরবর্তী বাংলা কাব্যসৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এটা এক বৈশিষ্ট্যই বলতে হবে। তবে জানি না তিনি দীর্ঘজীবী হলে তাঁর কবিতার এই চারিত্র্য আমাদের কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত। সবই তো নির্ভর করে সৃষ্টি প্রতিভার উপর।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যাঁর প্রতিভার স্পর্শে বাংলা কাব্যে যুগান্তর ঘ'টে গেল, তিনি মধুসূদন দত্ত। এই যুগান্তরের মূল কথা হল পাশ্চাত্যের কাছে বাংলার দীক্ষাগ্রহণ। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে বাঙালী কবিরা খুঁজে পেলেন পুনরুজ্জীবনের বীজমন্ত্র। তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল ইংরেজী শিক্ষা। ঐ শিক্ষাই বহু শতাব্দীর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল, জাগিয়ে তুলেছিল সর্বাঙ্গীণ জীবনের চেতনা, যার প্রথম প্রকাশ গদ্যে। যাঁরা কবিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাঁদের পক্ষে স্বভাবতই নিশ্চিন্ত অভ্যাসে গতানুগতিক পদ্ধতিতে কাব্য রচনায় ভিড়ে যাওয়া আর সম্ভব রইল না। মধ্যযুগীয় সমাজের ভাঙনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিন্ন বাস্তব পরিবেশের অভিজ্ঞতা তাঁদের শুরু হয়েছে তখন। শাসক হিসেবে এবং শিক্ষাগুরু হিসেবে ইংরেজরা পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে তাঁদের জাতিবোধকেও জাগিয়ে দিয়েছেন। এই উন্মীলিত দৃষ্টির সামনে এসে গিয়েছে ইংরেজী এবং অন্য পাশ্চাত্য সাহিত্যসম্ভার, বিশেষত কাব্য। ভাবে ও রূপে বিচিত্র এবং বিশাল সেই সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অভিভূত না হয়ে তাঁদের উপায় ছিল না। এ যাবৎ প্রচলিত কাব্যধারাকে টেনে নিয়ে চলা তাঁদের কাছে যেন অর্থহীন হয়ে গেল। এবার কেমন কাব্য লেখা উচিত সে সম্বন্ধে সজাগ হতে হল তাঁদের। সাধারণভাবে কবিকর্ম নিয়ে কবির ভাবনা সেই প্রথম আমাদের দেশে। সেই ভাবনা প্রকাশের উপায়ও যে পাওয়া গিয়েছে ইতিমধ্যে : গদ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাব্যশিল্প নিয়ে আমাদের প্রধান কবিরা প্রায় সবাই কিছু না কিছু বলেছেন। তবে তাঁদের ভাবনাটা বেশ দিশেহারা, তার মধ্যে সঙ্গতি ও মৌলিকতার অভাব। দুটো কারণে সেরকম হওয়া অপরিহার্য ছিল : প্রথমত, হঠাৎ পশ্চিমের আশ্চর্য সৃষ্টিসম্ভার এসে পড়েছিল সামনে, তারই অনুকরণে কাব্যরচনা তাঁদের মুখ্য অভিপ্রায় হয়ে উঠেছিল, এ অবস্থা সঙ্গত ও

স্বাভাবিক ধারণা তৈরি হওয়ার অনুকূল নয়; দ্বিতীয়ত, যে-সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিতে পাশ্চাত্যের কাব্যসাহিত্য ক্রমান্বয়ে রূপ নিয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের সমাজ-বিবর্তনের মিল ছিল না। উনিশ শতকে ইংরেজ শাসন দেশ-অতিক্রমী এক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের ঠেলে দিতে আরম্ভ করেছিল বটে, কিন্তু আমাদের জাতিগত বাস্তব অবস্থা পাশ্চাত্যের কারো মতো ছিল না। ফলে অনুকরণের ইচ্ছা-প্রণোদিত কাব্যোদ্যমে স্থানকালের বিভ্রান্তি না ঘ'টে পারে না। বিশ্ববাস্তবের বৃত্তে এই ব্যবধান অবশ্য ক্রমেই ক'মে এসেছে আমাদের বিশ শতকে। কবিদের মনোভাবে তখন একটাই সাধারণ নীতি ব্যক্ত: ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য কাব্যের কাছে পাঠ নিতে হবে। এমনকি ইংরেজী-অনভিজ্ঞ সর্বতোভাবে স্বদেশী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তার প্রয়োজন অস্বীকার করেননি।

কাব্যের এই নবতরঙ্গ যাঁরা সৃষ্টি করলেন বাংলা ভাষায়, তাঁদের মধ্যে প্রতিভায় মধুসূদন দত্ত নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্য, কিন্তু আমার মনে হয়, কাব্য-ভাবনায় সবচেয়ে বিভ্রান্ত। নবকাব্য রচনায় তাঁর সামান্য পূর্বগামী (যদিও বয়সে নয়) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে সর্বপ্রথম কাব্য লিখতে গিয়ে তাঁর উদ্যম সম্বন্ধে যতটা সচেতন বোধের পরিচয় দিয়েছেন, মধুসূদনে ততটারও অভাব আছে। তুলনামূলকভাবে তাঁর অনুগামী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবকাব্য-ভাবনাই স্বাভাবিকতায় এবং কালোপযোগিতায় সবচেয়ে অগ্রসর। মধুসূদনের আবেগ-তাড়িত স্বভাব সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তারই পরিপন্থী ছিল। কিন্তু ভাবনা এক আর সৃষ্টি আরেক। সৃষ্টি সাফল্য বা মহত্ত্ব তো ভাবনা থেকে তৈরি হয় না, তার উৎস এক অনির্দেশ্য ক্ষমতা যা প্রাণবায়ুর সহোদর। সেখানে মধুসূদনের সমকক্ষ আর কেউ নেই।

আমাদের এই সাহিত্যিক নবপর্যায়কে র‍্যানেসাঁস ব'লে অভিহিত করা হয়। আক্ষরিক অর্থেই তা র‍্যানেসাঁস: পুনর্জন্ম। পূর্বজন্মের সঙ্গে তার যোগসূত্র বলতে গেলে শুধু বাংলা ভাষা। অন্য সম্পর্কগুলো প্রায় জাতিস্মরের স্মৃতির মতো। এই নতুন জন্মে তার মন ও অবয়ব ভিন্ন, এবং বৈদেশিক রীতিনীতি তার পরিচয়-চিহ্ন। ইংরেজী ভাষার সাহিত্যই এ জন্মে তার অভিজ্ঞান-পত্র। যাইহোক, আক্ষরিক অর্থ ছেড়ে দিয়ে পুনরুজ্জীবনের তাৎপর্যই ধরা যাক, যে-অর্থে পাশ্চাত্য সাহিত্যে তা প্রযুক্ত। শিল্প সাহিত্যে ইয়োরোপীয় র‍্যানেসাঁস-এর সঙ্গে আমাদের এ র‍্যানেসাঁস-এর আমূল পার্থক্য। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে

ইতালীতে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে যে-র‍্যানেসাঁস হয় এবং যা ক্রমে ইয়োরোপে সর্বত্র ছড়ায়, তা ছিল প্রাচীন গ্রীক-লাতিন সাহিত্যের মানব-মূল্যের ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়া। একই ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ইয়োরোপে সব দেশেরই তা ছিল একই ঐতিহ্য। কিন্তু আমরা স্বদেশী ধর্ম-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং বিদেশী ধর্ম-সংস্কৃতি ও প্রেরণার এক মিশ্রিত অনিশ্চিত ভূমিতে দাঁড়ালাম। সার্থক কাব্যসৃষ্টিতে বিষয়ের সঙ্গে যে-আন্তর সংযোগ তাকে স্বাভাবিক ক'রে তোলে, এভাবে তা ঘটে কিনা সন্দেহ। সুতরাং একটা অবাস্তবতা গোড়াতেই থেকে গেল। তবে এখানে একটা বড় প্রশ্নও আছে। আমাদের রামায়ণ-মহাভারত ছিল। বিস্তৃত মানব-ভাবনার উৎসরূপে অনেককাল আগেই তার দিকে ফেরা যেত। কিন্তু আমাদের বাঙালী কবিরা প্রাচীনকালেই বাংলা অনুবাদ মারফৎ তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ কখনো সেই পথে তাঁর সৃজনশীলতাকে চালিত করেননি, এবং সে-বিষয়ে তাঁরা কখনো কিছু ভেবেছিলেন এমন আভাসও দেননি। এটা আমাদের শিখতে হল ইংরেজের কাছ থেকে। সুতরাং পাশ্চাত্যের সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্যচিন্তাকে আদর্শ করার মধ্যে অন্যায় কিছু ছিল না।

এছাড়া ফ্রান্সের ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মতো, যা আমাদের সঙ্গে পার্থক্যটা স্পষ্ট ক'রে তোলে। ফরাসীরা যুদ্ধে গিয়েছিল ইতালীতে, জয়লাভও করেছিল, কিন্তু বিজিত ইতালীর শিল্পসাহিত্যের নিদর্শনে তারা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই অনুপ্রেরণায় ফরাসী শিল্পসাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। আর আমাদের এখানে সাহিত্যিক এই পুনরুজ্জীবন ঘটে বিজেতা ইংরেজের শিক্ষা মারফৎ, যে-শিক্ষা বিজিতের উপর চাপিয়ে-দেওয়া এবং যার একমাত্র আদর্শ ইংরেজী সাহিত্য। তাতে স্বেচ্ছা-নির্বাচনের কোনো অবকাশ ছিল না। এ দুই পুনরুজ্জীবনের তাৎপর্য মোটেই এক নয়।

মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভা কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তিনি আমাদের কাব্য-ভাষা এবং কাব্য-বাণীকে নতুন ক'রে গড়েছেন: তিনি ঘুমন্ত পয়ারকে ভেঙে অমিত্রাক্ষরের প্রাণস্পন্দ এনেছেন, সনেটের প্রবর্তনা করেছেন, ব্যাপক মানব-ভাবনা যেমন নিয়ে এসেছেন তেমন ব্যক্তিগত পার্থিব আবেগ ব্যক্ত করেছেন গীতিকবিতা রচনায়। বাংলা কাব্যে এ সবই অভিনব। তবু একথা কি অস্বীকার করা যায় যে, মাতৃভাষায় মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টির উদ্যমে কিছু কৃত্রিমতা ছিল? ইংরেজী কাব্যরচনায় খ্যাতিলাভ অসম্ভব জেনে তিনি

পরিকল্পনা ক'রে বাংলায় লিখতে আরম্ভ করেন এবং তাও লেখেন মাত্র বছর ছয়েক। এ অবশ্য তাঁর প্রচণ্ড সৃজনশক্তির পরিচায়ক, কিন্তু তাঁর কাব্যরচনায় ক্ষান্ত দেওয়া কবিতার সঙ্গে আত্মিক সংযোগের পরিচায়ক নয়। অলৌকিক প্রতিভাধর ফরাসী কবি র‍্যাবোও অবশ্য তিন বছর কবিতাচর্চা ক'রে যৌবনের প্রারম্ভে কাব্যকে বিসর্জন দেন, কিন্তু তার কারণ অনেক গভীরে। তিনি কবিতার কাছ থেকে বিদায় নেন যেহেতু তার মাধ্যমে জীবনের রহস্য উন্মোচনের এবং জীবনের রূপান্তর সাধনের যে-প্রত্যাশা তাঁর ছিল, তা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু মধুসূদনের বিদায়গ্রহণ এর প্রায় বিপরীত কারণে, মনে হয়। তিনি কোনো জীবন-জিজ্ঞাসায় বিচলিত ছিলেন না, অন্তরের কোনো সংবেদনা তাঁকে মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে উদ্রিক্ত করেনি। আর সেরকম সংবেদনা যদি তাঁর থেকেও থাকে, তবে তাঁকে তা এক শূন্যতাবোধেই অবসন্ন করেছিল ব'লে মনে হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্যে কাব্যপ্রতিমা নির্মাণের উদ্দেশ্য কখনোই লেখককে এমন শক্তি দেয় না যার দ্বারা তিনি শারীরিক ও মানসিক অবসাদ অগ্রাহ্য ক'রে সৃষ্টির কাজে আবিষ্ট থাকতে পারেন। মধুসূদন কাব্যরচনার ক্ষেত্রে সঙ্কল্প ক'রে মাতৃভাষার কাছে ফিরে এসেছিলেন এবং অতীতে তাকে অবহেলা করার জন্যে অনুশোচনাও প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে হৃদগত সংযোগ তাঁর ঘটেছিল কি? এ বিষয়ে একটা সাক্ষ্য আমাদের বেশ বিচলিত করে। বাংলা কবিতার সমস্যা এবং বাংলা কবিতার রূপান্তর সাধনের জন্যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনার কথা তিনি নানা চিঠিপত্রে ব্যক্ত করেছেন। এসব চিঠিপত্র তিনি লিখেছেন বাঙালী সুহৃদ্‌ ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে, কিন্তু সবই লিখেছেন ইংরেজীতে। এটা খুব আশ্চর্যের। কোনো ভাষার কবি কি সেই ভাষার কাব্য বিষয়ে, বিশেষত নিজের ভাবনা ও উদ্যম বিষয়ে সমভাষীর কাছে বিদেশী ভাষায় মনের কথা বলেন? কোনো অকৃত্রিম কবি-হৃদয়ের পক্ষে এ অস্বাভাবিকতা কী ক'রে সম্ভব, এই প্রশ্ন আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

তবু বাস্তব সত্য এই যে, মধুসূদন বাংলা কাব্যের যুগপ্রবর্তক। তাঁর উদ্যমে আধুনিক পর্বের সূত্রপাত, যার মূলে ছিল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অনুপ্রেরণা। কিন্তু মধুসূদনের কবি-স্বরূপ নির্ণয় করা আমার খুব কঠিন মনে হয়। তাঁর মধ্যে স্থিতিহীনতা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত। বিদেশী কবিদের তিনি আদর্শ ব'লে মেনেছিলেন, কিন্তু সে-গুরুবাদের মধ্যে কোনো সঙ্গতি নেই। হোমার দান্তে থেকে আরম্ভ ক'রে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বায়রন পর্যন্ত বিভিন্ন

প্রকৃতির কবিরা তাঁকে আকৃষ্ট করেছেন এবং তিনি তাঁদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। নিজস্ব কবি-চারিত্র্য থাকলে এরকম কি সম্ভব? এর প্রতিফলন তাঁর নিজের কাব্যেও দেখা যায়। মিলটনের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এবং বহু প্রাচীন কবির কাব্য-উপাদান মিশিয়ে তিনি মহাকাব্য লিখেছেন, যা সময়ের দিক থেকে ছিল প্রক্ষিপ্ত, সুতরাং যাতে স্বভাবতই রোমান্টিক সুর এসে গিয়েছে। তিনি গীতিকবিতার স্বাভাবিক প্রবণতা ইচ্ছে ক'রে ঠেকিয়ে রেখেও শেষ পর্যন্ত লিখেছেন, কিন্তু তাকে বেশির ভাগ সময় বিষয়ে ও শব্দাড়ম্বরে ভারাক্রান্ত করেছেন। তাঁর নিজের ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর কাব্যসৃজনের চালিকাশক্তিই ছিল যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা আর শিক্ষিত সমাজকে চমৎকৃত করার বাসনা, এবং তাঁর অভিপ্রায় ছিল কবিতার অলঙ্কার-আভরণ মনোহর ক'রে গড়া। এ সবেই তিনি সফল হন। কিন্তু কোনো মানবিক বক্তব্য বা অনুভব প্রকাশের অভিলাষ তিনি ব্যক্ত করেননি। অবশ্য কবি জীবনের অন্তিমকালে একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ পাচ্ছিল, যাকে হয়তো ব্যাখ্যা করা যায় এক শূন্যতাবোধের প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

যুগভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মধুসূদনের বিলম্বিত মহাকাব্য এক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। স্বধর্মের বিরুদ্ধে মধুসূদন বিদ্রোহ করেছিলেন এবং প্রথম জীবনে স্বভাষার বিরুদ্ধেও। তাঁর সেই গণ্ডীবদ্ধ বিদ্রোহী ব্যক্তিজীবন সম্ভবত এক বৃহৎ পটভূমিতে রাবণের বিদ্রোহী মানব-রূপ কল্পনায় তাঁকে প্রণোদিত করেছিল। তাঁর মাদ্রাজ-প্রবাসও দক্ষিণী ঐতিহ্য অনুযায়ী রাবণের ভিন্ন মূর্তি তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত করেছিল, এমন অনুমান কেউ কেউ করেছেন। দক্ষিণী ঐতিহ্য সম্বন্ধে বাস্তবিক তিনি কৌতূহলী এবং অবহিত হয়েছিলেন কি না জানি না, তবে তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাব অবশ্যই প্রচলিত নিয়ম ও আচরণের বিরোধী ছিল, সুতরাং তাঁর পক্ষে প্রচলিত ধারণাবিরুদ্ধ চরিত্ররূপে রাবণের কল্পনা অস্বাভাবিক নয়। এবং সাধারণভাবে বাঙালীকে তা আকৃষ্ট করাও স্বাভাবিক। যার বীর্যবত্তা কোনো অবস্থায় ম্লান হয় না, পরাজয় বা পরাজয়ের সম্ভাবনা যাকে হতোদ্যম করে না, এমন এক প্রতীকচরিত্রের আবেদন পরাধীন বাঙালীর কাছে প্রবল ছিল। কিন্তু মধুসূদন সেরকম সচেতনতা নিয়ে 'মেঘনাদ বধ' লিখেছিলেন কিনা সন্দেহ। কেননা ঐ শ্রেণীর মহাকাব্য লেখার অনিচ্ছাই তিনি অতঃপর প্রকাশ করেন। এছাড়া, 'মেঘনাদ বধে'র রূপগত এক বিশেষ আকর্ষণও বাঙালীর কাছে তখন ছিল। তা হল সম্পূর্ণ অভিনব কাব্য-আস্বাদনের

রোমাঞ্চ, শব্দসম্ভার ও শব্দঝঙ্কারের, বিশাল কল্পনা ও বিশাল পরিকল্পনার সম্মোহ।

মধুসূদন আর যে মহাকাব্য লিখলেন না তার কারণ মনে হয়, তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল দ্বন্দ্ব। উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমুখী সমাজ-পরিবেশে স্বভাবতই তিনি অন্তরে শুনেছিলেন গীতিকবিতার আহ্বান, কিন্তু তাঁর আড়ম্বরপ্রিয় গৌরবপিপাসু সচেতন মন তাতে সাড়া দিতে আপত্তি করেছিল। তবু শেষ পর্যন্ত তিনি লিখলেন গীতিকবিতা, তাঁর হৃদয়ের আকুতিও তাতে ব্যক্ত হল, যা বাংলা কাব্যে নতুন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সেই শেষ। তিনি আর অগ্রসর হলেন না। কোন্ শূন্যতার অনুভব তাঁর বাক্য হরণ করল? সে কি তাঁর কাব্যপ্রত্যয়ের অভাব? যে-মানবিক চেতনার স্বতোৎসারে কবিতা অবিরল-ভাবে রূপ নেয় তার কোনো ভিত্তি কি তিনি নিজের মধ্যে খুঁজে পাননি? মধুসূদনের কাব্য তাঁর জীবনের মতোই এক আত্মদ্বন্দ্বদীর্ণ ট্র্যাজিডি।

যে-কাব্যভাষা মধুসূদন নির্মাণ করেন, তা বাঙালীকে চমৎকৃত করেছিল। পয়ারভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে, শব্দবন্ধে, ক্রিয়াপদের নবগঠনে সে-ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শক্তি ও উজ্জ্বলতার মূর্তি। তবু একথা কি বলা যাবে যে, সে-ভাষায় স্বতঃস্ফূর্ততার, স্বাভাবিকতার প্রকৃতি ছিল, যার স্পর্শ আমরা মুকুন্দরামের প্রাচীন ভাষাতেও পাই? গীতিকবিতায় হৃদ্‌গত উপলব্ধি যে-মাইকেলী ভাষাকে আশ্রয় করেছে তা প্রায়ই কবিতাকে হৃদয়সংবেদ্য হতে বাধা দেয়। বোধহয় সেই কারণে মাইকেলী ভাষার চিহ্ন প্রচলিত কোনো সাধারণ বাক্‌ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। এই ১৯৮৩ সালে কোনো ফরাসীর কাছে ভিক্তর য়্যুগোর কাব্যভাষা যেমন খুবই নিকটের, আমাদের কাছে মাইকেলী বাক্‌বন্ধ তেমন খুবই দূরের। অথচ য়্যুগো জন্মেছিলেন তাঁর জন্মের বাইশ বছর আগে। এখানে আর একটা ব্যাপার উল্লেখ করতে চাই, যা থেকে মধুসূদনের সাহিত্যিক মানসিকতার এক বিশেষ প্রকৃতি ধরা পড়ে। মধুসূদন যে-সময়ে ফ্রান্সে ছিলেন, সে-সময়ে য়্যুগো তাঁর গৌরবের শিখরে। তাঁর প্রতি প্রবাসী বাঙালী কবি একটি সনেটে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সেটা খুবই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। কিন্তু ঐ কবিতায় তিনি শুধুই বলেছেন য়্যুগোর যশোলাভের কথা (টেনিসন এবং দান্তের উদ্দেশে রচিত সনেটেও সেই সুর), য়্যুগোর জীবন ও কাব্যের কোনো উল্লেখ নেই। মানুষের প্রতি ভালোবাসায়, অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে, অশুভকে ধ্বংস ক'রে কল্যাণময়

ভবিষ্যতের কল্পনায়, স্নেহপ্রেম দুঃখ-শোকের মানবিক প্রতিক্রিয়ায় যে-কবির জীবন ও কাব্য অবিরাম স্পন্দিত ছিল, তাঁর প্রসঙ্গে কেবল খ্যাতির উল্লেখ এক বিশেষ মনোগতির লক্ষণ নয় কি?

প্রতিভায় মধুসূদনের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও অন্য কবিরা কিন্তু আরো স্বাভাবিকভাবে যুগচেতনার শরিক হন। গীতিকাব্যপ্রবণতাকে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন অনেক সচেতনভাবে তাঁদের কব্যে স্থান দেন। এবং বাস্তব জীবনের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় তাঁদের আবেগ উচ্ছ্রিত হয়। পরাধীনতার গ্লানি এবং জাতীয়তাবোধ হেমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় প্রত্যক্ষ রূপ নেয়। তাঁব কাব্য-বক্তব্যের রূপায়ণ যতই অনুজ্জ্বল হোক, তাতে তাঁর ব্যক্তি-সত্তার এক সহজ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে দেশাত্মবোধকে স্পষ্টভাবে প্রসাবিত করলেন মানবতার জয়গানে। আবেগকে তিনি উচিত নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি বটে, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ হয় না। এঁদের প্রয়াস থেকে অন্তত এটা বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্য-অনুপ্রাণিত বাংলা-কাব্য দেশকালগত বাস্তবের জমিতে শিকড গাড়াব চেষ্টা করছে। কিন্তু একই সঙ্গে নানা অভীপ্সায় তা এলোমেলো। যেভাবে আমাদের কাব্যের নবপর্ব শুরু হয়, তাতে এরকম হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। কালটা ছিল গীতিপ্রবণতার এবং রোমান্টিকতার। গীতিকাব্য ও রোমান্টিক কাব্য মানেই নিবিড় লেখক-সত্তার স্ফুরণ, ব্যক্তি হিসেবে লেখকের আত্মচেতনার প্রতিষ্ঠা, যার বিচ্ছুরণে ভিতরের ও বাইরের সব কিছু অনন্যভাবে উন্মোচিত হয়, তাঁর হৃদয় সব কিছুর সংস্পর্শে আসে, এসে কখনো বক্তাক্ত হয় কখনো বা বিভোর, কবির অনুভূতি ও কল্পনা প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষের সীমানা লুপ্ত ক'রে এক বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ ভুবন সৃষ্টি করে। বাস্তবের প্রতিক্রিয়ায় রোমান্টিক সৃষ্টিতে যে-কোনো আধারের আশ্রয়ে স্বপ্ন, কল্পনা এবং আত্মউৎসরণ বাধাবন্ধহীন হয়ে ওঠে। বাঙালী কবিরা আদর্শ করেছিলেন পাশ্চাত্যকে, সেখানে এ কাব্যের যুগ বেশ আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবেশে তা ঘটেছিল, পরাধীন অবস্থা সত্ত্বেও বা পরাধীন অবস্থার কারণেই আমরা যে তার আওতায় এসে পড়েছি, এই কাব্য তৎপরতা তারই লক্ষণ। মনে হয় এ যেন বিশ্বকাব্যের বিবর্তনে এক সমভূমিতে পৌঁছবার জন্যে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। তবে এ শৈশবের পদক্ষেপ, সুতরাং শিশুসুলভ অপরিণতির চিহ্ন তার সর্বত্র। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে জড়ানো ছিল প্রাচীন অভ্যাস, প্রাচীন-

সংস্কার এবং নির্ণয়বোধহীন অনুকরণবৃত্তি। পাশ্চাত্যে তখন আর মহাকাব্য লেখা হচ্ছিল না, কিন্তু এঁরা গীতিকাব্যের পাশে লিখলেন মহাকাব্য, যেহেতু মাইকেল পথ দেখিয়েছিলেন। সেই পুরোনো অভ্যাসই যেন। একটা মঙ্গলকাব্য লেখা হল তো কবিরা দৃকপাতহীন লিখে চললেন মঙ্গলকাব্য শত শত বছর। আবার মহাকাব্য, গীতিকাব্যের সঙ্গেই তাঁরা লিখতে লাগলেন নীতিকাব্য। এপিক, লিরিক, ডিড্যাকটিকের এক বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর সমাহার। সেই সঙ্গে সনাতন ধর্মানুরাগের উচ্ছ্বাস।

এরকম ঘটেছিল, কেননা নবকাব্যের সূত্রপাতই ছিল অনেকটা প্রক্ষিপ্ত। যদি স্বাভাবিক বিবর্তনে কাব্য তার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে অগ্রসর হত, তাহলে এমন ঘটত না, যেমন সাধারণভাবে ঘটেনি পাশ্চাত্য সাহিত্যে। সমাজের পরিস্থিতি এবং জীবনের পরিবেশ বদলের সঙ্গে কাব্যিক সংবেদনার প্রকৃতিও বদলে যায়। ফ্রান্সে যেমন যুক্তিবাদী ও যৌথ নিয়মবাঁধা সাহিত্য রচনার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তি-মনের বিদ্রোহ এবং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রথাগত ভাবনা আর তারই প্রতিফলিত সাহিত্যিক ক্রিয়াকে অস্বীকার ক'রে নিজের আবেগ-অনুভবকে সর্বপ্রাধান্য দেওয়ার, নিজের স্বপ্ন ও কল্পনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প জন্ম দেয় রোমান্টিক পর্বের (ইংলণ্ডেও তাই হয়)। সেভাবে আমাদের সাহিত্যিক পর্বান্তর ঘটেনি। আমাদের কবিরা পর্বান্তরের পাঠ নিয়েছিলেন বিদেশী কবিদের কাছ থেকে। বই প'ড়ে তাঁরা জেনেছিলেন অনেক কিছুই। শেলি, কীট্‌স্‌, বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখের কাব্য সম্বন্ধে তাঁরা মুগ্ধতা প্রকাশ করেন, তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কিন্তু অভিলাষে ও কাজে সঙ্গতি থাকেনি। এই অসঙ্গতি, কী সঙ্কীর্ণ পরিসরে কী বিস্তৃত পরিসরে, উনিশশতকী বাংলা কাব্যে এক সহজদৃশ্য লক্ষণ। তবু বাস্তব তো বদলাচ্ছিলই। এবং তার প্রভাবে লিরিক-রোমান্টিক কাব্য-পর্বের অপ্রতিদ্বন্দ্ব প্রকাশ নিশ্চিত হয়ে আসছিল। বস্তুত, চেতনা-বাহিত সেই কালোপযোগী প্রবণতা প্রথম থেকেই বাঙালী কবিদের রচনায় ছাপ ফেলে। এমনকি তাঁরা সঙ্কল্প ক'রে মহাকাব্য লিখলেও তাতে ব্যক্তিগত আবেগ-চালিত লিরিক-রোমান্টিক মনোভঙ্গি এড়াতে পারেননি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের রচনায় তার নিদর্শন রয়েছে। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়, সেই সময়েই, সেই মধুসূদন-আলোড়িত কালেই একজন কবি নিঃশর্তভাবে সাড়া দেন গীতিকাব্যের আহ্বানে। বিহারীলাল

চক্রবর্তী মহাকাব্য সঙ্কুলতার মধ্যেই নিবিষ্ট হয়ে যান হৃদয়-ধ্বনিতে। মহাকাব্যের আদর্শ বা নীতিকাব্যের আকর্ষণ বা হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাসের পিছুটান তাঁকে বিচ্যুত করেনি, যে-কারণে তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। যাঁর অতুলন প্রতিভার অবদানে বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক সার্থকতা তখন আসন্ন, বাংলা কাব্য যাঁর কৃতিত্বে অনতিবিলম্বে বিশ্বকাব্যের স্বাধীন সহযোগী হয়ে উঠবে সেই রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেননি। তিনি বলেন: বিহারীলাল "নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।...ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।"

কিন্তু বিহারীলালের গীতিকাব্য-নিষ্ঠা যুগলক্ষণ হিসেবে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, কাব্যিক সাফল্যেব বিচারে ততটা নয়। প্রেম, সৌন্দর্য, নারী ও প্রকৃতিকে ঘিরে আবর্তিত তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির সার্থক রূপায়ণ যে-শৈল্পিক চেতনার দ্বারা সম্ভব, তাঁর তা ছিল না। পাশ্চাত্য কাব্য-ভক্তি না থাকায় যদিও তিনি পবস্পর-বিরোধী প্রকাশের বিভ্রান্তি এড়াতে পেরেছিলেন, তবু তাঁর সৃষ্টিকে কোনো শিল্প-মহিমায় উদ্ভাসিত করতে পারেননি। তাঁর স্বভাবধর্ম তাঁকে নিযে গিয়েছে বিহ্বলতায়, যা তাঁকে অন্যভাবে বিভ্রান্ত করেছে। তাছাড়া, তাঁর শব্দব্যবহারেও কোনো ভারসাম্য ছিল না, যদিও দেশজ শব্দের প্রয়োগ তাঁকে কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। তাঁর রচনায় অপরিণতির লক্ষণগুলো এখন বেশ পীড়া দেয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বাংলা কাব্যের শৈশবই এতে প্রতীয়মান। এই শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথের যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণত্বের এক প্রমাণ তিনি প্রথম দৃষ্টির ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে শতাব্দীর শেষ দিকেই পূর্ণ নিশ্চয়তায় তাঁর পথ বেছে নেন। নিজের সৃষ্টিচিন্তাই তাঁকে এই পরিণতিতে পৌঁছে দেয়, যার মূল কথা হল নিজস্ব সংবেদনা সম্বন্ধে কবির অভ্রান্ত বোধ এবং তদনুযায়ী কাব্যরূপ নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাববাদী ও সৌন্দর্যবাদী চিন্তাকে এবং তার প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যকে সেই সময়েই তাঁর গদ্যরচনায় বিবৃত করেন। বাংলা গদ্যে কবিতার সমস্যা সম্বন্ধে কবির নিজস্ব উপলব্ধির প্রকাশ সেই প্রথম, যা পাশ্চাত্যে দান্তে থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত নিরন্তর চ'লে এসেছে। এতদিনে বাংলা কবিতা বিভ্রান্ত অনুসরণ বা অনুকরণের অথবা অন্ধ পর্যটনের পথ ছেড়ে কবির স্বনিয়ন্ত্রণে এল।

সুন্দর ও অতীন্দ্রিয়ের আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও ভাবনাকে প্রাথমিক-ভাবে পরিচালনা করে। তবে তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা কোনো সঙ্কীর্ণ খাতে বন্দী হবার নয়। সুতরাং তাঁর অগ্রগমন ক্রমেই বহু বৈচিত্র্যে বহু অভিজ্ঞতার বর্ণে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যাত্রার আরম্ভ থেকে যাত্রাশেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যেন বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে হাত ধ'রে এগিয়ে নিয়ে চলেন, সমস্ত অসঙ্গতির কবল থেকে উদ্ধার ক'রে ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি বিভিন্ন স্তরে ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলেন। তাঁর সেই সৃজনশীল উদ্যমের প্রভাব আজ নাগরিক বাঙালীর মুখের কথায়, লেখার শব্দসৌষ্ঠবে। এ ইতিহাস তো আমাদের সকলেরই জানা। পাশ্চাত্য সৃষ্টির সংস্পর্শ অবশ্যই তিনি এড়িয়ে চলেননি। আজকের পৃথিবীতে, তা সম্ভব নয়, এবং কাম্যও নয়। কিন্তু অন্য যে-কোনো সহধর্মী সৃষ্টির রেশ তিনি মিলিয়ে দেন নিজের হৃদয়-স্পন্দনে। এমন আত্মীকরণও বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ভিত্তি ক'রে তাঁর কাব্যের যে-রূপায়ণ, তাতে মানুষ ও প্রকৃতিকে অবলোকনের বহির্মুখিনতা এবং তার উপলব্ধির কেন্দ্ররূপে নিজের হৃদয়বাণী শ্রবণের অন্তর্মুখিনতা একই সঙ্গে বিধৃত। ভাবের এই নতুনত্ব তাঁর হাতে কোনো গতানুগতিক রূপ নেয়নি। তার অভিব্যক্তির জন্যে তিনি পর্বে পর্বে গ'ড়ে নিয়েছিলেন বিবিধ ছন্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যবন্ধ, ধ্বনিমূর্তি ; শিল্পীর আঙুলে ভাষাকে নানাভাবে আকার দিয়েছিলেন নিজের মনোমতো ক'রে। কালোপযোগী সংবেদনাই অবশ্য তাঁর প্রতিভাকে প্রণোদিত করেছিল এই কাজে। এখানেই তাঁর আধুনিকতা। আমরা যারা আধুনিক কালের মানুষ আমাদের কাছে এ ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা তাঁর কবিতার পাশাপাশি পড়তে যাই তাঁর পূর্বগামী কোনো কবির রচনা, সে তিনি মধুসূদনই হোন বা বিহারীলালই হোন। সে-রচনার প্রাচীনতায় এবং অসামঞ্জস্যে আমরা বাধা পাই।

এ প্রসঙ্গে আমি আবার উল্লেখ করতে চাই কবিতার বিবর্তনে গদ্যের ভূমিকা। আমার প্রত্যয় এই যে, উনিশ শতকে আমাদের ইংরেজী-প্রভাবিত পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন থাকত না, আমাদের শিক্ষানবিশি এবং অনুকরণ-অনুসরণের প্রয়োজন দেখা দিত না যদি আমরা নিজেরা আগে থেকে আমাদের গদ্য সৃষ্টি ক'রে নিতাম। গদ্য সৃষ্টি করার মানে সৃজনকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, অন্তরের ও বাইরের অভিজ্ঞতার আলোকে সবকিছু যাচাই করা, বাস্তবের সম্মুখীন হওয়া। আমরা কখনোই তা করিনি। যারা করেছিল তাদের আর পরমুখাপেক্ষী হতে হয়নি আমাদের মতো।

তিন

সাহিত্যে শেষ কথা ব'লে কিছু নেই। কোনো লেখকই পরম সিদ্ধির প্রতিভূ নন। সেরকম যদি হত তাহলে সাহিত্য কোনো এক তুঙ্গ বিন্দুতে থেমে যেত। দান্তের পর ইতালীয়ানে আর কিছু লেখা হত না, শেক্সপীয়ারের পর ইংরেজীতে এবং রবীন্দ্রনাথের পর বাংলায়। কেননা লেখবার কোনো তাগিদই আর থাকত না ভেতর থেকে, সব পরের কথাই আগে বলা হয়ে যেত। সাহিত্য যেহেতু গূঢ়ভাবে জীবনের প্রতিফলন, সেজন্যে তার পারম্পর্যে সমাপ্তি নেই। বাইরের পরিস্থিতি যখন বদ্‌লায়, যখন অভিজ্ঞতার রকমফের ঘটে, তখন নতুন প্রজন্মের লেখকদের মনে নতুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সংবেদনার প্রকাশ অন্য রূপ নেয়। 'শিল্পের জন্যে শিল্প' এই নীতি ঘোষণা ক'রে কেউ যখন পৃথিবী ও মানুষের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন, তখন এক ধরনের প্রতিক্রিয়াই তিনি ব্যক্ত করেন। সাহিত্যের আধুনিকতা এইভাবে অভ্রান্ত বিবর্তনে তার রূপ বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে চলে। আধুনিকতা সব সময়ই আপেক্ষিক। আমাদের কালে যা আধুনিক তা নিশ্চয় পরবর্তী কোনো কালে আর আধুনিক থাকবে না এবং পূর্ববর্তী কোনো কালে যা আধুনিক ছিল তা আমাদের কালে আর আধুনিক নেই। এ থেকে এটা বোঝা যায় যে, কালপর্যায়ই আধুনিকতার ভিত্তি। এই কালপর্যায়ের বিস্তার নির্ভর করে সামাজিক ও জাগতিক পরিস্থিতির উপর, যার কেন্দ্রে মানুষ এবং যার অভিঘাতে সৃজনশীল মন কথা বলে। অবশ্য একই আধুনিকতার আয়তনের মধ্যে পালাবদল হতে পারে যখন চারদিকের ভাঙন প্রখর হয়ে ওঠে, অন্যভাবে বলতে গেলে, সময় যখন তীব্র হয়। কেননা পরিস্থিতি যখন বদ্‌লায় বা বদ্‌লাতে থাকে, তখন কবি তথা লেখকের সংবেদনা যে-অঙ্কুশে প্রকাশ-উন্মুখ হয় তার প্রকৃতি আগের থেকে পৃথক। লেখক তখন অন্য কথা অন্যভাবে বলেন, অথবা আগের কথারই অন্য রূপ দেন। যেমন, সামন্ত যুগে যে-কথা যেভাবে বলা স্বাভাবিক ছিল, ধনতান্ত্রিক বা মিশ্র সামন্ত-ধনতান্ত্রিক যুগে তা আর স্বাভাবিক থাকে না। কিংবা যে-যুগে ও যে-সমাজে ধর্মবিশ্বাস একচ্ছত্র ছিল, সেই যুগে ও সমাজে লেখকের বক্তব্য ও তার অভিব্যক্তি যেরকম হয়েছে, সন্দেহবিদ্ধ ক্ষীয়মাণ ধর্ম বিশ্বাসের আমলে তা থেকে পৃথক হতে বাধ্য।

কী বলা হল শুধু তাই নয়, কীভাবে বলা হল তাও আধুনিকতার ধারণার পক্ষে সমান জরুরী। বক্তব্যে পরিবর্তনের চেতনা প্রকাশ ক'রে কোনো কবি যদি আগেকার ভঙ্গিতেই কথা বলেন, তাহলে তাঁর রচনাকে আধুনিক বলা সম্ভব নয়। সে-রচনাকে শুধু বলতে পারি নতুন পরিস্থিতির বার্তা-জ্ঞাপন। সৃজন-প্রতিভার সঙ্গে তার যোগ সামান্যই। যখন নতুন পরিবেশের চাপে সৃজনশীল সত্তার অন্য কোনো বোধ বা অনুভব বা ভাবনা তার প্রকাশ খোঁজে তখন পুরোনো ছাঁচে তাকে আর কুলোনো যায় না। অন্য ছাঁচ তৈরি করতে হয়। অথবা বলা যায়, অন্য কথার তাগিদে অন্য ছাঁচ আপনিই গ'ড়ে ওঠে। জীবনের যে-পরিবেশে কবির অস্তিত্ব, সমকালের যে-অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন, সেই পরিবেশ এবং সেই অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে তাঁর রচনার প্রকরণে ও পদ্ধতিতে। নবীনচন্দ্র সেনের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে বেশ মূল্যবান: 'কবিরা কালের সাক্ষী'। হ্যাঁ তাই। তবে তাঁরা সাক্ষী শুধু বক্তব্যেই নয়, বক্তব্যের প্রকাশ রূপেও। অতীতের মহৎ সৃষ্টি আধুনিক পাঠকের মনকেও নাড়া দেয় বটে, কিন্তু তার শব্দ ও বাক্‌রীতির দূরত্বও সে অনুভব করে। যেমন, শেক্সপীয়ারের রচনা আমাদের যতই ভালো লাগুক না কেন, তার পূর্বযুগীয় লক্ষণ আমরা ভুলতে পারি না এবং এই বিশ্বাসে উপনীত হতে পারি না যে, তাঁর মতো কোনো প্রতিভাবান লেখক আজ লিখলে ঐ ধরনের ভাষা, ঐ ধরনের শব্দচিত্র ব্যবহার করবেন, অমনই বাক্‌বিস্তারে মেতে যাবেন। শুধু প্রসারিত কালের পটেই নয়, সীমিত আধুনিক কালের পটেও সময়-পর্ব অনুযায়ী এই রকম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, যদিও তা অতখানি দূরত্বব্যঞ্জক নয়। প্রত্যেক যুগে ভিন্ন পরিবেশ ও ভিন্ন অভিজ্ঞতার কারণে ভাষা, বাক্‌রীতি এবং বাস্তব অনুষঙ্গের বদল হয়। সেই সাধারণ পরিবর্তন ছাড়াও কবি আত্মপ্রকাশের তাগিদে তাঁর নিজের উদ্ভাবিত বা সংগঠিত বাক্‌ভঙ্গি (শব্দ ব্যবহারে, বাক্য নির্মাণে, কবিতার গঠনে এবং আরো নানাভাবে) প্রবর্তন করতে পারেন। সুতরাং আমার ধারণা, একই কালপর্যায়ের মধ্যে পরিবর্তিত ভাবনা এবং পরিবর্তিত পদ্ধতি, এ দুয়ের সমন্বিত সাক্ষাৎ যাতে পাওয়া যায় শুধু সেই রচনাই আধুনিক ব'লে স্বীকৃত হবার দাবী করতে পারে। আধুনিকতার বিচারে বহিরঙ্গ রূপ কোনো-মতেই অন্তর্বস্তুর চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সাধারণভাবে তার গুরুত্বই বেশি মনে হয়। এদিক থেকে ভাবলে আমি সমকালীন কাব্যে কোথাও কোথাও বেশ দ্বিধার মধ্যে প'ড়ে যাই।

বাংলা কাব্যে এই আধুনিকতার বিভিন্ন পর্যায়কে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে বিশ শতক। রবীন্দ্র-রচনায় ভাবমণ্ডল ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয়। মানুষের জাগতিক অবস্থান, প্রেম, প্রকৃতি—সব কিছু জড়িয়ে তাঁর সৃষ্টি অব্যাহত ধারায় ব'য়ে চলে এবং তারই সঙ্গে সমস্ত খণ্ডতাকে এক অখণ্ডতায় স্থাপন ক'রে জীবনের পরম রূপের সন্ধান করে। এমনই বিপুল ও বিচিত্র সেই প্রকাশ যে, আমাদের মনে হয়েছে বাংলা ভাষার ভাঁড়ারে যা কিছু দেবার ছিল সবই যেন তিনি উজাড় ক'রে দিয়ে গেলেন, যেন তাঁর বাক্যই কাব্যের শেষ প্রান্ত। এর ফলে এক ধরনের বিহ্বলতা এক সময় অনেক তরুণের মনে দেখা দিয়েছিল। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর এক কবি লিখেই ফেলেন যে রবীন্দ্র ঠাকুর তাঁর পথ রোধ ক'রে রয়েছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি বিদ্রোহের সঙ্কল্পও ঘোষণা করেন। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এবং বিদ্রোহের নোটিস-দেওয়া কবিতা (যা রাবীন্দ্রিক রীতিতেই লেখা) এক অপরিণত মনোভাবেরই পরিচায়ক। তবে সেটা কিছু অপ্রত্যাশিত ছিল না। আমাদের বিহ্বল বোধ তখন বুঝতে বাধা দিয়েছে যে, কোনো মহৎ স্রষ্টা কখনো পথ আটকে থাকেন না, কোনো প্রতি-যোগিতায় তাঁকে অতিক্রম করার প্রশ্নও আসে না। তিনি তো পরবর্তী লেখকদের এক ঐতিহ্য হয়ে যান। যেহেতু মানুষের মন অতএব সাহিত্য স্থাণু নয়, সে কারণে পথভ্রমণ চলতেই থাকে এবং তাঁর অবদান নব পর্যটকদের অগ্রসর হয়ে যেতে সাহায্য করে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমন। কল্লোলী যুগে এবং তার পরেও কারো কারো একবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তারপর আবার আত্মসমর্পণ, এও ছিল এক অপরিণত আচরণ। কিন্তু এসবই এক বিশেষ লক্ষণ, ভিতরকার কোনো অস্থিরতার লক্ষণ। তার কারণ ছিল।

বর্তমান শতাব্দীতে দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আমাদের সরাসরি আঘাত না করলেও তার পরিণাম আমরা এড়াতে পারিনি। যে-অর্থনৈতিক সঙ্কট পৃথিবী জুড়ে দেখা দেয়, আমরাও তার আবর্তে প'ড়ে যাই। উপরন্তু ছিল বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীর শাসন ও শোষণ। এ অবস্থায় সর্বসাধারণের মধ্যে স্বভাবতই ব্যাপক বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। সেই সঙ্গে পূর্বতন বিশ্বাসের বনিয়াদে ভাঙন ধরে। এতদিন যে-সব আদর্শের কথা প্রতিষ্ঠানগতভাবে সাধারণ মানুষকে শোনানো হত, সে যে কত অসার কথা তা প্রবক্তাদের আচরণেই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং অবিশ্বাস,

বিক্ষোভ, ব্যঙ্গ এবং কারো কারো ক্ষেত্রে আত্মনির্বাসনের এক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্র-অনুসরণের ব্যর্থতাবোধের মধ্যে নিশ্চয় অন্য পথ খুঁজে না পাওয়ার ক্ষোভের প্রতিফলন ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিদ্রোহ এবং আত্মসমর্পণও এক ক্ষুব্ধ অনিশ্চিত আলোড়নের প্রকাশ। এটা বোঝা যাচ্ছিল রবীন্দ্রকাব্য একটা অতৃপ্তির সৃষ্টি করেছে। কী সেই অতৃপ্তি?

এ কথা ঠিক যে, মানব-ভাবনা নানাভাবে রবীন্দ্রকাব্যে প্রায় প্রথম থেকেই উপস্থিত ছিল। গত শতাব্দীর শেষ বছরে তিনি তো নিজেই লিখেছিলেন: 'সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ' এবং জীবনের শেষ দিকে বাস্তব মানব পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর উদ্বেগ যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবু এও বলতে হবে যে, তাঁর কাব্যের প্রধান বাণী ছিল সুষমা ও সামঞ্জস্যের। বাস্তবকে বেষ্টন ক'রে তার অনুসন্ধান নয়, বাস্তবকে অতিক্রমণ রবীন্দ্রকাব্যের মূল চারিত্র্য। বক্তব্যের গতি শেষ পর্যন্ত কোনো বাস্তব দ্বন্দ্বের সামনাসামনি আসে না। তা এক অনির্দিষ্টতায়, ধরাছোঁয়ার বাইরে এক নিরবয়ব ভাবমণ্ডলে বিসর্পিত হয়। এই কাব্যচরিত্রের বাহন ছিল এক উপযোগী ভাষা: মার্জিত, পরিশীলিত ঝঙ্কৃত, ছন্দোময়। এ বৈশিষ্ট্য তাঁর গদ্যরচনাতেও বিদ্যমান এবং তার প্রাধান্য ক্রমে আরো বাড়ে। রূঢ় কর্কশ বাস্তবের প্রতিফলন তার ধ্বনি ও শব্দাবলী থেকে নির্বাসিত এবং প্রকাশের প্রত্যক্ষতা পরিহারে তা সচেষ্ট। এই সঙ্গে রবীন্দ্র-মানসের ছিল এক উর্ধ্ব বিহার, বাদ-বিসংবাদ দ্বন্দ্বসংঘাত অতিক্রম ক'রে এক মঙ্গলময় পরম সত্তার স্বীকৃতি। শেষ জীবনে তাতে অস্বস্তির ছায়াপাত ঘটলেও তা ভিত্তিচ্যুত হয়নি। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের আশৈশব শিক্ষা এবং পারিবারিক পরিবেশ অবশ্য তাঁর এই অধ্যাত্মবাদের মূলে। এই কাব্যবাণী এবং কাব্যরূপ যে সমগ্রভাবে সব অবস্থায় সকলকে তৃপ্ত করতে পারবে না তা তো স্বাভাবিক।

অবশ্য রাবীন্দ্রিক ধারা থেকে স'রে অন্য পথ অনুসরণের প্রয়াস 'কল্লোল' যুগের আগেই শুরু হয়ে যায়। তার প্রধান নিদর্শন মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথের এই স্নেহভাজন একনিষ্ঠ ভক্ত অতীন্দ্রিয়তা পরিহার ক'রে ভাষায় ও ভাবনায় বস্তুজগৎ ও বাস্তব পরিস্থিতির নৈকট্যে আসেন, সেজন্যে কেউ কেউ তাঁর কাব্যকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যের মতো সাংবাদিক ধর্মে চিহ্নিত করেছেন। যাই হোক, নানাদিকে তাঁর দৃষ্টিপাত, যদিও তা

জীবনের উপরতলে, তাঁকে এক স্বাতন্ত্র্য দেয়। এবং ছন্দ নিয়ে তাঁর অজস্র নিপুণ পরীক্ষা বাংলা কাব্যের রূপসজ্জায় বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। মোহিতলালের অবস্থান একেবারেই অন্ত ভূমিতে। তিনি দেহকামনার স্তুতি গেয়ে চলেন অসঙ্কোচ বলিষ্ঠতায় এবং বর্ণাঢ্য ভাষায়। তবে তাঁর বক্তব্যকে তিনি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাকে তুলে ধরেন বাঙালী ঐতিহ্যগত এক তান্ত্রিকতার স্তরে। নজরুল ইসলাম প্রেমপ্রণয়ের লিরিক প্রকাশে যথেষ্ট উদ্যোগী হন বটে, কিন্তু তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্য ক্ষেত্রে, শিল্প-নির্মাণ বিষয়ে উদাসীন অবাধ উচ্ছ্বাসে তিনি সোজাসুজি বলেন সংগ্রাম, মুক্তি ও সাম্যের কথা। যতীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা তাঁর দুঃখচর্যায়, তাঁর 'দুর্ভাগবদ্গীতা'য়, যার বাহন হয় স্বপ্নবিনাশী গদ্যময় শব্দবন্ধ। এ সমস্তই রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য-বিরোধী। সে-বিরোধিতা আরো স্পষ্ট হয় সমীপবর্তী তরুণ দলের রচনায়, যাঁরা একত্রিত হন 'কল্লোল' পত্রিকার মঞ্চে। বলা বাহুল্য, পত্রপত্রিকার মারফৎ সাহিত্যিক প্রবণতা বা মনোগতির সামান্য লক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় এবং তার বিস্তারও টের পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের তথা কাব্যের পালাবদলে উনিশ শতক থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনা আর সৃজনী রচনার সমাহারে আমাদের সাহিত্য-প্রবাহ তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে-প্রবাহের বিভিন্ন বাঁক, তার স্রোত পাল্টা-স্রোত যেন এক চিত্রময় রূপে দেখা দেয়। সংবাদ প্রভাকর, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, ভারতী, হিতবাদী, সাধনা, সবুজপত্র, নারায়ণ, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, কবিতা, শনিবারের চিঠি, পরিচয়, পূর্বাশা, কৃত্তিবাস আর আজকের দিনের নানা ছোট পত্রিকা (Little Magazine) এবং তাদের পাশাপাশি সর্বজনীন প্রকৃতির যমুনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বিচিত্রা ইত্যাদি এই দৃশ্য আমাদের সামনে উন্মোচিত করে।

'কল্লোল' পত্রিকা কিন্তু কোনো যৌথ আন্দোলনের মুখপত্র ছিল ব'লে আমি মনে করি না। কারণ যে-সব কবি তাতে লিখতেন, তাঁরা কোনো একটি বিশেষ আদর্শ এবং লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেননি। প্রত্যেকে বিচ্ছিন্নভাবে লিখেছেন এবং প্রত্যেকে স্বতন্ত্র পথে চলেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে এক সামান্য লক্ষণ ছিল কার্যত রবীন্দ্র-মানসিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ: সুচারু সামাজিক প্রচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলে জীবনকে উদ্ঘাটিত করা, মানুষের জৈব অস্তিত্বকে স্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া অথবা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ায় পরিবেশের বৈরিতাকে প্রকাশ

করা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং বুদ্ধদেব বসু মোহিতলালের প্রেরণায় শরীরী আসঙ্গের আবেগকে প্রাধান্য দেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র দীনদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ান এক সরল মানবতাবোধের আবেগে, জীবনানন্দ দাশ সত্যেন্দ্রনাথ মোহিতলাল-নজরুলের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে প্রথমে বাস্তবমুখী কবিতা রচনার পর অচিরে স'রে আসেন তাঁর নিজস্ব নিঃসঙ্গ জগতে। তিনি ছাড়া আর সকলে যে-কাব্যরূপ নির্মাণ করেন, তা কিন্তু মূলত ছিল রবীন্দ্রস্মারক। এই সমগ্র পর্বের বিভিন্ন উদ্যম থেকে স্পষ্ট হল বাংলা কাব্যের প্রকৃতি এবং পরিধির বিস্তার, কাব্যিক সার্থকতা সর্বক্ষেত্রে না দেখা গেলেও।

তরুণদের উপর তখন বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব অবশ্যই ছিল, যা বেশি টের পাওয়া যেত কবিতার চাইতে গদ্য রচনায়। পাশ্চাত্য প্রেরণা আরো ব্যাপক ও গূঢ়সঞ্চারী হয়েছে পরবর্তী পর্বে। প্রথম পর্যায়ের 'পরিচয়' পত্রিকা এবং 'কবিতা' পত্রিকার জন্মক্ষণ থেকে আয়ুষ্কালের মধ্যে তা যেন বাংলা কাব্যের এক ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। স্বধর্ম বলব, না পরধর্ম? এখানে এ প্রশ্নের কিছু আলোচনা করা ভালো।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই পাশ্চাত্য কবিরা সভ্যতার সঙ্কট বেশ অনুভব করছিলেন। মানুষের অমানুষিকতা, স্বার্থান্ধতা ও অনৈতিকতা, সমাজ-নিয়ন্তাদের শঠতা এবং বাক্য ও কর্মের বৈপরীত্য, এ সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে: আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের সন্ধান, সমাজ-বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতা বোধ, নিসর্গ-সান্ত্বনার আকাঙ্ক্ষা, অতীতচারিতা, শৈল্পিক, নির্লিপ্ততা, যৌনতা, কখনো বা বিদ্রোহ। এসব অভিজ্ঞতা আমাদের বিশেষভাবে শুরু হল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এবং পরে। ভারতে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার পরিধি ছিল বিশ্ব-বিস্তৃত। পুব পশ্চিম সেখানে এক হয়ে যায়। সুতরাং পাশ্চাত্য সাহিত্যে পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে যে অন্য দৃষ্টির প্রকাশ ঘটছিল, তা আমাদের প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে। উনিশ শতকের কাব্য-ধারণার পেছনেও, পাশ্চাত্য দীক্ষায়, এক পৃথিবী-বোধ ও জাতিবোধ কাজ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সাধারণভাবে তার ক্রিয়া ছিল আদর্শগত। অর্থাৎ একই বিশেষ পরিস্থিতির অভিঘাত সেখানে ক্রিয়াশীল হয়নি। ফলে তৎকালীন বৈদেশিক প্রেরণা সমকালের কাব্য ও কাব্যিক ভাবনার সঙ্গে আমাদের বাস্তবিক যুক্ত করেনি। এবার কিন্তু সেই সংযোগ স্থাপিত হয়। অর্থাৎ উনিশ শতকের তুলনায় বাংলা কাব্যের পরিধি আরো সচেতনভাবে বাড়িয়ে দেন এ যুগের

কবিরা। পাশ্চাত্য প্রেরণা এবং অনুসরণ বা অনুকরণের প্রশ্ন এ ক্ষেত্রেও আছে, কিন্তু সম্পর্কটা যে এখানে বাস্তবের কারণে এক অদ্ভুত আত্মীয়তার, এও ঠিক। তবু একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, আমাদের পরাশ্রিত মনের ক্রিয়া এখনো চলছে। কেননা সবটাই একতরফা। লেনদেন নয়, নেওয়াটাই যেন আমাদের ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের আগমনের পর অনেককাল আমরা বিদেশের দিকে তেমন ক'রে আর তাকাইনি, তাঁর সৃষ্টির প্রাবল্যে এমনই অভিভূত ছিলাম আমরা। রবীন্দ্র-আচ্ছন্নতার ক্ষয় শুরু হওয়ার পরই বাস্তব পরিস্থিতি আবার আমাদের মুখ ঘুরিয়ে দিল সেই দিকে। 'কল্লোল'-এ এই নবপর্যায়ী প্রেরণার ফসল ফলতে আরম্ভ করে। তারপর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' এবং বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'প্রগতি' ও পরে 'কবিতা' অধ্যবসায়ী আলোচনায় আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে এক নিকট পরিচয় গ'ড়ে তোলে। ফলে তার প্রভাবও বিস্তৃত হয়। বর্তমানকালে যখন জাতিগত স্বাধীনতা, সব ক্ষেত্রেই, সারা পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তখন কোনো একক বিশুদ্ধ ছুঁতমার্গী বৈশিষ্ট্য অবাস্তব। তবে প্রশ্ন হল, সব সময়ই প্রাথমিক প্রেরণা বাইরে থেকে আসবে কেন ? তার কারণ তো এই যে, বাস্তব পরিস্থিতি যতই অকৃত্রিম আত্মীয়তাবোধে আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক না কেন, পাশ্চাত্য লেখক ও শিল্পীদের চোখ খোলে আগে। তারও কারণ তো এই যে, পরিবেশ, মানুষ ও পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁদের যে-উপলব্ধি ও প্রতিক্রিয়া ঘটে, তার পেছনে থাকে এক স্বাধীন সক্রিয় মন, এক স্বাধীন সত্তার অনুভূতি। তারই অভাব রয়েছে আমাদের মধ্যে। আসলে স্থানগতভাবে সাহিত্যিক মনন ও কর্মের উদ্যোগ যদি নিজের আয়ত্তে আনা যায়, তবেই সৃষ্টিতে মৌলিকতা আপনা থেকেই অর্জিত হয়। সেই প্রয়াসেই আমাদের আধুনিক কাব্য তথা সাহিত্যের সার্থকতা নিহিত। তার লক্ষণ আজ একেবারেই যে দুর্নিরীক্ষ্য তা নয়, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের কোনো কোনো অংশে। সেটাই আশার কথা।

এ প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করি। সাধারণত বিদেশী প্রভাবের অভিযোগ তোলা হয় সৃজনী সাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষভাবে কাব্য সম্বন্ধে। অথচ আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনার দিকে তাকালে দেখি তার অনেকটাই পাশ্চাত্য অভিমতের নজিরে লেখা। পদে পদে সাহেবদের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি। সমালোচকের নিজের মতামত তারই বনিয়াদের উপর তৈরি। এবং সে মতামত কতখানি খাঁটি বিচারবুদ্ধির ফল তাতে সন্দেহ হয় যখন দেখি অন্ন

সময়ের ব্যবধানে তার রদবদল হয়। অর্থাৎ গলদ একই জায়গায়ঃ আমাদের ভাবনাটা আমরা প্রথমে ভাবি না। আর সাহিত্যকেই বা বিদেশী প্রভাবের দায়ে অভিযুক্ত করা কেন, যখন জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই গ্রহণের এমন গৌরব? পার্লামেন্ট আজ আমাদের আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা, ক্রিকেট আজ আমাদের জাতীয় ক্রীড়া! কোন্ ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এসব যুক্ত?

সত্যিকার সৃজনশীল সংবেদনার ক্ষেত্রে অন্যের যে প্রভাব পড়ে তাকে অনুকরণ ব'লে ধ'রে নেওয়া এক ধরনের যান্ত্রিকতা। কেননা এ প্রভাবের এমন আত্মীকরণ ঘটে যে, সমগ্র কবি-ব্যক্তিত্ব থেকে তাকে পৃথক করা যায় না। যেমন আমরা দেখি জীবনানন্দ দাশ এবং অমিয় চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে। ইয়েট্‌স্, হপ্‌কিন্‌স্ প্রমুখ বিদেশী কবিদের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁদের সাধর্ম্য তাঁদের অবশ্যই প্রভাবিত করেছে, এমনকি আক্ষরিকভাবেও, তবে তা এক বিশেষ বাঙালীত্বে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু প্রভাবটা যেখানে বাইরে উঁচু হয়ে ওঠে এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে প্রদর্শনের পথে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তাকে আপন মনে করা সম্ভব নয়, কেননা তা কৃত্রিম থেকে যায় এবং কখনো হৃদয়সংবেদ্য হয় না। সেটা এক অপরিণতিরও লক্ষণ। এমন বিচ্যুতিও আধুনিক বাংলা কাব্যে দুর্লভ নয়। বিদেশী প্রভাব প্রসঙ্গে নিজের সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি উক্তির উল্লেখ করা এখানে অবান্তর হবে না। তিনি নিজেকে মালার্মে-শিষ্য ব'লে অভিহিত করেছেন। কেন করেছেন তা বোঝা শক্ত। ফরাসী কবি মালার্মের সঙ্গে তাঁর অপার ব্যবধান। দুজনের যে-কোনো কবিতাই তা ব'লে দেবে। সাধারণভাবে যাকে আমরা বলি বক্তব্য, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় তা প্রধান বিষয়, আর মালার্মের কবিতায় সে-জাতের কোনো বক্তব্যই নেই। ঘটনা, চিন্তা, অভিমত সবই সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় দুরূহ গুরুভার শব্দকে অবলম্বন ক'রে সাধারণ বাস্তব অর্থে প্রকাশ পায়। মালার্মে সাধারণ অর্থবহভাবে শব্দ ব্যবহার করেন না, অনেক সময় অন্বয়ও রাখেন না। শব্দাবলীকে তিনি প্রত্যক্ষ মানুষী আবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এক বিমূর্ত শব্দ-জগৎ গড়তে চেয়েছিলেন এবং এক বিশেষ তাৎপর্যে কাব্যকে সংগীতের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর কথা এইঃ 'আমি সঙ্গীত সৃষ্টি করি। শব্দাবলীর সুষম ধ্বনিগত সহযোগ থেকে যে-সঙ্গীত নিষ্কাষণ করা যায় তাকে আমি সঙ্গীত বলছি না, সে তো এক স্বীকৃত প্রথম শর্ত। সঙ্গীত আমি বলছি বাগ্‌বন্ধের এক বিশেষ বিন্যাস দ্বারা ঐন্দ্রজালিকভাবে উৎপন্ন

অপ্রত্যক্ষকে, যে-বিন্যাস শুধু থাকে পাঠকের সঙ্গে ব্যবহারিক সংযোগের এক উপায় হিসেবে, যেমন পিয়ানোয় পর্দা থাকে।···ছত্রগুলির ভিতরে ভিতরে এবং দৃষ্টির ঊর্ধ্বে এটা ঘটে বিশুদ্ধভাবে এবং নীরবভাবে।' এর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রয়াসের মিল কোথায়?

বাঙালী কবিদের চেতনায় জাগতিক বাস্তবের আরো প্রবল অভিঘাত পড়ে আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে। সার্থক সৃজনশীলতার উৎসার হয়তো সেই সময়ের সঙ্গে তখনই সংশ্লিষ্ট হয়নি, কিন্তু তার আলোড়ন যে সাহিত্য-দৃষ্টির পরিধিকে আরো বিস্তৃতিতে নিয়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই যে, মানববোধ আমাদের উদ্বুদ্ধ করল এক নতুন বিশ্ববোধে যার মধ্যে সঙ্কট আর তা থেকে পরিত্রাণের আশা বা আশাহীনতা প্রধান কথা। বাংলা কাব্যে তার ক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে জীবনানন্দ দাশ এবং বিষ্ণু দের উল্লেখ করা যায়। এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরও। এঁদের কাল—মানে আমাদের কাল—ভাঙনের ভিতরে টলমল। স্থিতি নেই যেখানে আমরা আছি। অন্যায়, অমানবিকতা এবং কপট কথার রাজত্ব আমাদের চারিদিকে। আর আদর্শের অবক্ষয়, রাজনৈতিক শাঠ্য এবং সামাজিক আত্মরতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এ অবস্থা সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক জগতে এবং বিশেষভাবে আমাদের অর্ধ-উপনিবেশে আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তার মধ্যে দিয়ে যে-কবিদের যাত্রা, তাঁদের উপর তার অভিঘাত অবশ্যম্ভাবী, যদি তাঁরা সত্যিই কবি হন। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক, কেননা কবিরা তো কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাব্য রচনা করেন না, নিজের নিজের সংবেদনার চালনায় ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে রূপায়িত করেন। এসব বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া বিদেশে যেমন দেখা দেয়, এখানেও তেমন। জীবনানন্দকে বর্তমান পৃথিবী ক্লান্ত করেছিল, তিনি নিসর্গ এবং প্রাচীনকালের অনুভবের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেন, কিন্তু সেখানেও তাঁর অবস্থান ঘিরে বিধুরতা আর অবসানের আবহাওয়া। বর্তমানের পরিবেশ স্বভাবতই তাঁর মনে বিস্মৃত থাকতে পারেনি। তিনি তাকে ঘৃণা দিয়ে, ব্যঙ্গ দিয়ে আঘাত করেছেন এবং এক আশাহীনতার মধ্যে আবর্তিত হয়েছেন। তবু শেষ পর্যন্ত এক মরীয়া আশার কথা প্রায় অসংলগ্নভাবে উচ্চারণ ক'রে তিনি বিদায় নিয়েছেন। জীবন এবং কাব্যের কাছ থেকে তাঁর বিদায় বড় করুণ। নিঃসঙ্গতা এবং অনপনেয় নৈরাশ্য ও অবিশ্বাস সুধীন্দ্রনাথের কাব্যেও আচ্ছন্ন। তিনি বুদ্ধির সাহায্যে তাকে রূপ দিয়েছেন অতি সচেতন-

ভাবে। তাঁর এই নিরাশার জগতে "শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাবন"ই কবির ব্রত ব'লে তিনি নিরূপণ করেছেন। কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় তার কোনো তাৎপর্য যদি বা থাকে, কাব্য রূপায়ণে তা কতখানি সার্থক হয়েছে সে এক তর্কের বিষয়। একমাত্র বিষ্ণু দে এই অবক্ষয়-চেতনা থেকে উত্তীর্ণ হন এক ইতিবাচক প্রত্যয়ে। প্রচলিত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি ব্যঙ্গ ও তির্যক বচনের পাশাপাশি হৃদয়ানুভূতির এক প্রশিক্ষিত অভিব্যক্তি তাঁর প্রাথমিক কাব্যে ছিল, ক্রমে তার জায়গা নেয় জনজীবনের বোধ এবং সর্বজনীন মুক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস আর তারই সঙ্গে অন্বিত প্রেমের কল্পনা। এঁরা এবং অন্য কবিরা পাশ্চাত্য কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হন তাতে সন্দেহ নেই। ইয়েট্স্, এলিয়ট, ভালেরি, বোদলের প্রভৃতির রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। অন্য প্রভাব আত্মীকরণে এঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তার কারণ মনে হয় এই যে, জীবনানন্দের সত্তা ছিল সর্বাঙ্গীণ কবিত্বে সমাচ্ছন্ন, অনুভূতি এবং হৃদ্‌গত উপলব্ধি ছিল তাঁর সৃষ্টির অঙ্কুশ, জ্ঞান ও যুক্তিবুদ্ধি কাব্যসৃষ্টির ক্রিয়ায় পরিত্যাজ্য ব'লে তিনি নিজেই ঘোষণা করেন।

আমাদের এই শতকে স্বদেশ ও বিদেশ জড়িয়ে অবস্থা ও অভিজ্ঞতার এক সমভূমি গ'ড়ে ওঠে। এটা খুব স্পষ্ট রূপ নেয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে। এবং সর্বত্রই প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্বন্ধে এক বিশেষ সচেতনতা প্রকাশ পায়। পুঁজিবাদের চরম হিংস্র রূপ ফ্যাশিজম যখন আত্মপ্রকাশ করে এবং হিটলারের অভিযানে সমস্ত মানবিক মূল্য সমস্ত সাংস্কৃতিক অর্জন বিপন্ন হয়, তখন সারা বিশ্বে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির কর্মীরা ও অনুরাগীরা সেই বিপদ প্রতিহত করতে সঙ্ঘবদ্ধ হন। আমাদের দেশেও দলমত নির্বিশেষে সব নিষ্ঠাবান শিল্পী সাহিত্যিকেরা আশু বিপদ সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হন। এই বাস্তবের প্রতিক্রিয়া অব্যবহিত সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তার চেয়েও গূঢ়তর রূপান্তর নিয়ে আসে দীর্ঘ মেয়াদে। এ বিষয়েও অবশ্য পাশ্চাত্য প্রেরণা যথেষ্ট কাজ করে। একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয় এ প্রসঙ্গে। আগ্রহজনকও বটে। বাঙালী কবিদের চেতনা একদিকে বিস্তৃত বিশ্বে প্রসারিত হয় এবং সেই সঙ্গে অন্যদিকে যাবতীয় অভিজ্ঞতার কেন্দ্রায়ণও ঘটে। অর্থাৎ যতই মানস পটভূমি প্রসারিত হয়েছে ততই সৃষ্টির অজস্র বিন্দু যুগলক্ষণে সংহত হয়েছে। তার ফলে বৈদেশিক সৃষ্টির দোসর হয়ে ওঠার বাধা আপনা থেকেই ক্রমে স'রে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অবশ্য এই

কারণেই আবার যাকে বলা হয় cliché (বাঁধা ছক), তারও আজ এমন প্রাদুর্ভাব।

সেই সময় থেকেই শ্রেণী-পরিচয়ও এল আমাদের কাব্যে তথা সাহিত্যে: বামপন্থী দক্ষিণপন্থী, প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়াশীল। লেখকদের মধ্যে মার্কস্‌বাদী চিন্তার প্রসারই এই বিভাজনের মূলে। এটা ঘটে ধনবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অভিজ্ঞতায়। এই ব্যবস্থা যেমন একদিকে মহাযুদ্ধ ডেকে এনেছিল, তেমন অন্যদিকে প্রত্যেক দেশে সাধারণ মানুষকে অবর্ণনীয় দুর্দশায় ডুবিয়ে রেখেছিল। মানব-ভাবনা এবং জনগণের মুক্তির ভাবনা কাব্যে সাহিত্যে বরাবরই আছে, এক্ষেত্রে তার একটা সুনির্দিষ্ট ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাংলা কাব্যক্ষেত্রে কিছু ক্ষমতাবান কবি এই ধারাকে বেগবান ক'রে তুললেন। তাঁদের সৃষ্টির সার্থকতা বলা যায় এই যে, তাঁবা কবিতাকে স্লোগানে পর্যবসিত করেননি। কবিতা রাজনীতি নয়, রাজনীতিতে যে-সঙ্কীর্ণ অর্থে বামপন্থী দক্ষিণপন্থী ছাপ দেওয়া হয়, কাব্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ব'লে আমি মনে করি না। রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের জন্যে তো কবিতা লেখা হয় না, কবিতা লেখা হয় জীবনের অভিঘাতে কবি-হৃদয়ে যে-স্পন্দনের সৃষ্টি হয় তাই প্রকাশ করার জন্যে। এ প্রতিক্রিয়া মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসী এবং মার্কস্‌বাদে অবিশ্বাসী দুই মনোভাবাপন্ন কবিদেরই মানবমুক্তি-ভাবনায় নিয়ে যেতে পারে। বস্তুত, স্বল্পদূর এবং সমসাময়িক বাংলা কাব্যে তার একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার, মার্কস্‌বাদের চিহ্ন-দেওয়া এলাকায় যান্ত্রিকতার নমুনাও যথেষ্ট দেখা যায়। যান্ত্রিকতা কবিতার সবচেয়ে নৃশংস ঘাতক। লেখার সঙ্গে লেখকের যে-আন্তর সংযোগ, স্বভাবের মধ্যে ভাবনার যে-জারিত অবস্থান সৃষ্টির প্রথম শর্ত, তার কোনো পরিচয় এসব কবিতায় নেই, ফলে কাব্য হিসেবে তা ব্যর্থ। অবশ্য এমন সব কবিও থাকেন, জীবনের অভিঘাত যাঁদের বিপরীত পথে নিয়ে যায়। কেউ কেউ হয়তো সামাজিক অস্তিত্বের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে "শিল্পের জন্যে শিল্প"-এর গম্বুজে আশ্রয় নেন, কেউ বা ডুব দেন আত্মচারিতায়, আবার কেউ কেউ দুর্বোধ্যতাকে বর্ম ক'রে নেন। ব্যাপক অর্থে এঁদের হয়তো বাম-বিরোধী বলা যায়। সমকালীন বাংলা কাব্যে এরকম দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কিন্তু এসব লক্ষণ আমার নৈরাশ্যজনক মনে হয় না। কেননা তা বাংলা কাব্যের বৈচিত্র্যেই এক সংযোজন এবং ভিতরকার আলোড়নেরও এক আভাস। আরো এক আশার কথা, একদিকে যান্ত্রিক সরলীকরণ অন্যদিকে দুর্বোধ্যতা, এ দুয়ের

মধ্যবর্তী এলাকায় নানান্ স্তরে গম্ভীর জীবন-ভাবনা রূপায়ণের উদ্যম লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য উদ্যম মানে সার্থকতা নয়, সার্থকতার সম্ভাবনা। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেই সম্ভাবনা আত্মজিজ্ঞাসায় এবং গতানুগতিকতা পরিহারের পথ সন্ধানে কোথাও কোথাও প্রকাশ পাচ্ছে। এমনকি, যাঁরা প্রধানত বিচ্ছিন্ন আত্মকথনে ক্ষমতা নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁরাও সত্যিকার জীবনের পরিপ্রেক্ষিত বিস্মৃত হতে চাইছেন না। তাঁদের পক্ষ থেকেও আমরা শুনেছি ভঙ্গি-প্রাধান্য এবং বক্তব্যে অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, একটা অস্বস্তি রয়েছে সকলের মধ্যেই। সেটাই আমার চোখে স্বাস্থ্যপ্রদ, কেননা তা আমাদের আত্মপ্রসন্ন হতে দেয় না, সৃষ্টিকে তাৎপর্যসম্পন্ন করার দিকে এগিয়ে দেয়।

বর্তমানকালে বাংলা কবিতার অন্তর্বস্তুর বৈচিত্র্য সঙ্গে নিয়ে এসেছে রূপের বৈচিত্র্য। তাই ঘ'টে থাকে যখন পরিস্থিতির বিবর্তনের সঙ্গে মানুষ তার নতুন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে, তার নতুন উপলব্ধিকে ভাষা দিতে চায়। পুরোনো অভ্যস্ত কাঠামো তখন ভাঙতেই হয় এবং অন্য কাঠামো তৈরি ক'রে নিতে হয়। গত শতাব্দীতে মাইকেল পয়ার ভেঙে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এনেছিলেন। অমিত্রাক্ষর এবং সনাতন পয়ার ব্যবহার তারপর অনেকদিন চলেছে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বাড়িয়ে দেন বাংলা ছন্দের সীমা। তিনি বহুবিধ ছন্দে তাঁর বহুবর্ণ অনুভূতি ও উপলব্ধি বিন্যস্ত করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও ধ্বনির দিক থেকে ছন্দ নিয়ে নানা অভিনব পরীক্ষা করেন। প্রকাশ-পদ্ধতি হিসেবে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্তের অজস্র রূপ আধুনিক বাংলা কবিতার এক আকর্ষণ। এবং নানা variation-এ এসব ছন্দের প্রয়োগ এখনো চলছে। কিন্তু গঠনের দিক থেকে আধুনিক কবিতার প্রধান প্রবণতা তা নয়, বরং তার বিপরীত ব'লেই আমার মনে হয়। কবিতার চরণে চরণে মিল দেওয়ার রীতির প্রতি এবং সাধারণত যাকে ছন্দ বলা হয় তার প্রতি আজকের কবিদের উপেক্ষা। মিল তো একরকম বিদায়ই নিয়েছে, আর ছন্দের চাইতে বিনা ছন্দের কবিতাই বোধহয় লেখা হয় বেশি, অন্তত কম নয়। এখনকার কবিতা সাধারণত রূপ নিয়ে থাকে মোটামুটি তিন ধরনে: প্রথমত, মিলহীন ছন্দে; দ্বিতীয়ত, গদ্যবাক্য-ভাঙা হ্রস্বদীর্ঘ ছত্রের বিন্যাসে; তৃতীয়ত, টানা গদ্যে। কবিদের এই "অকাব্যিক" আচরণে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ, অভিযোগও অনেক সময় শোনা যায়। কিন্তু এই ক্ষোভ কবিতার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত কিনা তাও বিবেচনা করা দরকার।

জীবন ও জগতের সংস্পর্শে কবি যা অনুভব করেন, যে-উপলব্ধি তাঁর হয়, যে-মানসিক ও ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা তাঁকে নাড়ায়, তিনি তাই ব্যক্ত করতে চান কবিতায়। এটা এক অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার, কবিতাই যার একমাত্র বাহন। এই অনুভব উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতাকে, স্থূলভাবে বললে বক্তব্যকে, যতদূর সম্ভব প্রকাশিত করাই কবিতার কাজ। আদিকালে গান থেকে পৃথক হয়ে কবিতা তার নিজের পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবে গীতি-সম্পর্কটা লুপ্ত হয়নি। এককালে সুর লাগিয়েই কবিতা পড়া হত, যা আজও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত। সুতরাং ছন্দ, যতি, মিলে কবিতার শরীর নির্মাণ খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া, তাদের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। যখন মুদ্রণের আবিষ্কার হয়নি বা ব্যবহার ছিল না তখন প্রধানত কবিতা-কথকের স্মৃতিতেই কবিতাকে জীইয়ে রাখতে হত। তার অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় কবিতাকে স্মৃতি-গ্রথিত করা, যার সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের প্রশ্নও জড়িত ছিল। সেদিক থেকে এ গঠন ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তবে কবিতার নিজস্ব চরিত্রে তাব কোনো ভূমিকা নেই, এমন কথা ভাবাও ঠিক নয়। কেননা কবিতায় ধ্বনির এক বিশেষ গুরুত্ব আছে, আবেশ সঞ্চারের ক্ষমতায় যা নিহিত। ছন্দ মিল সে-বিষয়ে সাহায্য করে। এবং ছন্দের মাধ্যমে যে-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তা কবিতার ভাবকেও শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারে। আবার একটা অন্য অসুবিধেও ঘটাতে পারে : নিয়মিত ছন্দ মিলের একটা যান্ত্রিকতা আছে, যা কবিকে যেমন তাঁর বক্তব্য থেকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পারে, শ্রোতা বা পাঠককে তেমন কবিতার বক্তব্য সম্বন্ধে অমনোযোগী ক'রে দিতে পারে। কবির অনুভব বা উপলব্ধির প্রকাশই যদি কবিতার আসল লক্ষ্য হয়, তাহলে বাইরের কয়েকটা চিহ্ন দেখে কবিতাকে চিনতে হবে কেন? কবিব অনুভূত বা উপলব্ধ বক্তব্যকে গদ্যে প্রকাশ করা যাবে না কেন এবং করলে তা কবিতা হবে না কেন? কবিতার চারিত্র্য তো তার অভ্যন্তরীণ রূপের প্রকাশে। গদ্যপদ্য ভেদ সেখানে অবান্তর মনে হয়। কোনটা গদ্য রচনা হল আর কোনটা হল গদ্যের ছাঁচে কবিতা, তা নির্ভর করে বিষয়ের উপর এবং বিষয় ও লক্ষ্যের উপযোগী প্রকাশ-পদ্ধতির উপর, ব্যাকরণগত বিশেষ শ্রেণীর বাক্যগঠনের উপর নয়। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র কোনো অংশকে কি 'কালান্তর-এর কোনো অংশের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে গদ্য রচনা ব'লে চিহ্নিত করা চলে? বস্তুত, কবির সংবেদনাই তাঁকে নির্দেশ দেবে কোন ধরনের বাক্‌বিন্যাস তার প্রকাশকে

সাহায্য করবে: ছন্দোবদ্ধ, না ছন্দমুক্ত; ঘনবিন্যস্ত, অবিন্যস্ত; সুষম, না বিসঙ্গতিময়। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য। তিনি এবং সম্ভবত একমাত্র তিনিই সেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, গদ্যের আধারেও কাব্যের অভিব্যক্তি সম্ভব। তিনি বলেছিলেন এইভাবে: "কিন্তু যে-প্রণালীতেই পদ্য রচনা হউক, কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলত ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার স্বরূপ, কারণ গদ্য-রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতাস্বাদনের সম্যক সুখ অনুভূত হয়।"

আসলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি নতুন ভাবনার, নতুন অনুভূতির চাপে শিল্প সাহিত্যের প্রচলিত ছাঁচ ভেঙে দেয়, যে-কথা আমি আগেই বলেছি। আজ সেটাই আমরা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দেখছি। কবিতার রূপের এও এক বিস্তৃতি, যা উনিশ শতকে কার্যত সম্ভব ছিল না। বর্তমানের সমাজ-কাঠামোর মধ্যে মানুষ তথা কবিশিল্পীরা এক বিপর্যস্ত অবস্থার শরিক। তাঁদের সৃষ্টিতে তার প্রতিফলন পড়া স্বাভাবিক। প্রচলিত মানব-সমাজ সম্বন্ধে এক অনাত্মীয়তার বোধ আধুনিক কাব্যকে পুরোনো পথ থেকে সরিয়ে নিয়েছে। কোনো একটা দিক অবশ্য তা বেছে নেয়নি, সে-রকম নির্বাচন শিল্পসাহিত্যে সমগ্রভাবে হয়ও না। তাহলে তো ব্যক্তির সংবেদনা ও প্রতিভাকে বাতিল করতে হয়। বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন দিকে কবিতার চলবার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এবং সেই অনুযায়ী গঠনের বদল। জীবনে ও জগতে যখন কিছুর সঙ্গে কিছুই মেলে না তখন কবিতায় আর কতক্ষণ মিল থাকে, অন্তত একটা অংশে? সমষ্টির অস্তিত্বে যখন এক খণ্ড অন্য এক খণ্ডের সঙ্গে প্রকৃতই অন্বিত হয় না তখন কবিতা যে অন্বয়কে উপেক্ষা করবে তাতে আর আশ্চর্য কী? ভিতরে বাইরে সব ক্ষেত্রেই যখন বিরোধিতা আর অসংলগ্নতা, তখন কাব্য-ভাষায় অসংলগ্ন আর পরস্পর-বিরোধী চিত্র ও শব্দের সহাবস্থান কি অস্বাভাবিক? সাহিত্যকে তো জীবনেরই দর্পণ ব'লে মনে করা হয়। বস্তুত অনেক কবি বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের প্রকাশ হিসেবেই এই পথ অবলম্বন করেছেন, কী এদেশে কী বিদেশে। জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় ক্রমে তাঁর কবিতা বেশি ক'রে অসংলগ্ন শব্দ ও ভাবনার আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমানের প্রতি ঘৃণায় আর বিরুদ্ধতায় যেন এক অপ্রকৃতিস্থতার দিকে তাঁর যাওয়া। যদি সত্যিই যেতেন, তাহলে সেটাই হত

অপ্রকৃতিস্থ সমাজকে আঘাত করবার এক উপায়, কবির চরম উপায়। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে সাধারণত যে-দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ওঠে, এটাই তার আসল কারণ। সত্যিকার দুর্বোধ্যতা যা আছে তার মূল কিন্তু অন্যত্র। তাঁর মূল অক্ষমতায়। বহিরঙ্গ কলাকৌশল ব্যবহার ক'রে আধুনিক কবি সাজতে গেলে কবিতা তাৎপর্যহীন অর্থাৎ দুর্বোধ্য না হয়ে পারে না, কারণ সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের কোনো জাদু তাকে জীবন্ত করে না। তবে ঐসব প্রবণতা ও প্রয়াসের সমান্তরালে আর এক স্রোতও একই পরিস্থিতির-কারণে আত্মপ্রক শ করেছে। প্রকাশরীতির নতুনত্বে সামিল হয়েও তা কবির নিঃসঙ্গ ক্ষুব্ধ অসহায়তাকে অতিক্রম করতে সচেষ্ট। এই ধারার কবিদের রচনায় সমাজ-পরিবর্তনের কল্পনা এবং ভবিষ্যতের এক রূপাভাস প্রতিফলিত। কিন্তু কী ডাইনে কী বাঁয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ছাঁচের ভূত ঘাড়ে চাপে। তখন আবার এক গড্ডালিকা-প্রবাহ শুরু হয়, যা এখনো লক্ষ্য করা যায়, যেমন ঘটেছিল উনিশ শতকে এবং তার আগে। তবে পার্থক্য এই যে, আগেকার সৃষ্টি যে-অকাল দোষে দুষ্ট ছিল, সমাজ বা রাষ্ট্র-চেতনার সঙ্গে যে-সম্পর্কহীনতায় ছিল তা থেকে আজকের সৃষ্টি অনেকখানি মুক্ত। এটাই বলা যায় এক অগ্র পদক্ষেপ।

বাংলা কাব্যের দিক থেকে এ এক অগ্রসরতা বটে, কিন্তু বিশ্ব-পটভূমিতে আধুনিক বাংলা কাব্য আজও অন্যের অনুবর্তী। জীবনের অন্য সব বিভাগের মতো শিল্পসাহিত্যের পক্ষেও সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে বা সমস্ত সংগ্রহ সত্ত্বেও নিজস্বতায় পৌঁছনোর একমাত্র পথ মনের স্বাধীনতা। যে-মাটিতে আমাদের জন্ম ও মৃত্যু, যে-মানুষদের মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকা, এক পৃথিবী এবং এক মানব-অস্তিত্বের অংশ সেই মাটি আর মানুষ সম্বন্ধে আমাদের অস্থিমজ্জার অনুভব এবং তা প্রকাশের ভাবনাই শুধু এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। নইলে অন্ধ অনুসরণই সার হয়। আমাদের মধ্যে সেই আত্মপ্রেরণার অভাব আছে ব'লেই নমন ঘটে। নিরন্তর প্রশ্ন, নিরন্তর বিচার, নিরন্তর মুক্ত ভাবনা কাব্যে সাহিত্যে অগ্রগতির প্রাণ। স্বদেশী-বিদেশীর প্রশ্ন সেখানে নেই। অথচ দেখা যায়, এর উল্টোটাই আমাদের রেওয়াজ: সব মেনে নিতে হব, কারো সম্বন্ধে কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা তুললেও যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। স্বদেশী বিগ্রহবাদ বিদেশী বিগ্রহপূজারও পথ প্রস্তুত করে। মনের এই নাবাল জমিতে যে-কোনো ধারণার বীজ সহজে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

আনুষ্ঠানিক হৈচৈ আর ঢোলশহরৎ মারফৎ তার এক সামাজিক চেহারাও দিয়ে দেওয়া যায়। এই অবস্থায় একটু আনন্দ হয় যখন দেখি তরুণ কাব্যকর্মীদের একাংশে ব্যক্তিভিত্তিক এবং আদর্শভিত্তিক প্রচলিত বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বিরুদ্ধতা প্রকাশ পাচ্ছে। তার সঙ্গে সর্বত্র একমত না হতে পারলেও আনন্দের কারণ আছে। কেননা চিন্তা যে আর অনড় থাকছে না এটা তারই লক্ষণ। আমার বিশ্বাস, বাংলার কবিদের এখন এক প্রধাণ কাজ হওয়া উচিত রচিত কাব্য এবং কাব্য-রচনাকার সম্বন্ধে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা ব্যক্ত করা। শুধু একটু সাবধান হবার আছে : কোনো ব্যক্তিগত অভিপ্রায় যেন তাতে জড়িত না হয়। তাহলে সেটা মধ্যবিত্ত স্বার্থবুদ্ধির এলাকায় গিয়ে পড়বে। এবং সেটা সাহিত্য নয়।

অবশেষে আমি আবার গদ্যের কথাতেই ফিরে আসি। কবিদের মূল কাজ অবশ্যই কবিতা লেখা। কিন্তু কাব্য সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনাও খুব জরুরী। এবং সমান জরুরী সে-ভাবনা সবাইকে জানানো। ইতিহাসে কাব্যের ক্রমাগ্রগতি সেইভাবেই সম্ভব হয়েছে সব দেশে। আমাদের দেশ তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। কবিদের এই কাব্য-ভাবনাকে বহন করবে গদ্য, তবে তথাকথিত কাব্যিক গদ্য নয়, বহন করবে প্রাঞ্জল সর্বজনবোধ্য গদ্য। সেই দৃষ্টান্তই আমরা পৃথিবীর সর্বত্র পাই। কবিরা কবিতায় যতই আপাতদুর্বোধ্য হয়ে থাকুন না কেন, যখন তাঁরা তাঁদের কাব্যচিন্তা প্রকাশ করেছেন তখন প্রায় সকলেই লিখেছেন পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ গদ্যে। এবং সাহিত্যের ইতিহাসে কবিদের সেইসব বক্তব্যই কাব্য বিষয়ে মৌলিক ভাবনারূপে সম্মানিত।*

কবিতা, আমি এবং আমরা

আমি মাঝেমাঝে কবিতা লিখি। যে-সময়ে লিখি না, মাঝেমাঝে ভাবি কেন কবিতা লিখি। নিশ্চিন্ত হতে পারি এমন উত্তর কখনো পাই না। আধুনিক কবিতার কোনো লেখক কি পান? জনসমষ্টির সঙ্গে কবিতার যখন আর যোগ নেই তখন এক মোক্ষলাভ ছাড়া বস্তুত আর কোনো লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অর্থ-পুরস্কার অবিশ্যি কেউ কেউ কিছু কিছু পান এবং কাগজে-পত্রে, কেতাবে, বেতারে, এমনকি কোনো কোনো সময় নেতাদের মুখ দিয়েও তাঁদের নাম প্রচারিত হয়, যা স্কুল কলেজ-পড়ুয়া আরও কিছু মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ক্রেতা সংগ্রহের সুযোগ ক'রে দেয়। কিন্তু সে তো অনেকখানি সাংগঠনিক ব্যাপার, তার সঙ্গে নানান বাস্তব অবস্থার যোগ থাকে, যা কারো কারো পক্ষে অনুকূল হয়। কিন্তু তাতে কবিতার কী আসে যায়? এবং কী-ই বা আসে যায় চারপাশের মানুষদের?

রাজা রাজন্য বা ক্ষমতাবানের পৃষ্ঠপোষণ এবং অর্থসাহায্য যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা ছোট বড় সব লেখকই আদিকাল থেকে বুঝে এসেছেন। কিন্তু সে-কালের এবং এ-কালের রাজানুগ্রহ বা শক্তিমানের আনুকূল্য তাৎপর্যে এক নয়, বিশেষভাবে কবিতার ক্ষেত্রে। দুয়ের মধ্যে মূল তফাত এই যে, আগে শ্রোতাসাধারণের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎ সংযোগ কবিতার হত, এখন যা হয় না। এমনকি লিরিক কবিতা যখন কবির ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে আশ্রয় করেছে, তখনো তা বহুর আবেগ-অনুভূতির প্রতিভূ হয়েছে। আত্মগত কখন এমন এক ঘেরা জায়গায় আস্তানা করেনি যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। পৃষ্ঠপোষকতা যেখান থেকেই আসুক, কবিদের বক্তব্য তখন ঘোরানো থাকত সাধারণের দিকে। তারাই ছিল তাঁদের নির্ভর। এমনকি, রাজশক্তির বিরুদ্ধতার ক্ষেত্রেও তা দেখা গিয়েছে, যেমন উনিশ শতকে ভিকৃতর হ্যুগোর উদ্যমে। ঐ রকম 'জাতীয়' কবির ভূমিকা এখনকার কবিতা কি কাউকে দেবে? অবশ্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী-কবলিত ফ্রান্সে কবিতার এই সমাজ-ব্যাপ্ত উজ্জীবন আমরা দেখেছি যখন আরাগঁ, এল্যুয়ার প্রভৃতির কবিতায়

ছত্র লোকের মুখে মুখে ঘুরত। কিন্তু সে-সাফল্য কি আধুনিক কাব্যের, না, আধুনিকতার সব কলাকৌশলকে ছাপিয়ে কবির আবেগকে সকলের আবেগে মিলিয়ে দেওয়ার?

আধুনিক কবিতা শূন্যে দোলে। যে-জমিতে কবিরা আগে পা রাখতেন এখন তা স'রে গিয়েছে। সুতরাং এই বিচ্ছিন্নতার পটভূমিতে অর্থ বা অন্য সাহায্য দানের ও গ্রহণের কোনো সফলতা দাতার ও গ্রহীতার স্বার্থকে অতিক্রম করতে পারে না। আমার বিশ্বাস, কবিতার এককালের সেই সার্থক যুগ্মতা বর্তমানকালে বর্তেছে ফিল্মে। যাঁরা চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেন তাঁরা অর্থ ও অন্য সাহায্যের প্রার্থী হয়েও তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারেন সাধারণ মানুষের উপর। প্রতিভাবান ও বিবেকবান চলচ্চিত্রকার উপরতলার অনুগ্রহ পেয়েও সর্বসাধারণের কাছে তাঁর মানবিক বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারেন এবং দিয়েও থাকেন। এ দিক থেকে অবিশ্যি থিয়েটারেরও নাম করা যায়। তবে ফিল্মের তুলনায় থিয়েটার অনেকখানি স্বনির্ভর হতে পারে। কিন্তু এ সান্ত্বনা কবিতার আজ কোথায়?

তাহলে আমি কবিতা লিখি কেন, যখন আমার কবিতাও আধুনিকতার একটা ছোটখাট পতাকা ওড়াবার চেষ্টা করে? আমার দেখাশোনা এবং আমার বোধ আমি আমার মতো ক'রে প্রকাশ করি, যে-প্রকাশ একান্ত নির্জনতার ভিতরে। ক'টা মানুষ তার সম্বন্ধে উৎসুক হবে? ক'টা মানুষের কাছেই বা তা পৌঁছবে? এই পৌঁছনোর ব্যাপারটা আবার আমার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিঘ্নসঙ্কুল। কেননা আমি কোন দলভুক্ত নই, রাজনৈতিক অথবা সাহিত্যিক। এখানে আমি সাহিত্য-দলের কথাই বলছি। অবিশ্যি, এ রকম কোনো কোনো দলের পিছনে রাজনীতির কলকাঠি থাকে। কিন্তু তা অনেক সময় থাকে অপ্রকাশ্যে। তা আমার এ বক্তব্যের বাইরে। যাঁরা দলগত প্রচারে ও সংগঠনে অভ্যস্ত বা কৃতসঙ্কল্প, তাঁরা স্বভাবতই আমাকে দূরে রাখেন। বড় জোর, তাঁরা তাঁদের জাদুঘরে নমুনা-কবি হিসেবে আমাকে একটু ঠাঁই দিতে পারেন, কিন্তু জ্যান্ত কবি হিসেবে তাঁদের চিড়িয়াখানায় কিছুতেই না, সেখানে শুধু নিজেরা এবং নিজেদের লোক। মোট কথা, আধুনিক কবিতার মূল বিচ্ছিন্নতা আমার মতো লেখকের ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে। এহেন অবস্থায় আমি কবিতা লিখি কেন, বিশেষত যখন তা দিয়ে আমার নিজের কোনো স্বার্থও আমি সাধন করতে পারিনি? ভেবে

ভেবে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চলেছি যে, আমি কবিতা লিখি যেহেতু আমি অন্য কিছু পারি না। সঙ্গীতে আমার কিছু ক্ষমতা যদি থাকত, তাহলে খুব সম্ভব আমি আর কবিতা লিখতাম না। প্রসঙ্গত বলি, আমার সবচেয়ে বেশি টান সঙ্গীতের প্রতি, শ্রোতা হিসেবে আমাকে সঙ্গীত যেমন অধিকার করে, আমার সমস্ত সত্তাকে উচ্ছ্রিত করে, পাঠক হিসেবে আমাকে কবিতা সেভাবে নাড়ায় না। অর্থাৎ সঙ্গীত আমার কাছে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। (সঙ্গীত-অনুভূতির ক্ষেত্রে এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক, এবং পরোক্ষতাই বোধ হয় কবিতার ক্রিয়াপথ এই অর্থে যে, কবিতায় পাঠকের সজ্ঞান সহযোগিতা ছাড়া তার অভিঘাত সম্ভব হয় না)। সঙ্গীত অথবা বিজ্ঞান অথবা ক্রীড়া অথবা যন্ত্রবিদ্যা অথবা আবিষ্কার-পর্যটন এ সবের কোনো একটা যদি আমার সামর্থ্যের মধ্যে একটুও আসত, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি কবিতার কাছ থেকে বিদায় নিতাম। কেননা আমি জানি, তখন আমার কাজের সার্থকতা নিয়ে আমাকে ভাবতে হত না। সর্বসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্নও আমাকে পীড়িত করত না, সে-যোগাযোগ আপনা থেকেই স্থাপিত হয়ে যেত। আর, প্রকৃতপক্ষে, ঐ সব বিষয়েই আপামর মানুষ আগ্রহী। তাদের জীবনকে ঐ সব উদ্যমই বিস্তীর্ণভাবে আলোড়িত করে, আলোকিত করে, পরিবর্তিত করে। এই বিস্তীর্ণতা কবিতায় আপনা থেকে আসে না, অন্য শিল্পের সাহায্যে তা সৃষ্টি করতে হয়। সাহায্য নিতে হয় অভিনয়ের বা আবৃত্তির। এই কারণে আমার মনে হয় আধুনিক কালের মুদ্রিত রূপের চেয়ে অতীতের কথিত রূপ কবিতার পক্ষে শ্রেয় ছিল। বোধ হয় এই রকম কোনো ভাবনা থেকে ইদানীং কবিতা-আবৃত্তির জমকালো সব অনুষ্ঠান চালু হয়েছে। কিন্তু মূল সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যাচ্ছে। কারণ ঐ সব অনুষ্ঠানে কবিতাকে আমরা কতখানি পাচ্ছি এবং আদৌ পাচ্ছি কিনা সে প্রশ্ন মনে জাগে। এগুলো যেভাবে হয় তাতে কবিতার প্রতি আনুগত্যের চেয়ে সেটাই বেশি প্রকট যাকে ইংরিজীতে বলে showmanship। মানে কবিতার উল্টো ব্যাপার। আর আলোড়ন জাগাতে পারে প্রচার-কবিতা। কিন্তু সে-কবিতার আসল নির্ভর শ্রোতাদের বা পাঠকদের এমন কোনো আবেগ যা তাদের আগে থেকেই দখল করেছে, কোনো সাহিত্য-গুণ নয়। মুদ্রিত কবিতার এই নগণ্যতার পটভূমিতেই আমি কবিতা লিখি। কবিতা না লিখে আমি পারি না।

কেন কবিতা লিখি জানি না, কিন্তু কবিতা না লিখে পারি না, এ মরণ খালি আমার নয়, আমার নিকটে ও দূরে অনেকের। সময়, শরীর, মন নিপাত যায়, মুঠোর মধ্যে রেখাগুলোর জট আর খোলে না। এখন অপেক্ষা হাজার বছরের, যদি তখন কেউ কবরের মাটি খুঁড়ে বা শ্মশানের ধুলো উড়িয়ে কোনো কবি-চেহারা আন্দাজ করতে পারে। অথচ মনে হয়, একটু সংযোগের ব্যবস্থা হলে এমন হত না, হাতেহাতেই ফললাভ হয়ে যেত। যাকে বলে নগদ বিদায়। সে-সৌভাগ্য ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠত কোনো বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে ভাব হলে। কেননা বিজ্ঞাপনদাতারাই, দেখি, আজকাল সাহিত্যিক তৈরি করেন। তবে এই সংযোগ বাইরে থেকে 'একটু' দেখালেও আসলে কি তাই? বিজ্ঞাপনদাতা তো ঢাকের কাঠি, বাজায় একজোড়া হাত। সেই হাতের মালিককে খুঁজে পেতে হবে, তার মন ভেজাতে হবে, তবেই না কাঠি চলবে, ঢাক বাজবে। বাজনদারকে ধরতে গেলে দেখা যাবে, তার ইচ্ছেতে কিছু হয় না, আসল লোক হল সর্দার; সর্দারকে বলতে গেলে সামনে এসে পড়বে বায়নাদার, তার ফরমাশেই বাজনা বাজে; বায়নাদার পর্যন্ত ছুটলে শোনা যাবে, না, সে নয়, কর্তা তার মহাজন। এমনি করে ম্যাজিক বাক্সের মতো ক্রমোন্মোচন, শেষ পর্যন্ত এক গূঢ় কেন্দ্র। শুধু কবিতা লেখার মতো একটা নিষ্ফলা কাজের যোগ্যতা (যা আসলে এক অযোগ্যতা) যার, সেখানে পৌঁছোনো তার পক্ষে খুব শক্ত। সে জন্যে অন্য অনেক রকম যোগ্যতা চাই।

যাই হোক, বিজ্ঞাপনদাতা ঘোষণা ক'রে দেন কারা বড় কবি, কারা ছোট এবং কারা কবিই নয়। এবং বঙ্গবাসী সে-রায় শিরোধার্য করে। মানে পাকাপোক্ত সংসারীরা তাদের লেখা না প'ড়ে তাদের নামগুলো জানে, আর ক্ষুদেরা তাদের অবতার মনে ক'রে মন্তর নেয়। তবে সবাই নিশ্চয় না, নিশ্চয়ই না। তাহলে তো সাহিত্যের সংজ্ঞাই বদলাতে হত।

সুতরাং কবি হবার আগে, অন্তত সঙ্গে সঙ্গে কবিদের বৈষয়িক হতে হবে। হিসেব টিসেব করে সাহিত্যের পথে এগোতে হবে। বিষয়ীর বিচক্ষণতা না থাকলে জীবনকালের যে-দশা হবে তাকে বলে দুর্দশা। মুরুব্বী নেই, দল নেই, ধুমধাড়াক্কা নেই। ফলে লেখা বাজে। অবিশ্যি হৈ চৈ, নামজারী, নামডাক—এরা চক্রাকারেই ঘোরে। একটার পর একটা। কোন্‌টার পর কোন্‌টা? যেন দুমুখো সাপ, কোথায় মাথা আর কোথায় ল্যাজ টের পাওয়া যায় না।

এটা এক চূড়ান্ত সংস্থান। চূড়ান্ত বটে, কিন্তু প্রধান এদেশে। সংগঠিত মহত্ত্ব, যার উল্টো পিঠে ছায়া, অন্ধকার। যত উপেক্ষা আছে এখানে, সবই কি তবে যুক্তিহীন? না, সঙ্গত উপেক্ষা অবশ্যই আছে। বোধ হয় আমার ক্ষেত্রেই আছে। কিন্তু তা আপতিক। ঐ চিৎকারের আবহাওয়ায় আমাদের ঐতিহ্যহীন সাহিত্যিক যুক্তিবুদ্ধির হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সঙ্গত মহত্ত্বও এখানে ঐভাবেই আপতিক। তবে এমন ক্ষেত্র কি নেই যেখানে প্রকৃত ভুলভ্রান্তি ঘ'টে যায়? আছে, যেমন সব দেশেই আছে। কিন্তু ঐ একই কারণে ভুলভ্রান্তির সুযোগটা এখানে মস্ত বড় এবং তার ক্রিয়া সর্বক্ষণের।

এ প্রসঙ্গে এখন কিছু দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছে করি। আমারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু দয়া ক'রে আপনারা কেউ মনে করবেন না আমার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমি আমার কথা বলছি। বিশ্বাস করুন, আমি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি অবস্থার বিবরণকে খানিকটা স্পষ্ট করবার জন্যে। আমি যে মহৎ কবি এমন ঘোষণার দায়িত্ব আমি নিজের উপর রাখিনি। সে তো আমি মহাকালের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি হাজার বছরের মাপে। তখন যদি উনি বলেন, আমি তা নই, আমার কিছু আসবে যাবে না, আমি তখন সে-রায় শুনতে আসব না। ইতিমধ্যে আমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবব হাজার বছর পরে একটা বিহিত উনি করবেনই।

যাক, এখন দৃষ্টান্ত। মন্তব্যটা মনে আছে, উপলক্ষ্যটা খুব সম্ভব ছিল কোনো প্রস্তাবিত সঙ্কলন থেকে আমার কবিতা বাদ পড়ার ঘটনা। তরুণ অধ্যাপকটি দুঃখিত হৃদয়ে শ্রদ্ধাভরে বললেন: 'মুশকিল হয়েছে এই যে, আপনি স্বীকৃত কবি নন'। আমি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম, ভুয়ো দিলে যেমন হয়। আর, এ রকম বিষয়ে অংশ নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ বিষয় আমি। সুতরাং আমি নিরুত্তর রইলাম। তবে হন্যে হয়ে মনে মনে খুঁজতে লাগলাম কোথায় সেই দফতর যেখানে যথাসময়ে আমার নাম রেজিস্ট্রি করানো উচিত ছিল, কিন্তু বোকার মতো করাইনি। যাঁরা স্বীকৃত তাঁদের কাছে গিয়ে জেনে নেবার ইচ্ছেও হল, কিন্তু সঙ্কোচের ফলে অগ্রসর হতে পারলাম না। ঐ সূত্রে আমার মনে এসে গেল ফ্রান্সের এক সংগঠনের কথা, কবিরা যেখানে একত্র হয়ে রাজা নির্বাচন করতেন, 'কবিদের রাজা'। এখনো করেন কিনা জানি না, তবে আর শুনি না। এই সংগঠন প্রথমে ল্যকঁৎ দ লীলকে এবং তাঁর পরে ভের্লেনকে নির্বাচিত করেছিল, ভের্লেন-এর কিছু পরে করেছিল পল ফরকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হত, শেষের দিকে একবার বোধহয়

জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন পল ঝেরাল্‌দি, যাঁর কাব্যগ্রন্থ 'তুমি আর আমি' লক্ষ লক্ষ বিক্রি হত নব দম্পতিদের কল্যাণে। ভের্লেন-এর পরবর্তী ঐ সব 'কবিরাজ'দের দশা স্মরণ ক'রে আমার একটু ভয়ও হল। হায়রে সমসাময়িকের রায়! কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে তো অমন কোনো সংগঠন নেই। তবে? স্বীকৃতির সীলমোহর কে মারে এখানে? তখন বিজ্ঞাপনদাতাদের কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তার ঝামেলা যে কী তা আগেই বলেছি।

কাব্যসঙ্কলনের যে বিশেষ একটা গুরুত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণ পাঠক, বিশেষত আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা তা থেকে 'স্বীকৃত' কবিদের জানতে পারে। এত সময় বা অর্থ বা আগ্রহ তাদের কোথায় যে, নানান পত্রিকা আর কবিতার বই প'ড়ে তারা বুঝে নেবে কে ভালো কবি, কে তত ভালো নয়, কে চলনসই এবং কে একেবারেই বাজে। সঙ্কলনের সম্পাদকই তাদের হদিস দেন। অবিশ্যি এ থেকে দায়িত্বের একটা প্রশ্নও এসে যায়। সেটা সাহিত্যের দিক থেকে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। কারণ সঙ্কলনে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে সাহিত্য-তৎপরতার একটা সম্পূর্ণ রূপরেখা ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু এ তো আদর্শের কথা। দায়িত্ব কি এক রকমের হয়? কার্যক্ষেত্রে তার নানান চেহারা। কার প্রতি দায়িত্ব, কিসের দায়িত্ব, এসব শ্রেণীবিভাগও আছে। নিজের প্রতি দায়িত্বও কম যায় না। আমাদের এখানে কোন্ সম্পাদক যে কখন কোন্ শ্রেণীর দায়িত্ব পালন করবেন তা অনুমান করা কঠিন। ফলে সময় সময় দেখি, যাঁদের কবি ব'লে সত্যিই জানি, তাঁদের কেউ কেউ অনুপস্থিত, আবার যাঁদের কবি হিসেবে চিনিই না তাঁরা রয়েছেন, স্বয়ং সম্পাদকই হয়তো তাঁদের অন্যতম। নতুনের আবিষ্কার অবশ্যই এক সুস্থ সাহিত্যিক দায়িত্ব, কিন্তু তাকে সাহিত্যেরই নতুন হতে হবে। প্রায়ই দেখি সে-নতুনত্ব সাহিত্যের নিরিখে ধরা যায় না, ধরা যায় টাকার বা অন্য ক্ষমতার অথবা ভাবভালোবাসার নিরিখে।

সঙ্কলন-সম্পর্কিত আমার দৃষ্টান্তে আবার আসি। আমি দীর্ঘকাল বাংলা দেশের বাইরে ছিলাম। কখনোসখনো কলকাতায় আসতাম অল্প দিনের জন্যে, এলে সাহিত্যিক বন্ধু কয়েকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত। সাহিত্যজগতের কোনো দলাদলি বা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু একবার এসে বড় তাজ্জব হয়ে গেলাম। শুনলাম এক কাব্যসঙ্কলনের প্রস্তুতি চলেছে এবং তার এক সহকারী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, অরুণ মিত্রকে তা

থেকে বাদ দেওয়া হবে। আমার বিস্ময় আমাকে বাদ দেওয়ার জন্যে নয়, বিস্ময় ঘোষণার জন্যে। সম্পাদকের বোধ, রুচি এবং বিষয়-বিচার অনুসারে আমি বা অন্য কেউ বাদ পড়তে পারে, সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঘোষণা কেন? তাহলে নিশ্চয় অন্য কারণ আছে যা সাহিত্যগত নয়। সে কারণ কি রাজনৈতিক, আমি ভাবতে লাগলাম। মানে, আমার কোনো রাজনীতির বিষয়ে কারো আপত্তি? কিন্তু আমি তো প্রবাসী, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন। এবং আমাকে রাজনীতির লোক বললে রাজনীতির কর্মীদের উপহাস করা হয়। তাছাড়া, কবিরা সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বর্জিত হন না, এমন দৃষ্টান্ত জাজ্জ্বল্যমান। আর, প্রধান কথা, কাব্যসঙ্কলন হল কবিতার বই, তা রাজনৈতিক গ্রহণবর্জনের রোকড়-খতিয়ান নয়। অতএব আমার আচরণ, ব্যক্তি-জীবন, ব্যক্তিগত মনান্তর ও সম্প্রীতি ছাড়া কারণটা আর কী-ই বা হবে? সাহিত্যিক বর্জনে কারো সম্বন্ধে ঘোষণার তো দরকার হয় না। এ ঘোষণা কি তবে নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াইয়ের একটা প্রকাশ? এই সব কথা আমার মনে হুড়মুড় ক'রে এসেছিল এবং আমি বেশ বিমূঢ় বোধ করেছিলাম।

সঙ্কলন বিষয়ক অভিজ্ঞতা আমার আরো আছে। বুদ্ধদেব বসু যখন তাঁর সঙ্কলন 'আধুনিক বাংলা কবিতা' বের করেছিলেন তখন আমার কবিতা নেন নি। তাতে আমি বিস্মিত হইনি। কার কবিতা এবং কোন্ কবিতা নেওয়া হবে বা হবে না, তা সম্পাদক ঠিক করবেন তাঁর বিচারবুদ্ধি অনুসারে এবং সে-বিচারবুদ্ধির সঙ্গে আমার বিচারবুদ্ধির মিল নাও হতে পারে। যেমন, ঐ সঙ্কলনে এবং তার পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এমন কিছু লেখকের কবিতা নেই আমি যাঁদের উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে করি, আবার এমন কিছু লেখক আছেন যাঁদের কোনো গুরুত্ব আমার চোখে নেই। কিংবা একাধিক কবিতা যাঁদের আছে, এমন কারো কারো কবিতা আমি হলে একটাই রাখতাম, আর যাঁদের একটা ক'রে আছে এমন কারো কারো একাধিক। কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম যখন বুদ্ধদেববাবু দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আগে কলকাতা থেকে আমাকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখলেন আমার কবিতা নেবার জন্যে সম্মতি চেয়ে। সম্মতি আমি জানিয়েছিলাম, যেহেতু ধারণা ক'রে নিয়েছিলাম যে, বাঙালী ছেলেমেয়েরা আর তাদের বিষয়ী বাপমায়েরা তা থেকে কোনো এক সময়ে জেনে যাবেন এবং হয়তো বা মনেও রাখবেন আমি কবিতা লিখি। আশা যে কত দুঃখজয়ী হয়! আমার একটি কবিতা সম্পাদক নিয়েছিলেন।

এর পর আর এক সঙ্কলন এবং আবার আমার বিস্ময়। এবার বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা'। আমার কবিতা বিষ্ণুবাবু নিলেন একটি দুটি নয়, পাঁচটি। এই গুরুত্ব পেয়ে স্বভাবতই আমি খুশি হলাম। তাহলে আমার কবিতা-লেখা কাজটা নিজের হাত চুলকেই একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে না। মানে, একটা বিশ্বাসের আবহাওয়ায় আমি নিঃশ্বাস ফেললাম। এবং মনে হল বাঙালী বালকবালিকারা এবং তাদের ব্যস্ত জনকজননীরা এখন কোনো শুভ মুহূর্তে আংশিকভাবে হলেও আমার চেহারার একটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন। কিন্তু সব ব্যাপারে মিলিয়ে আমার ধন্দও লাগল খুব। কেমন ক'রে হয়, এমন পার্থক্য? একদিকে বুদ্ধদেব বসু, যিনি একজন বিখ্যাত লেখক এবং সাহিত্য-নেতা, অন্যদিকে বিষ্ণু দে, যিনি আধুনিক কাব্যের একজন বিশ্রুতকীর্তি ব্যক্তি। একজন আমাকে কবি হিসেবে প্রথমে বর্জনীয় এবং পরে সহনীয় মনে করলেন, আর অন্যজন মনে করলেন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ কি নিজস্ব পৃথক বোধ অথবা রুচির প্রকাশ, না, আমাদের সাহিত্য-বুদ্ধিতে অন্য এমন কিছুর প্রভাব থাকার লক্ষণ, যা সাহিত্যের বাইরে? সে-কিছু আর কি হতে পারে ব্যক্তি-সম্পর্কগত ছাড়া? তেমন মনোভাব যদি ক্রিয়াশীল হয়, তাহলে তাতে স্বাভাবিকভাবেই বন্ধুতা বৈরিতা, স্তাবকতা স্বতন্ত্রতা, কুৎসা জয়গান, ধর্ম, চরিত্র ইত্যাদি কোনো না কোনোটির প্রতিক্রিয়ার অংশ থাকে। আমাদের সাহিত্যিক বিচারবিবেচনা কি এ দুয়ের এক জাতের, না, দুই জাতের মিলন-ফল?

ব্যক্তিসম্পর্কিত প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। বাংলা দেশে তার বিশাল ঐতিহ্যও রয়েছে বিশাল সব ব্যক্তিদের নিয়ে। আজও তা অক্ষুণ্ণ দেখতে পাই অনেক ক্ষেত্রে। আমার মতো একজন সামান্য লেখককে পর্যন্ত এক এক সময় তা টের পেতে হয় এবং এই দেখে সান্ত্বনা পেতে হয় যে, অন্য কোনো কোনো লেখকও তার অংশীদার। আমার দৃষ্টান্তই দিই। মৌখিক প্রশংসা আমি বরাবরই অল্পবিস্তর পেয়ে এসেছি পেছনের মৌখিক নিন্দের মতো। তা বাদ দিলে কিছু লিখিত সার্টিফিকেট আমার আছে। মানে চিঠিপত্রের মন্তব্য। লিখেছেন সফল এবং প্রভাবশালী লেখকেরা, পত্রিকা-সম্পাদকও। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় সেগুলো সোনার জল-লাগানো ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখি কিংবা কাগজগুলোর ফোটোস্টাট কপি বুশশার্টে বা পাঞ্জাবিতে সেঁটে ঘুরে বেড়াই। খবরকাগজের ছাপমারা বুশশার্ট এবং নামাবলীর পাঞ্জাবি পরতে তো দেখেছি লোককে। বড় লোভ হয়। এমন

প্রশংসাবাক্য, এমন সমাদর! কিন্তু ঐ সব লেখক প্রকাশ্যে লিখিতভাবে কিছুই বললেন না এ পর্যন্ত অথবা খোলামেলা আমন্ত্রণ জানালেন না। বোধহয় এরই করোলারি হিসেবে আর এক ধরনের ঘটনা ঘটে। পত্রপত্রিকা-সম্পর্কিত আলোচনায় অনেক সময় দেখেছি আমার লেখা থাকলেও তা উল্লেখ করা হয় না, এমনকি যেখানে কোনো গুণকীর্তনের প্রশ্ন নেই, শুধু নামের তালিকা, সেখানেও না। মজার কথা, যাঁদের নাম থাকে তাঁরা কেউ কেউ যেক্ষেত্রে আগেই আমাকে প্রশংসা জানিয়ে দিয়েছেন সেক্ষেত্রেও না। এর ফল আবার আরেক রকমে ফলে। যে-বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্য-প্রতিভার সম্পর্ক নেই সেখানে আমার নাম স্মরণে আসে না অথবা স্মরণ করা প্রয়োজন মনে হয় না। একটা ঘটনা বলি (দৃষ্টান্তপর্ব এবার শেষ হয়ে এল), কিন্তু এ ঘটনা বলতে গেলে আমাকে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে জানাতে হবে যে, ফরাসী ভাষায় আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি থাকায় এবং ফরাসী লেখাপত্তরের মোটামুটি খোঁজখবর আমি রাখি ব'লে কখনো কখনো সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে কোনো একটা কাজ ক'রে ফেলি। সেটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও কি ঠিক, যদি প্রাসঙ্গিক কোনো নির্দিষ্ট উপলক্ষ্য দেখা দেয়? একবার সাঁ্যাৎ-একজ্যুপেরির Le Petit Prince-এর বাংলা অনুবাদ নিয়ে এক পত্রিকায় পত্রালোচনা দেখেছিলাম। কে প্রথম ওটির বাংলায় অনুবাদ করেন, এই ছিল চিঠিপত্রের বিষয়। সে-আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায় যে, সম্প্রতিকালে বিভিন্ন সময়ে একাধিক লেখক ওটি অনুবাদ করেছেন। বলা বাহুল্য, আমার নাম কেউ কোথাও উল্লেখ করেননি। অথচ ও বই আমি অনুবাদ ক'রে ধারাবাহিক প্রকাশ করেছিলাম আলোচনা-নিষ্ক্রান্ত প্রাচীনতম অনুবাদটির বহু বছর আগে। আমার অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল (তবে পুরোটা নয়) 'রংমশাল' পত্রিকায় ১৯৪৭ সালে। এই আলোচনা যখন হয়, তখন 'রংমশাল'-এর সম্পাদক জীবিত। তিনিও এ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। আমি নিজে অবিশ্যি জানাতে পারতাম, কিন্তু এ রকম ব্যাপারে আমার স্বভাবগত বিতৃষ্ণা আমি কাটাতে পারিনি।

ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার এমন ভূমিকা যে সাহিত্যক্ষেত্রে থাকতে পারে তা বাংলাদেশের বাইরে আর কোথাও দেখা যাবে ব'লে মনে হয় না। এ বিষয়ে ভূতলে অতুল বাঙালী জাতি। কবিতার বাছবিচারে যে এমন সুমেরু-কুমেরু পার্থক্য হয়, তারও কারণ কি এই নয় যে, আমাদের মেজাজ একান্ত-

ভাবে কবিতায় নিয়োজিত থাকতে পারে না? আর এ সবই বাঙালী পাঠক-পাঠিকা সাধারণভাবে নির্বিচারে গ্রহণ করে, অন্তত তাদের অন্য মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমি যে-সব দৃষ্টান্ত দিয়েছি সেগুলো লক্ষণমাত্র, ব্যাধির মূল অন্যত্র। যতই চেঁচাই না কেন, আসলে আমরা সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো জীবন্ত উদ্যম আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারিনি। তা যদি পারতাম তাহলে আবহাওয়া অন্যরকম হত। সে-আবহাওয়ায় উপর থেকে কোনো ধারণা অনড়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সেখানে নিরন্তর সন্ধান চলে, খোলা চোখে ক্রমাগত প্রশ্ন ঝলকায়, বিচার-পুনর্বিচারের কষ্টিতে খাঁটি-নকল যাচাই হতে থাকে। বর্তমানের কোনো ফরমূলায় ভবিষ্যৎ সেখানে বাঁধা পড়ে না। আমাদের অবস্থাটা কেন সেরকম নয়, কেন এমন ঘটে, কেন ঘটেছে তা একটু খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে আশেপাশে তাকিয়ে। আমি যেমন বুঝি, তা অক্ষমভাবে বলবার চেষ্টা যদি করি, আপনারা নিজগুণে সহ্য করবেন, এই আমার আশা।

চারদিকের অবস্থা খুঁটিয়ে দেখার কথা বলা সোজা, কিন্তু দেখতে গেলে অনেক সমস্যা। এমনকি, আদৌ দেখা যায় কিনা তাই সন্দেহ। প্রথমেই আত্মচিন্তা আসে। যে বিশেষ অবস্থার মধ্যে থেকে আমি বিচার করব, অন্যদের মতো আমিও সেই অবস্থার খেলনা। আমার কথার চোট আমারই উপর ফিরে আসবে। যেমন, আমি বলতে পারি আমাদের কোনো নিজস্ব সাহিত্যিক বোধ এখনো গ'ড়ে ওঠেনি। ধার-করা চিন্তা এবং অন্য দেশ ও জাতের উদাহরণ আমাদের মনকে অজান্তেই প্রভাবিত ক'রে রাখে, কোনো স্বতন্ত্র বাঙালী মনের ক্রিয়া আমাদের মধ্যে (লেখক ও পাঠক উভয়তই) চারিয়ে যায়নি। ঐতিহাসিক দিক থেকে এর অবশ্য একটা স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের সাহিত্য যখন আধুনিক কালপর্বে প্রবেশ করেছে সেই মুহূর্ত থেকে তার ঐতিহ্য আর স্বদেশী নয়, বিদেশী। উপন্যাসের তো জন্মই তখন। কবিতার নবায়নও নিজের ধারায় নয়। যে তথাকথিত র‍্যানেসাঁসে আমাদের সাংস্কৃতিক স্ফুরণ, তার প্রেরণা আমরা পেলাম বাইরে থেকে বিগত শতকের গোড়ায়। সেটা খুব বেশি দিনের কথা নয়। বাইরের প্রেরণায় র‍্যানেসাঁস ফ্রান্সেও ঘটেছিল, যা থেকে এই শব্দের উৎপত্তি, কিন্তু সে অনেক কাল আগে, পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে। নিছক সময়ের দিক থেকে ধরলে পাঁচ ছ'শ বছর একটা জাতের মনোভূমি তৈরি হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

উচ্চতম থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত। একটা সাধারণ পরিণত বোধ স্বাভাবিক-ভাবে গ'ড়ে উঠতে পারে এই সময়ের মধ্যে। অর্থাৎ কিছু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও মোটামুটি খাঁটি-মেকি বুঝবার মতো একটা এলেম প্রায় সর্বস্তরে জ'ন্মে যায়, যার ফলে গুরুগিরির ক্ষেত্র খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে।

কিন্তু এ ছাড়াও এ দুই সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের মধ্যে দুটো গভীর ও মৌল পার্থক্য আছে। ফ্রান্সে র‍্যনেসাঁস ঘটেছিল ইতালীর সংস্পর্শে। ধর্মে ও সমাজব্যবস্থায় এ দুই দেশ সোদর। প্রাচীন ঐতিহ্যও তাদের এক, যদিও ফ্রান্স তা মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান গোঁড়ামির অন্ধতায় ভুলতে বসেছিল। আর আমাদের পুনরুজ্জীবন ঘটল ইংলণ্ডের সংস্পর্শে, যার সঙ্গে আমাদের কোনো সাজাত্য ছিল না, ধর্মে চর্মে সমাজে ঐতিহ্যে কোনো কিছুতেই না। সবটাই বাইরে থেকে আসা, দূর থেকে অনুপ্রাণিত হওয়া। এই পুনরুজ্জীবনের অর্থাৎ এই আধুনিকতার কোনো নিজের শিকড় এখানে ছিল না। আত্ম-আবিষ্কারের যে-চেষ্টা এই পুনরুজ্জীবনকে আশ্রয় করেছে, তার মন ও মূর্তি বাইরের ছাঁচে গড়া। সাহিত্যে যা ঘটেছে তা কোনো ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় গ্রথিত নয়, তার প্রেরণা ও পদ্ধতি পাশ্চাত্য। যেমন, আধুনিক সাহিত্য-পর্বের শুরুতে আমাদের কবিতা যুক্ত হয়ে যায় মিলটন, স্কট, শেলি, বায়রন ইত্যাদির ধারায়, এমনকি আদি সূরীর স্মরণে ভার্জিল, ওভিদ, হোমার পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করা হয়। আমাদের কবিতার নবপর্ব মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র দূরে থাক, ঈশ্বর গুপ্তর সঙ্গেও তেমন কোনো আত্মীয়তা করেনি। অবশ্য তা করলেই যে আমরা সাহিত্যবুদ্ধিতে ও সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিণতি লাভ করতাম এমন কথা আমি বলছি না, কারণ আমাদের বর্তমান নির্ণীত হত ঐতিহ্যের বহুমুখী স্রোতের কোন্ ধারা আমাদের সঞ্জীবিত করল তার দ্বারা। যাই হোক, দূরদেশী ঐতিহ্য যে আমাদের কত শ্রদ্ধার কত আপনার, তা সাহিত্যিক প্রতিতুলনা খোঁজাতেই টের পাওয়া যায়। সে বড় মজার। অমুক বাংলার স্কট বা বায়রণ বা শেলি, এ রকম সাধারণ ঘোষণা তো আছেই, পণ্ডিতেরা আরো দূরে যান। তাঁরা যতক্ষণ না বের করতে পারেন মুকুন্দরামের সঙ্গে কতখানি চসার বা স্পেন্সার বা ল্যাংল্যাণ্ড বা ক্র্যাব বা ব্লেকের মিল আছে, ততক্ষণ তাঁরা শান্তি পান না। একে বোধ হয় তুলনামূলক সাহিত্য-বিচার বলা হয়, যা এক উচ্চস্তরের ব্যাপার ব'লে শুনি। কিন্তু তুলনা কি শুধু ইংরিজীতেই আছে? ফরাসী, জার্মান, চীনা, জাপানী, ইতালীয়ান, স্প্যানিশ,

এ সবে কি নেই ? মানে ইংরেজ আধিপত্য আমাদের মনে অটল হয়ে আছি দেখি।

ফ্রান্সে র‍্যনেসাঁস এক সাধারণ প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের সংযোগ ঘটিয়েছিল ইতালীর মাধ্যমে।[১] ইতালিয়ানিজম এবং হিউম্যানিজম নামে শিল্পে সাহিত্যে এ তার নিজেরই পুনরাবিষ্কৃত ঐতিহ্য, যা গ্রীক-লাতিন পূর্বকীর্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। তা ছিল বাস্তবিকই এক পুনরুজ্জীবন, অন্য জন্ম নয়। ধর্মের আবরণ সরিয়ে সে আগেকার মানবিক ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছিল।

আর এক মৌল পার্থক্য হল এই যে, ফ্রান্স ইতালীর সংস্পর্শে এসেছিল বিজেতা রূপে, আর আমরা ইংলণ্ডের সংস্পর্শে আসি বিজিত রূপে। ওখানকার আবহাওয়াটা ছিল মানসিক স্বাধীনতার (যেমন ফ্রান্স-বিজেতা জার্মানীর ফ্রাঙ্ক জাত ফরাসী ভাষার প্রথম রূপ গ্যালো-রোমানকে নিজের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল)।[২] আর এখানে যা হয়েছিল, কোনো স্বতস্ফূর্ত স্বনির্ভর ইচ্ছা তার উদ্গাতা ও চালক নয়; স্বাধীনতাহীনতাই তার মানসিক আবহাওয়া। এটা যে নির্বিকল্পভাবে মন্দ তা বলি না। শেষ পর্যন্ত হয়তো এ থেকেই আমরা ভালোতে পৌঁছব যখন সারা পৃথিবী এক পৃথিবী হবে এবং বিশ্ব-ঐতিহ্য আমাদেরও ঐতিহ্য হয়ে যাবে। কবে তা জানি না।

ইতিমধ্যে আমাদের মানসিক অধীনতা চলেছে, যে-অধীনতা নিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের সাহিত্যিক আধুনিকতা। আমরা এখনো আমাদের সাহিত্যিক বৃদ্ধির জন্যে বিদেশের উপর নির্ভর ক'রে আছি, আমাদের সব মাপকাঠি সেখানে। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতো আলোকসামান্য প্রতিভার

১। আমি ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত নিয়েছি দুই কারণে। প্রথমত, রেনেসাস শব্দটির জন্যে। দ্বিতীয়ত, দুটি জাত হিসেবে ফ্রান্স ও ইতালীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের জন্যে। সাধারণভাবে ইতালী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে র‍্যনেসাঁসের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমলক্ষণ ছিল। তা হল এই যে তারা মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক ধর্মের একাধিপত্য অতিক্রম ক'রে একদিকে পূর্বতন চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের সংযোগ স্থাপন করেছিল এবং অন্যদিকে নিজেদের পৃথক পৃথক দেশীয় সাংস্কৃতিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জার্মানীর ব্যাপারটা কিছু স্বতন্ত্র তার তৎকালীন জাতীয় সত্তার অভাবে। হিউম্যানিজম তাকে জ্ঞানের স্তরে উদ্বুদ্ধ করেছিল, কিন্তু দেশীয় কোনো সংস্কৃতির জাগরণ ঘটায়নি। তার সূত্রপাত হয় রেফরমেশনের প্রভাবে।

২। আমার একজন কবিবন্ধু আফ্রিকার উল্লেখ করে অনুরূপ ঘটনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আফ্রিকা জয়ের পর বিজেতা শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকী শিল্প, নৃত্য ও সঙ্গীতকে গ্রহণ ক'রে নিজেদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

আবির্ভাব এখানে হয়েছে এবং অন্যান্য লেখকও জন্মেছেন যাঁদের ক্ষমতা সংশয়াতীত, তবু সাধারণভাবে পরিণত সাহিত্য-বোধ তৈরি হয়নি। তা যদি হত, তাহলে আমরা শিক্ষিত (?) বুদ্ধিজীবীরা সাহিত্যস্রষ্টাদের ঋষি বানাবার জন্যে ব্যাকুল হতাম না অথবা বিখ্যাত লেখকদের জীবন ও সাহিত্য নির্মোহ পর্যালোচনার বিষয় হতে দেখলে রুষ্ট হতাম না।

এই সব কথা আমি বলতে পারি। উপরন্তু এও বলতে পারি যে, মনের এই অধীন অবস্থাটা বিপজ্জনক, কেননা এ অবস্থায় যে কোনো মত বা ধারণা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায়। কোনো স্তরে তাকে বাধা দেবার মন প্রস্তুত হয়নি। বরং তাকে প্রস্তুত না করার জন্যে সক্রিয় রয়েছে ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা, যার লক্ষ্যপূরণ নকলনবিশিতে এবং স্বাধীন চিন্তাব শ্বাসরোধে। অন্তত সাহিত্য ব্যাপারে। ষোড়শ শতকের ফ্রান্সে সাবেকী শিক্ষাব্যবস্থা ওলটপালট ক'রেই শিল্পসাহিত্যের নবজন্ম সুগম করা হয়েছিল। তারা যে গ্রীক-লাতিনের চর্চায় এবং দেশজ ভাষায় প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদে মন দিয়েছিল, তা কিন্তু revivalism ছিল না, বস্তুত তা ছিল মানুষের ধর্মে ফিরে যাওয়া, যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার ক'রে দেখা, স্বাধীন চিন্তার দরজা খুলে দেওয়া। এবং তা করার জন্যে বেশ কিছু লোককে ধর্মের হাঁড়িকাঠে বলিও দেওয়া হয়েছিল।

যাই হোক, আমাদের পরগাছা মনের রাজ্যে কোনো কিছুই অস্বাভাবিকতা নিয়ে দেখা দেয় না। সেখানে ইচ্ছেমতো কোনো কবিকে মহাকবি অথবা কোনো কবিকে অকবি বানাতে বাধা হয় না, শুধু ইচ্ছে আর প্রচারের উপায় থাকলেই হল। কিন্তু এই বন্ধুকৃত্য ও শত্রুকৃত্য ছাড়াও সংভাবেই অনেক গোলমাল সৃষ্টি করা যায়, করা হয়েও থাকে। উপলব্ধি ও বোধের এমন নিরিখ আজও স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়নি যা মূল্যায়নকে ভারসাম্যে রাখতে পারে, খাঁটি-মেকি উপাদানগুলো স্বতই চিনিয়ে দিতে পারে। সততার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে গেলে কালক্রমে সেই ভিত হয়তো গ'ড়ে উঠবে। আর কোনো পথ আছে ব'লে আমি মনে করি না। সেই জন্যে আমার বিশ্বাস, সততার উদ্বোধনই এখন আমাদের প্রধান সাহিত্যিক কর্তব্য। (শুধু সাহিত্য কেন, জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে সততার যে কী প্রয়োজন, তা আমাদের দশার দিকে চোখ মেলে তাকালেই বোঝা যায়। যেহেতু সাহিত্য জীবন-বহির্ভূত কোনো বস্তু নয়, সেহেতু মূল আচরণ এ ক্ষেত্রেও না দেখা দিয়ে পারে না)।

আপাতত আমরা পরাশ্রিত মন নিয়েই চলছি। আমিও এই পরাশ্রিত সম্প্রদায়ের একজন। যতক্ষণ আমি তত্ত্বকথা বলি, ততক্ষণ অসুবিধে নেই। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন সাধারণ থেকে বিশেষে যাই। তখন ইংরিজী দৃষ্টান্ত ও মতামত (এবং ইদানীং আবার বৈদগ্ধ্যের নমুনা হিসেবে ইংরিজী মারফৎ ফরাসী জার্মানও) ক্রিয়া শুরু করে, বিদেশী নিদর্শনের পশ্চাৎপট আমাদের মনের পেছনে খাড়া হয়ে যায়, হয়তো অজান্তেই। ফলে উপলব্ধির কৃত্রিমতা কখনোই ঘোচে না এবং ভালোমন্দের আশ্চর্য পাল্টাপাল্টি চলে। কাজেই খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে দরকার কী ঐ গোলমালের মধ্যে যাবার? তার চেয়ে অনেক ভালো নিজেকে দেখা, নিজের লিখন-কর্ম বিশ্লেষণের চেষ্টা করা। তাতে আর কিছু না হোক, কোনো কোনো পাঠক আমার নিজের বক্তব্য জেনে আমার রচনা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা স্পষ্টতর করতে পারেন, বুঝতে পারেন কোথাও আমার সাফল্য আছে কিনা এবং কোথায় আমার বিচ্যুতি। এবং প্রসঙ্গত আমারও হয়তো একটু আত্মোন্নতি হতে পারে। "আত্মানং বিদ্ধি" তো দার্শনিক মতে এক গরীয়ান কর্তব্য। সেটা সততার এক প্রথম পাঠ হিসেবেও ধরা যেতে পারে। অতএব নিজেকেই দেখা যাক।

প্রথমেই আমার দুটো বিশ্বাসের কথা ব'লে নেওয়া ভালো। আমার এক বিশ্বাস এই যে, কবিতার পক্ষে কোনো নির্দিষ্ট বহিরঙ্গ রূপ অপরিহার্য নয়। আমার অন্য বিশ্বাস এই যে, কবিতার একটা কিছু বিষয় থাকে, যা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রকাশ করাই কবিকর্ম। অর্থাৎ কবিতা শুধু শব্দ-চাতুর্য বা ধ্বনি-বিলাস নয়।

কবিতা আমি নানা আধারেই রেখেছি। আমার প্রথম আমলের কবিতা বেশির ভাগই ছন্দে, মিলও কোনো কোনোটায় ছিল। তারপর লিখেছি গদ্য ভেঙে ছোট বড় ছত্রে বিন্যস্ত ক'রে। তারপর লিখেছি একেবারে টানা গদ্যে অনেক। আমার অনুমান, এই রকম গদ্যে লেখার জন্যে কেউ কেউ আমার কবিত্ব স্বীকারে দ্বিধাগ্রস্ত। অবশ্য বর্তমানে বেশ কিছু কবি গদ্যে লেখেন।

এখন পেছনে তাকিয়ে ভাবলে আমার মনে হয় প্রথাগত ছন্দমিলের কাঠামোর মধ্যে আমি গোড়া থেকেই অস্বস্তি বোধ করেছি। ছন্দমিল যে আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল না তা নয়। বরং ও ব্যাপারটা সহজই লাগত, যেমন অনেক বাঙালী ছেলের লাগে। আমি যা বলতে চাই তা ঐভাবে ঠিক বলতে

পারছি না, এই ছিল অস্বস্তির কারণ। এককালে কবিতা সুরে ফেলেই বলা হত সব দেশে, হিন্দিতে ও উর্দুতে যার ধারা এখনো সজীব। ছন্দমিল বোধ হয় তারই অবশেষ, ছন্দমিলের আশ্রয়ে কিছু সুর আসে, ধ্বনি-সৌষ্ঠব আপনা থেকেই যান্ত্রিকভাবে প্রকাশ পায়। এছাড়া অন্য কারণও আছে। যখন কবিতা (প্রধানতই কাহিনী) মুদ্রিত হত না, শ্রুতিনির্ভর ছিল, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তা এক কাব্যকথকের মুখ থেকে শুনে নিয়ে অন্য কাব্যকথক লোকদের শোনাত, তখন স্মৃতিই ছিল ভরসা, এবং স্মৃতিতে গ্রথিত করার সবচেয়ে বড় উপায় ছন্দমিল। আধুনিক কালে সে-গুরুত্ব তাদের নেই। আমি যে ছন্দমিলকে ক্রমে সরিয়ে দিয়েছি তা কিন্তু অত ভেবেচিন্তে নয়। কবিতা লিখতে গিয়ে আমি বারে বারে তাদের কাছ থেকে বাধা পেয়েছি ব'লেই অন্য পথ ধরেছি। এখন তো আমার ছন্দমিলকে একটা সংস্কার মনে হয়। তবে এটা স্বীকার করব যে, ছন্দের একটা আন্দোলন-সঞ্চারের ক্ষমতা আছে যাকে ভাবপ্রকাশের সঙ্গে অন্বিত করা যায় এবং হয়তো কোনো বিশেষ আবেগ বা বচনভঙ্গিকে ছন্দের অবলম্বনে খুব হৃদয়গ্রাহী করা যায়। কিন্তু মিল যতখানি সাহায্য ধ্বনি-বিন্যাসে করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে কবিতার। যে-শব্দ ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই, সেই শব্দ সে ঘাড় ধ'রে প্রায়ই ব্যবহার করায়। এবং মিলের জন্যে কবিতার বক্তব্য বিপথে চ'লে যেতে পারে। আমি ভাঙা গদ্যে লিখতে গিয়ে কখনো কখনো অন্তর্মিল ব্যবহার করেছি, কিন্তু সে-মিল কোনো ছক অনুসারে আসেনি, যা আপনা থেকে এসেছে, রেখে দিয়েছি। মোট কথা, ছন্দ ও মিল কবিতার পক্ষে আমি অত্যাবশ্যক মনে করি না। আমি যখন কবিতা লিখি তখন চেষ্টা করি আমার কথা যথাসম্ভব বিনা বাধায় বলতে। এমনিতে তো অনেক বাধা আছে: শব্দের দারিদ্র্য, অনুভূতির পলায়নপরতা, বোধের অস্বচ্ছতা ইত্যাদি। তার উপর আবার যান্ত্রিক বাধা কেন?

পৃথিবী আর মানুষ আর তাদের সংস্পর্শে আমার সত্তা, এই তো আমার কবিতার মূল। সব কবিতারই মূল। এদের সংলগ্নতা থেকে যা ভাষায় প্রকাশিত হয় তাই কবিতা। কবি লিখন-কর্তা, তার অনুভূতি এবং অবলোকনই এই সংলগ্নতার রূপ নির্ণয় করে। এটা এমন এক অব্যবহিত সম্পর্ক যার মধ্যে চেষ্টার্জিত জ্ঞান বা পূর্ব-পরিকল্পনা বা সংগৃহীত তথ্যের জায়গা নেই। কবিতার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও তথ্যের হস্তক্ষেপ বাইরে থেকে ঘটে না। পরিকল্পনা যেটুকু থাকে তা কবিত্বের পাশে গৌণ। এখানেই কবিতার সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর

রচনার তফাত। এই প্রত্যক্ষতা আর কোথাও নেই। সুতরাং আমি মনে করি কবিতায় আমার এই ব্যক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে গদ্য-পদ্যের প্রশ্ন বেশ অবান্তর। কবিতা লিখতে গিয়ে আমি চেষ্টা করব নিজের অনুভূত বিষয়কে, নিজের ভিতরের ও বাইরের অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব অব্যাহতভাবে প্রকাশ করতে। কোনো ফর্মের সংস্কারকে, কোনো প্রথাগত ছককে স্বতঃসিদ্ধের মতো স্বীকার ক'রে নিলে তা আমি পারি না। কবিতায় আমার পদ্য থেকে গদ্যে যাওয়ার এই কারণ। অবশ্য কখনো কখনো মানুষের মনের আলো-আঁধারিঅথবা ভিতরের কোনো অনুভূতি ব্যক্ত হবার জন্যে সুরকে আশ্রয় করে আপনা থেকে, সঙ্গীত যার অবিমিশ্র নিদর্শন। কবিতায় ছন্দ ঐ রকম কিছু। তেমন যদি হয় তো হোক। তাছাড়া, অনেক সময় এমনকি নিছক বৈচিত্র্য হিসেবেও তা লেখা যেতে পারে, একটা রাগ গাইতে গাইতে খরজ বদলাবার মতো। কিন্তু কবিতা লিখতে হলেই তা পয়ারে বা মাত্রাবৃত্তে বা স্বরবৃত্তে অথবা চতুর্দশপদী প্রভৃতি আকারে লিখতে হবে, এটা আমার অযৌক্তিক মনে হয়।

কাব্যবিষয়ক অন্য কিছু ধারণা ও ক্রিয়াও আমার বিভ্রান্তিকর লাগে। যেমন, কাব্য-নাটক, যার আজকাল যথেষ্ট প্রচলন। কাকে বলে কাব্য-নাটক? ছন্দে লেখা নাটক, যাতে কুশীলব গদ্যে কথা না ব'লে পদ্যে বলে? সে তো গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর অনুসরণে আরো অনেকে লিখেছেন। এসব রচনাকে কি কাব্য-নাটক বলব? এতে দেখি, যা গদ্যে বলা চলত তা ছন্দে বলা হয়েছে। আজকাল যা লেখা হয় তাকেই কি তাহলে সত্যিকার কাব্য-নাটক বলব, যেহেতু তার ভাষা ও প্রকাশ-পদ্ধতি আধুনিক কবিতার? কিন্তু এখানে সাধারণত দেখি ছন্দে লেখা একটি দীর্ঘ কবিতাকে ভেঙে পাত্র-পাত্রীর উক্তির আকারে নাটকের চেহারা দেওয়া হয়েছে। মনে হয় যেন কবি একটু অদলবদল ক'রে তা নিজের উক্তি হিসেবেই দিতে পারতেন। তাছাড়া, কিছু নাটকীয়তা যদি থাকেও তা ছন্দে কেন প্রকাশ করা হচ্ছে বোঝা যায় না। প্রাচীন ও আধুনিক দুই শ্রেণীর মধ্যে সমলক্ষণ হল ছন্দ। প্রথম ক্ষেত্রে ছন্দ তাকে কাব্য করছে না, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কথোপকথনের ছক তাকে নাটক করছে না। কবিতা ও নাটক দুয়েরই চরিত্র যাতে সমন্বিত হয় তাই তো কাব্য-নাট্য। যেখানে জীবন সম্বন্ধে কোনো গূঢ় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি কুশীলবের পরস্পর-প্রতিক্রিয়াশীল সক্রিয় বাক্যে রূপায়িত করা হচ্ছে তাকেই কি কাব্য-নাটক বলব না? সে-ক্ষেত্রে ছন্দ থাকা বা নাথাকায় কি আসে যায়? রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদাহরণ

নেওয়া যাক: 'বিসর্জন' এবং 'ডাকঘর'। প্রথমটিতে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বহিঃস্তরের এবং অনুভূতি সম্পূর্ণ আপাতগোচর। তার ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রবীন্দ্রকাব্যের সৌরভ থাকলেও তাকে কাব্য-নাট্য বলতে দ্বিধাবোধ করি। পক্ষান্তরে আমার অন্য এক কবি-বন্ধুর মত সমর্থন ক'রে ডাকঘরকেই প্রকৃত কাব্য-নাট্য বলব, যদিও এ নাটক গদ্যে লেখা।

আমার মনে হয়, এটাই বাংলা কবিতার বিবর্তনেব বর্তমান পর্যায়, এই গদ্যকে বাহন করা। সবাই যে লেখেন তা নয় এবং যাঁরা লেখেন তাঁরা সব সময়ই যে লেখেন তাও নয়, তবু এটাই প্রকাশরীতির প্রধান প্রবণতা। এ প্রবণতার আর এক লক্ষণ হল এই যে, পয়ারে যাঁরা লেখেন তাঁরাও প্রায় সর্বক্ষেত্রে রচনার ভিতরে তা থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্যুত হন, অর্থাৎ ছন্দের ছাঁচটা তাঁরা ভেঙে দেন। টানা গদ্যে কেউ কেউ লেখেন। অসমান ছত্র সাজিয়ে অনেক কবি (অধিকাংশ ?) যা লেখেন তাও গদ্যই। অবশ্য এ বিষয়েও প্রথম রবীন্দ্রনাথ। তবে এখনকার কবিদের মেজাজ অন্য, সুতরাং ভাষায় পার্থক্য ঘ'টে যায়। রবীন্দ্রনাথ পুরো গদ্যেই লিখুন বা ছোট বড় ছত্রে তাকে ভেঙে দিন, সে-কবিতার স্বাদ তাঁর ছন্দোবদ্ধ কবিতারই। শব্দনির্বাচনে, শব্দপরম্পরায়, বাক্য-গঠনে এ গদ্য তাঁর অন্য কবিতার সগোত্র। এখনকার কবিতার গদ্য ভাষা হিসেবে আরো প্রত্যক্ষ, যেন বক্তব্য আর তার পদ্ধতিকে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা। আমার মনোগতিও ঠিক রাবীন্দ্রিক নয়। সুতরাং আমার ঐতিহ্য যদিও রবীন্দ্রনাথ, তবু আমার ভাষা রাবীন্দ্রিকতা থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য। এই যে-গদ্য আমি লিখছি তা কি রবীন্দ্রনাথের পল্লবিত পুষ্পিত সম্মোহনী গদ্যকে অনুসরণ করতে পারছে ? অতএব কবিতার গদ্যও পৃথক হওয়া স্বাভাবিক। কবিতার বক্তব্য যাতে বিপথগামী না হয় সেজন্যে ছন্দমিল এড়াবার প্রয়োজন আগে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এর আর একটা দিকও আছে, যা আরো অস্তিবাচক। তা হল এই যে, লেখক বিশেষ কিছু করতে চায়। এই চাওয়াটা আমার ক্ষেত্রে ছিল আমাব কবিতার ভাষাকে সারল্যে প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থাৎ তাকে মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে আসা। এ জন্যে সহজ আটপৌরে শব্দ এবং দেশজ শব্দ ও শব্দগুচ্ছের প্রতি আমার টান বাড়তে থাকে। বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম দিকের কবিতাব তার তেমন ছাপ নেই, যেমন পরের দিকের কবিতায়। কবিতা যে লেখে, বলাই বাহুল্য, তার কাছে এসব কোনো পরিকল্পনার ব্যাপার নয়, ইচ্ছের এবং স্বভাবের ব্যাপার। আর

সমস্তর উপরে আছে জন্মগত ক্ষমতার প্রশ্ন। আমার দীন ক্ষমতা এই ইচ্ছেকে সম্ভবত কাব্যের রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, কিন্তু ইচ্ছেটা স্বভাবগতভাবে আমার মধ্যে ছিল এবং সেইভাবে রয়ে গেছে।

এ থেকে বিষয়ের কথাও এসে পড়ে। কেননা শব্দ-প্রয়াসকে আমি বক্তব্য থেকে আলাদা ক'রে কখনো দেখিনি। শব্দকে মানুষের সঙ্গে না জড়িয়ে আমি ভাবতে পারি না। আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে মানুষের জীবনের সঙ্গে। আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে মানুষের অবস্থার সঙ্গে। আমার মনকে আমি পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি না এবং করতে চাই না। অবশ্য আমি কোনো বাঁধা ছকের কথা বলছি না। বলছি মানসিক আবহাওয়ার কথা, যে-আবহাওয়ায় আমার প্রেম আমার কৌতুক আমার যন্ত্রণা আর আনন্দ রূপ নেয়। এ দিকটা বিবেচনা করলে ধ'রেই নিতে হয় শব্দ সম্বন্ধে আমার উদ্যম যথেষ্ট সীমিত। সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাকে বলে সে সম্বন্ধে আমার উৎসাহ কম। শব্দ দিয়ে এমন জগৎও আমি গড়তে আগ্রহী নই যেখানে তারাই স্বয়ংসর্বস্ব। দৃষ্টান্ত যদি দিই, তাহলে বলব মালার্মের যা অভীষ্ট ছিল তা আমার সম্পূর্ণ অকাম্য। জীবন নয়, শব্দই ছিল তাঁর কাছে পরম রহস্যের আধার, শব্দকে তিনি মানবিক আবেগ-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক কল্পিত বিশুদ্ধতায় নিয়ে গিয়ে তাকে অশেষ ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, যে-কারণে দ্যগাকে বলেছিলেন : কবিতায় আইডিয়ার কোনো কারবার নেই হে, কারবার শুধু শব্দের। (এই পরাধীনকে আপনারা ক্ষমা করবেন, বিদেশী দৃষ্টান্তই দিতে হল)। শব্দকে নিয়ে এই শুদ্ধতা-সন্ধান আমার চিন্তায় নেই। আমি মানবিক আবেগের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী, তার দ্বারাই আমি চালিত। সেই কারণে বিষয় ও বক্তব্য অবিচ্ছেদ্যভাবে আমার ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। তবে শব্দের কাছ থেকে বাড়তি কাজ আদায়ের অভিপ্রায় আমার থাকে। কোন্ স্থানে কোন্ শব্দের ক্রিয়া (বিশেষত গদ্য কবিতার ক্ষেত্রে) দূরপ্রসারী হবে তার একটা সন্ধান মনের মধ্যে চলে, খুব পরিকল্পিতভাবে না হলেও। কোনো অসাধারণ শব্দ নয়, সাধারণ শব্দ, কিন্তু আগের ও পরের শব্দের সংস্পর্শে এসে তা তাৎপর্যে সাধারণ অর্থকে অতিক্রম ক'রে যাক এবং সমগ্র কবিতার উপর এই শব্দগুলোর প্রভাব বিস্তৃত হোক, এই আমার প্রত্যাশা।

পরিপার্শ্বের চেতনা যদি অনিবার্য হয়, এমনকি অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার

প্রকাশেও, তবে লেখার চারিত্র্য তৈরি হয় বাস্তবতার ভিতে। আমার লেখাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তাকে বাস্তববাদী কবিতা বলা যায় কিনা জানি না। কারণ তাতে কিছু আকাঙ্ক্ষার উৎসার থাকে যা স্বপ্ন দেখার মতো, নানান্ ছবিতে কিছু কল্পনার নির্মাণ থাকে। এই জন্যে আমার কবিতায় সম্ভবত এক ধরনের লিরিসিজ্‌ম্ দেখা দেয়, গদ্য কবিতাতেও। এটা হয়তো আমার লেখার একটা দোষ। যাঁরা লিরিকধর্মিতা একেবারে অপছন্দ করেন, তাঁদের এ কবিতা ভালো লাগবার কথা নয়। আবার এটা হয়তো এ কবিতার একটা গুণও হতে পারে, যাঁরা আবেগে সাড়া দেন তাঁদের কাছে। গদ্য কবিতার এই লিরিসিজ্‌ম্ আবার অন্য এক প্রশ্ন সৃষ্টি করতে পারে: গদ্য ভাষা অস্বাভাবিক হওয়ার প্রশ্ন। এ রকম কথা উঠলে দ্বন্দ্বে নামতেই হয়। স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের কি কোনো সর্বগ্রাহ্য নিরিখ আছে? কবিতা বস্তুটাই তো অস্বাভাবিক। আমাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক কাজকর্মে, যথা দোকানবাজারে কেনাবেচা করতে বা কাউকে নির্দেশ দিতে ও ধমকাতে বা খবর দিতে ও নিতে, কবিতা আমরা ব্যবহার করি না, গদ্যের আকারেও না। এই স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে যখন আমরা এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে যাই অথবা সেই রকম অবস্থা সৃষ্টি করি, শুধু তখনই কবিতাকে অবলম্বন করি। সুতরাং কবিতার গদ্যে সাধারণ গদ্য-উক্তির স্বাভাবিকতা দাবি করাটাই অস্বাভাবিক। আর, এই বিষয়ে কি একমত কিছুতেই হওয়া যাবে? যেমন, আমার মতে অস্বাভাবিক গদ্য হল ন্যাকা গদ্য, যার ভুরি ভুরি নিদর্শন বারোয়ারী পুজোর নিমন্ত্রণপত্রে পাওয়া যায় এবং অনেক সময় সংবাদ-সাহিত্যের আধুনিক নমুনায়। আর অস্বাভাবিক গদ্য হল হোঁচট-খেতে-খেতে-চলা গদ্য, অসমান শব্দ দিয়ে কসরৎ ক'রে বানানো এবং যার অর্থ ঐ ভাষার মতোই বিকলাঙ্গ। এর দৃষ্টান্ত আমি দিতে চাই না, তা বড় ব্যক্তিগত হয়ে পড়বে।

কবিতার গদ্য সোজা ছত্রের বদলে অনেক সময়ই অসমান ছত্রে সাজানো হয়। আমিও তা করি। এর পেছনে তাগিদ থাকে কবিতার বিশেষ উচ্চারণের। এক একটা বাক্যবন্ধকে আলাদা ক'রে বিশিষ্ট করতে চাই বা এক একটা শব্দবন্ধের উপর জোর দিতে চাই, কথার এক একটা গুচ্ছকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সমন্বিত ক'রে যতিপাত করতে চাই এবং এইসব বিভিন্নকে নিয়ে একটা সমগ্র গড়তে চাই। তাছাড়া, আর একটা কারণও প্রায়ই

থাকে। বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ এক দুর্বলতার উৎস। আমাদের সাধারণ বাক্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ উহ্যও রাখা হয়। কবিতার গদ্য অসমান ছত্রে লিখলে প্রয়োজনে ক্রিয়াপদ বাদ দিয়ে বাক্যকে সংহত করা সম্ভব হয়। যখন টানা গদ্যে লিখি তখন সমগ্রতাই প্রধান। আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে শব্দাবলীর প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে এক অখণ্ড ভাব বা বক্তব্য ফুটে উঠুক, এই ভাবি। সেখানে ব্যবহৃত শব্দের তাৎপর্যই যতির নিয়ামক, বিন্যাসের আর প্রয়োজন থাকে না।

ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ভিন্ন ভিন্ন লেখক-স্বভাব। সেই স্বভাব অনুযায়ী কবিতার বিশেষ বিশেষ মূর্তি গ'ড়ে ওঠে। যেমন, কবিতা লিখতে গিয়ে আমার ইচ্ছে করে না আমি অযথা শব্দ ছড়াই। এ বিষয়ে আমি স্বভাব-কৃপণ। মনে হয়, এতেই তো বেশ হয়ে যাচ্ছে, আরো কেন? তার মানে বাহুল্যের প্রতি আমি বিরূপতা বোধ করি। বাহুল্য যখন করি, তখন শব্দের উদ্বৃত্তে ম'জে করি না, তার পরিমণ্ডলে আমার মনোভাবকে অনিবার্যভাবে গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই করি। আর, আমার চেঁচাতে ইচ্ছে করে না। বলবার কথা নিয়ে সব শব্দ সব ধ্বনি আবেগকম্প্র হয়ে থাক, যাতে তাদের স্পর্শ করলে তা টের পাওয়া যায়। তারা যতটা বলে তার চেয়ে আভাস দিক বেশি, এই আমি ইচ্ছে করি। বিভিন্ন শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যাংশ, বাক্য নিয়ে কবিতা যদি কোনো অনুভবকে, কোনো অবলোকনকে এক সমগ্রতায় টানটান ক'রে ধরতে পারে, তাহলে তা সার্থক হল মনে হয়। মন্থর বিষাদে যে-আবেগ নিহিত, তাকেও অন্য আবেগের তীব্রতার ধারে নিয়ে যেতে পারলে আমার স্বস্তি হয়। উপমা যদি দিই তাহলে বলব: একটা স্প্রিং চেপে রাখা হয়েছে, তার চেহারায় অসাধারণত্ব কিছু নেই, বেশ শান্ত-শান্ত, ধূসর, কিন্তু নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায়, হাত দিলেও, যে, অনেকখানি বেগ তার মধ্যে জড়ো করা রয়েছে এবং চাপ সরিয়ে নেওয়া মাত্রই তা লাফিয়ে উঠবে। আমার কবিতা বস্তুত তেমন হয় কিনা আমি জানি না। শুধু বলতে পারি ঐ রকম একটা ঝোঁক আমার থাকে।

এর একটা অন্য দিকও আছে যা আমাকে মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন করে। আমি সঙ্গতভাবে অনুমান করি, এই বাহুল্য-বিমুখতা এবং এই চাপের ফলে আমার কবিতায় কিছু কিছু ফাঁক তৈরি হয়, অনেক কথা অনেক ছবি আমার মনের মধ্যে ফুটে থাকলেও তা লেখার বাইরে থেকে যায়, এবং এই কারণে

হয়তো কোথাও কোথাও স্ববিরোধ প্রকাশ পায় যে-স্ববিরোধ আমার চিন্তায় নেই ; কবিতায় এক পর্যায় থেকে আর এক পর্যায়ে যাওয়ার পদক্ষেপগুলো হয়তো কোনো কোনো সময় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় না। পাঠকের দৃষ্টি নিয়ে যদি দেখতে পারতাম ভালো হত। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। আমি থেকে আমাকে কিছুতেই ছাঁটাই করতে পারি না।

জানি না আমার এই পেছনে তাকিয়ে ব্যাখ্যান অন্যের কাছে গ্রাহ্য কিনা। কারণ এ তো আমারই স্বভাবের সঙ্গে, বোধের সঙ্গে জড়িত। আমার বুদ্ধি-বৃত্তির সঙ্গেও। এমনও হতে পারে আমি যাকে ভাবছি বিশ্বস্ততা অন্য কেউ তাকে ভাববেন মূর্খতা, আমি যাকে ভাবছি সরলতা তাকে ভাববেন অসারতা, আমি যাকে ভাবছি আবেগমুখিনতা তাকে ভাববেন অপরিপক্বতা। কিন্তু আমি নিরুপায়। নিজের মন ও অনুভব সম্বল ক'রেই মানুষ কবিতা তথা যে-কোনো শিল্পের পথে এগোয়। এই সম্বল নিয়েই আমি এতদিন পথ হেঁটেছি। আর অল্প দিনের পথ বাকী। যে-অক্ষরগুলো তারপর প'ড়ে থাকবে তাদের ভাগ্য তারা নিজেরাই জেনে নেবে। দায়মুক্ত আমি তখন শান্তিতে ঘুমোচ্ছি।

কবিতার ভাগ্য

কবিতার কথা ভাবলে নৈরাশ্য ঠেকানো যায় না। বইপত্র বিক্রি হয় খুব কম। লিখে যেতে হলে জীবনধারণের অন্য উপায় খুঁজতেই হয়। যে-সব পত্রপত্রিকা কবিতা ছাপে, তাদের বেশির ভাগই পয়সা দেয় না, দিতে পারে না। যারা দেয় তারা এমনভাবে দেয় না যে, তা জীবিকা হতে পারে। এর অর্থ কি এই নয় যে, কবিতার কোনো সামাজিক চাহিদা নেই, যেমন আছে উপন্যাসের এবং অন্যান্য শিল্পকর্মের? অর্থাৎ কবিতা লেখার মানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। আমাদের দেশে অবস্থাটা এই রকম। অন্য দেশে তা এতটা সঙ্গিন মনে হয় না, যদিও সাহিত্য-শিল্পের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কবিতা আপেক্ষিকভাবে দুর্গত। সমাজতান্ত্রিক দেশের অবস্থা অবিশ্যি আলাদা। সেখানে সাহিত্যের ব্যাপার রাষ্ট্রীয় চিন্তার সঙ্গে জড়িত, সাহিত্য-তৎপরতা সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টার এক অঙ্গ। কাজেই তার মর্যাদা আলাদা। বাকি দুনিয়ায় সাহিত্য-তৎপরতা সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিগত এবং সমাজের যেমন ইচ্ছে গ্রহণ অথবা বর্জনের উপর সাহিত্যিকের ভাগ্য নির্ভর করে। কবিতার বেলাতেও তাই, অন্তত তাই হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের এখানে মনে হয় তা নয়। কবিতা যেন সমগ্রভাবেই সমাজের দ্বারা বর্জিত। অবিশ্যি অন্য দেশের মতো এখানেও সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তারা বিবেচনা দেখাতে ছাড়েন না। কবিতা যে তারিফ করবার মতো একটা শিল্পকর্ম এবং তাতে ক্ষমতা ও প্রতিভা যে প্রকাশ পেতে পারে, এটা তাঁরা মাঝে মাঝে সাড়ম্বরে স্বীকার করেন। তাঁরা প্রাইজ-ট্রাইজও দিয়ে থাকেন। তবে এ সব পুরস্কার কজন আর পায় এবং কজনেরই বা তাতে পেট ভরে? এর সঙ্গে কবিতার মূল্যের বা গুণের বাস্তবিকই তো কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। পরিকল্পনার জটিল হিসেব-নিকেশে এর মূল। এর পেছনে সামাজিক মানুষের কবিতা ভালোবাসার ভূমিকা কোথায়? সে-ভালোবাসার নিদর্শন তো দেখি কবিতার কাটতির বহরে এবং 'কবি' পরিচয় শোনামাত্র সামাজিক দৃষ্টির করুণায়।

বাস্তবিক কজন এখানে কবিতা পড়ে সেটাই একটা গবেষণার বিষয়।

যথেষ্ট গবেষণার, কেননা একশ জনের মধ্যে পুরো ত্রিশ জনও পড়তে পারে না। তবে কবিতা পড়ে নিশ্চয়ই কিছু লোক। এই সংখ্যার মধ্যে কবিদের প্রথমেই ধরা যায়। তাঁরাই যদি না পড়েন তবে অন্যেরা কেন পড়তে যাবে? আর অন্যেরা মানে নিশ্চয় শিক্ষিত যুবকদের যে-অংশ দুর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতীপুজো এবং ব্লকফেলারির জরুরী কাজ থেকে স'রে থাকে তার একটা ভগ্নাংশ এবং কিছু শিক্ষিত যুবতী এবং আগেকার যুবকযুবতীরা যারা বয়েস বাড়লেও অভ্যেসটা ছাড়েনি। এইখানে নৈরাশ্য আরো চেপে ধরে। অন্য দেশের দিকে তাকিয়ে যে আপেক্ষিক সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছিল, তা আর পাওয়া যায় না। কেননা স্বকীয়ভাবে ভেবে নেওয়ার, নিজস্ব ভালো লাগা বা না লাগার লক্ষণ এদেশে বিরল। এক এক সময় মনে হয় যেন কিছু পুতুল হাত পা মাথা নাড়ছে। যেন সুতো ধরা রয়েছে কোনো হাতে, তারই টানে এই সমবেত চড়াচড়া। সব উৎসাহ দেখি এক বাঁধা পথে, সব মতামত ফর্মুলায় ফেলা। প্রশ্ন নেই, সন্দেহ নেই, প্রবলতা নেই। অন্য দেশে কি এইরকম হয়? ফ্রান্সে যেমন দেখেছি মত ও পথের বিভিন্নতা নিয়ে তীব্রতা, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে পাশাপাশি সমর্থন ও অস্বীকার, তা কোথায় এখানে? এটা বোঝা যায় সেখানে সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যপ্রেমী তরুণদের মধ্যে নির্বিচারে মেনে নেওয়ার অভ্যেস নেই, নইলে সাহিত্যিক সংঘাত এত তীক্ষ্ণ ও বিস্তৃত হত না। অর্থাৎ সেখানে সমাজের একটা অংশের সঙ্গে কবিতা জীবন্তভাবে সংশ্লিষ্ট। আমাদের দেশে তা নয়। মুদ্রিত নাম ও মুদ্রিত মত সম্বন্ধে আমাদের তরুণ-তরুণীদের অগাধ শ্রদ্ধা। ছাপার অক্ষরে বার বার দেখা দিলেই যেন সব ভেজাল খাঁটি হয়ে যায়। অতএব ছাপার অক্ষর যাঁদের হাতে অনেক, তাঁরাই শিক্ষিতদের ভাবান, চালান, যেমন ইচ্ছে করেন।

এ গড্ডলিকাপ্রবাহ সাহিত্যিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। তবে স্বাস্থ্যের বীজ যে একেবারে ম'রে গেছে তা বিশ্বাস হয় না। কবিদের মধ্যে, পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ তো আছেন যাঁদের মন অন্য পথে অগ্রসর, যাঁরা পাছদোহারে গাইতে পারেন না। কোনো কোনো ছোট পত্রিকায়, কোনো কোনো ব্যক্তিগত অভিমতে তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রবল প্রচারের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। ফলে তাঁদের আওয়াজ সাধারণ্যে গিয়ে পৌঁছয় না। ছাপার অক্ষরের প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে তাঁরা বাধ্য। এই অবস্থাই আপাতত চলতে থাকবে মনে হয়। এইখানেই হতাশা। কিন্তু

সম্পূর্ণ হতাশ না হয়ে পড়া চলে কিনা তাও ভেবে দেখা যায়। ছোট ছোট পত্রিকা জন্মাবে; অন্য চিন্তা, অন্য সৃষ্টি, অন্য মূল্যায়নের চিহ্ন রেখে তারা ম'রে যাবে; আবার জন্মাবে, আবার চিহ্ন রেখে যাবে। মহাকাল কবে সেইসব চিহ্ন সংগ্রহ করবে কে জানে? ইতিমধ্যে আর কিছু কি করা যায় না? মুদ্রণ-প্রচারের অক্ষমতাটা মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অন্য কী উপায়ে তরুণ পাঠক-পাঠিকার সামনে যাওয়া যায়, তাদের ভাবানো যায়, তাদের সঙ্গে যোগস্থাপন করা যায়, সেটা বিবেচনা ক'রে দেখা মন্দ নয়। যেখানে অক্ষরের নিঃশ্বাস বন্ধ, সেখানে গলার স্বরে কথা বলা এক উপায়ান্তর। কবিতা সরাসরি পড়া যেতে পারে, গৌণত কবিতা বিষয়ে আলোচনাও হতে পারে। কিন্তু পুরোদস্তুর কবিসম্মেলন নয়। পরিকল্পিত বৃহদ্‌ব্যাপারে কণ্ঠস্বর-সংগঠন স্বভাবতই মুদ্রণ-সংগঠনের সমান্তরালে চলবে। তাছাড়া, ওরকম কবি-সম্মেলনের সত্যিকার কোনো সার্থকতা আছে কি? ও এক প্রমোদ-অনুষ্ঠান, আবার সেই গড্ডালিকাপ্রবাহ। তা নয়। যা করা ভালো তা হল নানান জায়গায় স্থানীয় ভিত্তিতে কবিতা পাঠের ছোট ছোট আসর এবং অল্পস্বল্প আলোচনা। এতে সাধারণ কবিতা-আগ্রহীকে অক্ষর ডিঙিয়ে কবিতা ও কবিতা-ভাবনার এবং কবি-ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে খানিকটা হয়তো আনা যায়, যার ফলে তাঁরা হয়তো কবিতা নিয়ে নিজেরা কিছু ভাবতে পারবেন, যাচাই করতে অভ্যস্ত হবেন। সবই 'হয়তো'। কার্যত কী দাঁড়াবে শেষপর্যন্ত কে জানে? যে-যন্ত্রযুগে প্রচারের চাকা ঘুরিয়ে রাতারাতি কবিখ্যাতি তৈরি করা যায়, সে-যুগে এই খণ্ড খণ্ড তৎপরতার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তবে শুনেছি অন্য এক ক্ষেত্রে, আধুনিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে, ছোট ছোট দলের তৎপরতা নাকি বিশেষ উপযোগী ব'লে প্রমাণিত। যুদ্ধ যত যান্ত্রিক হচ্ছে, মারণাস্ত্র যত ক্ষমতায় বাড়ছে, ততই নাকি সৈন্যবাহিনীর বিভক্ত ক্ষুদ্র অংশ এবং ব্যক্তিগত উদ্যম যুদ্ধজয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। কবিতার বর্তমান অবস্থা যদি নবপর্যায়ের কবির লড়াই হয়, তাহলে এ পদ্ধতিতে কাজ হতে পারে।

কিন্তু যে-পথই বাতলানো হোক না কেন, তা সাময়িক। তাতে শুধু ব্যাধির উপশম। আরোগ্য নয়। আমার ধারণা পরিস্থিতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ততদিন আসবে না, যতদিন শিক্ষিত যুবসমাজে স্বাধীন চিন্তার বনিয়াদ না তৈরি হবে, পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যেস না যাবে। সাধারণভাবে সেরকম মনের সাক্ষাৎ পাওয়া শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন তরুণ-তরুণীরা প্রচলিত

শিক্ষার জাঁতাকল থেকে মুক্তি পাবে। যে-পদ্ধতিতে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে নিজস্ব চিন্তার ক্ষমতা বাড়তে পারে না, বরং ম'রে যায়। শেক্‌স্‌পীয়ার পড়তে গেলেই তাদের জানতে হয় অমুক সাহেব কী বলেছেন, তমুক সাহেব কী বলেছেন। কবিতা পড়তে গেলেও তাই, সমালোচকদের রায় পড়ো। জানা অবশ্যই ভালো, কিন্তু যে পড়ছে তার ভাবনাটা নস্যাৎ হয়ে যাবে কেন? অথচ তাই যায়। মাস্টারমশাইরাও সেইভাবেই পড়ান, যেহেতু সেইটাই নিয়ম। পড়ুয়ার মনোভাব কে শুনতে চায়? তার মত ব'লে কখনো প্রশ্নপত্রে যদি কিছু শুনতে চাওয়া হয়, সেটা শুধু তার ধার-করা মতের এক শিষ্ট নাম, আর কিছু নয়। পরমতনির্ভরতা তার মগজে গেঁথে দেওয়া হয়। শিক্ষকের মুখে শোনা এবং ছাপার অক্ষরে পড়া অন্যের ধারণাকে নিজের ধারণা ক'রে নেওয়া তার অভ্যেস-হয়ে যায় অথবা অনেক মতের মারপ্যাঁচে একটি বিভ্রান্ত মন তার তৈরি হয়। শিক্ষায়তনের বাইরেও সেই অভ্যেসই বা সেই মনই সে নিয়ে আসে। সুতরাং সেখানে একটা বিশেষ ধারণা তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া খুবই সহজ, যদি হাতে সেরকম উপায় থাকে। এ অবস্থায় কী ক'রে কবিতার সঙ্গে তার নিজের কোন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গতা হবে, কী ক'রে তার বোধ পৃথকভাবে সাড়া দেবে? এবং এর ফলে যে-কবিতা সম্প্রতি লেখা হয়েছে, লেখা হচ্ছে, তা তার জীবন্ত সমাজ-সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশে যে-তারুণ্য এত বিবিধ বিষয়ে উৎসাহী, সে কবে মুক্ত মন নিয়ে এই সম্পর্ক আবার গ'ড়ে তুলবে সেটাও প্রশ্ন। এখনকার অনেক কবি সেইদিন দেখে যেতে পারবেন, এমন আশা করা কি অসমসাহস?

কবিতা পাঠ কবিতা আবৃত্তি

কবিতা-পাঠ এবং কবিতা-আবৃত্তি নিয়ে ইদানীং নানা প্রশ্ন যে উঠছে এটা এক শুভ লক্ষণ, কেননা এ বিষয়ে কিছু ভাবনা-চিন্তার দরকার আছে। অনেককাল যাবৎ, সেই আচার্য শিশির ভাদুড়ীর সময় থেকে, কবিতার উপর শিল্পীদের বিশেষ নজর পড়েছে, যার ফলে কবিতা-আবৃত্তি অভিনয় বা সঙ্গীতের মতো এক জন-শিল্পানুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এতে এক প্রধান স্থান পেয়েছে লিরিক কবিতা। কবিতাপ্রেমের কথা ভাবলে লক্ষণটা আনন্দের, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে মনে নানা প্রশ্নও আসে। সে-সব কথা আমি বলেছিলাম কিছুকাল আগে যখন কবিতা-আবৃত্তির চর্চা চারদিকে প্রবল হয়ে উঠেছে। 'আবৃত্তি আকাদেমী'র আমন্ত্রণে এক ঘরোয়া সভায় এ সম্বন্ধে আমি কিছু মত প্রকাশ করেছিলাম এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। আমার সেই বক্তব্য বছরখানেক বাদে আকাদেমীর মুখপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। অতঃপর এই বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রসদনে এক আলোচনা-সভা এবং আবৃত্তি ও কাব্যগীতির অনুষ্ঠান হয়। আমিও তাতে অংশগ্রহণ করি। বস্তুত আমার বক্তব্যেই আলোচনার সূত্রপাত। কিন্তু আলোচনা অগ্রসর হয়নি, কেননা উত্তর আসে আক্রমণে, যা প্রত্যাশিত ছিল না। সমস্যাটা সাহিত্যসংশ্লিষ্ট, বিশেষ কোনো তারিখে বিশেষ কোনো মঞ্চে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ দিয়ে তার সমাধান হয় না। আর এ বিষয়ে কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাধান তৈরি করাও যায় না। অবশ্য কোনো জন-অনুষ্ঠানে, যেখানে বহু লোক গিয়েছেন শিল্প উপভোগের জন্যে এবং যার সঙ্গে শৈল্পিক প্রতিষ্ঠার ব্যক্তিগত অভিমান জড়িত হয়ে পড়েছে, সেখানে এ ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা বাস্তবসম্মত কিনা তাও খুব সন্দেহের। তবে একেবারে অর্থহীন হয়তো নয়, কারণ শিল্পপিপাসু মনে চিন্তার কিছু জায়গা তো থাকে, সেখানে খানিকটা নাড়া লাগে, যা শেষ পর্যন্ত দৃষ্টির পক্ষে উপকারীই হয়।

কবিতা আমরা অন্যদের সামনে পড়ি কেন? জনসমাবেশে আবৃত্তি করি কেন? তার সহজ ও স্বাভাবিক কারণ তো এই যে, কোনো কবিতা পাঠকের

ভালো লেগেছে ব'লে তিনি সেই ভালো-লাগাটা অন্যদের অনুভব করাতে চান। অর্থাৎ কবিতার যে-ভাব বা যে-বক্তব্য তাঁকে নাড়িয়েছে সেইটা তিনি অন্যের মনে পৌঁছে দিতে চান। যে-সব কবিতা কাহিনী-প্রধান অথবা প্রত্যক্ষভাবে নাট্যগুণসম্পন্ন, সে-সব কবিতা নিয়ে সমস্যা নেই। সে-রকম কবিতা বিবৃত বিষয়ের অবলম্বনে অভিনয়-কুশলতার দ্বারা ফুটিয়ে তোলা যায় এবং তাতে শ্রোতাদের নাট্যপ্রেমও তৃপ্ত হয়। অবশ্য সেক্ষেত্রে আবৃত্তিকারের ক্ষমতা অনুসারে আবৃত্তির কার্যকারিতার তফাত হয়। কিন্তু সত্যিকার সমস্যার ক্ষেত্র হল লিরিক কবিতা। এ কবিতায় রূপ নেয় জীবন ও জগতের সংস্পর্শে কবির অব্যবহিত একান্ত প্রতিক্রিয়া। এই কারণে লিরিক কবিতা বিভিন্ন কবির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে। ঘটনার বিবরণ নয়, কাহিনী নয়, নাট্যভাষণ নয়। যে-কবিতায় কবির ব্যক্তিতা প্রকাশ পায়, তাঁর সংবেদনা ও অনুভূতির রূপায়ণ থাকে, তাঁর মানবীয় উপলব্ধি উন্মোচিত হয়, এ সেই কবিতা। আধুনিক কবিতা বলতে আমরা এখন একেই বুঝি। এই কবিতার জন্যেই সমস্যার উদ্ভব। অন্য কোনো কবিতা পাঠের ধরন এর উপর চাপানো চলে না। এ কবিতা কেউ নিজে পড়ার সময় তার যে-বক্তব্য, তা সে ভাবই হোক বা অনুভবই হোক বা আর কিছু, তাঁকে নাড়িয়েছে, অন্যের সামনে পড়ার সময় সেটাই শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করবেন, এই হল আসল কথা এ কবিতার ক্ষেত্রে। লেখক যখন স্বয়ং তাঁর লেখা পড়েন তখন এ ক্রিয়াটা আপনা থেকেই হয়, অবশ্য যদি তাঁর স্নায়বিক বিহ্বলতা না দেখা দেয়। আমি নিজের কথা এই বলতে পারি যে, আমি যে-আবেগ ও যে-অনুভূতি নিয়ে কোনো কবিতা লিখেছি, সেই আবেগ ও অনুভূতি ফিরে আসে আমার মনের মধ্যে যখন কবিতাটা অন্যের কাছে পড়ি। যাঁরা শুনছেন তাঁদের প্রতি আমার মনোযোগ স্বভাবতই থাকে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে যায় আমার মনের আন্দোলন (কোনো কারণে যখন শ্রোতাদেব প্রতি মনোযোগ বেশি দিই তখনই আমার কবিতাপাঠ ঠিক হয় না)। কবিতার ভাবের দ্বারা আমি যে আবার আন্দোলিত হই তার ফলে অন্যের মনে তা সঞ্চারের চেষ্টা সচেতনভাবে করার প্রয়োজন হয় না। অন্যের কবিতা যখন কেউ পড়েন তখন ওরকম একাত্মতা সম্ভব নয় বটে, কিন্তু আবেগ বা অনুভবের আন্দোলন নিশ্চয় থাকবে, কেননা অন্যের কবিতা যে পড়া হয় তা তো ভালো লাগার কারণেই পড়া হয়। আর অনুভূতিই এই ভালো লাগার মূলে। অর্থাৎ

কবিতার ভাবের সঙ্গে কবিতা-পাঠকের একটা হৃদ্‌গত সংযোগ ঘটে। এটা এক subjective ব্যাপার এবং এটা ছাড়া কবিতাকে শ্রোতার হৃদয়সংবেদ্য করা সম্ভব ব'লে আমার মনে হয় না। Subjective মনোভঙ্গি থেকে বিযুক্ত হলে লিরিক কবিতার পাঠ স্বভাবতই কবিতাকে ছাড়িয়ে শিল্পকৌশলের দিকে যায় এবং অন্যভাবে শ্রোতাকে প্রভাবিত করতে চায়। সেটা কবিতার ব্যাপার নয়। অবশ্য বুদ্ধিনির্ভর কবিতাও আছে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে-জাতের কবিতায় যদিও কবির যথেষ্ট ক্ষমতা প্রকাশ পেতে পারে যা প্রশংসার যোগ্য, এবং সে-কবিতা শ্রোতাকে ভাবাতেও পারে, কিন্তু তা কখনোই শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করতে, তাকে ভেতর থেকে নাড়াতে, তাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে পারে না।

আবেগ ও অনুভূতিকে ঘিরেই লিরিক কবিতার সৃষ্টি এবং তার আবেদনও পাঠক ও শ্রোতার আবেগ আর অনুভূতির কাছে। এই সৃষ্টি কবির নিজস্ব উপলব্ধির বাহন। সেইখানে এ কবিতার অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য। আর তার বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তার চলনে। হয়তো কোনো গূঢ় অনুভবকে ব'য়ে নিয়ে চলে এক শান্ত মন্থর বাক্যপ্রবাহ। কারো ক্ষেত্রে হয়তো কোনো নিবিড় ভাব রূপ নেয় টানটান শব্দ-সম্পর্কের মধ্যে। আবার হয়তো কোনো সৃষ্টিতে কবিতার অন্তর্গত কথা খোলা আওয়াজ পরিহার ক'রে বাক্যের এক চাপা ধ্বনিকে আশ্রয় করে। লিরিক কবিতার এই দুই দিক সম্বন্ধে সজাগ থেকে যদি কণ্ঠ ব্যবহার করা যায়, তবে কবিতা ঠিকভাবে পৌঁছয় শ্রোতার কাছে। অবশ্য এই সজাগ থাকাটা কোনো পরিকল্পনার বিষয় নয়, ওটা আপনা থেকেই ঘটে যদি কবিতার সংবেদনা থাকে পাঠকের মধ্যে। কবি তাঁর নিজের লেখা পড়তে গেলে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম।

কবিতা শোনার পর শ্রোতা তার ভাবে বিচলিত বা অভিভূত হবেন, এটাই তো কাম্য। পাঠকের অনুভূতি বা সংবেদনাই তা ঘটাতে পারে, অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভব নয়। সেই কারণে ভাঙা গলায় কবিতা পড়লেও তা শ্রোতাকে নাড়াতে পারে যদি পাঠকের এই আত্মগত ক্রিয়াটা থাকে তার পেছনে। কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু তার ভূমিকা নিশ্চয় কবিতা উপলব্ধির ভূমিকার চেয়ে বড়ো হতে পারে না। যদি সে-উপলব্ধির প্রকাশ না থাকে তাহলে কণ্ঠবাদনই বড় হয়ে ওঠে, যার ফলে আবৃত্তিকারের শৈল্পিক দক্ষতায় শ্রোতারা অভিভূত হন এবং তাঁরা কবিতাকে গৌণ ক'রে বাহবা দেন আবৃত্তির

কৌশলকে। এতে আপত্তির কিছু নেই যদি প্রগাঢ় অনুভব এবং অন্তর্বাহী ভাবনায় কবিতা বাদ দিয়ে পড়া হয় অন্য ধরনের কবিতা যাতে আছে আপাত নাটকীয়তা অথবা সহজ কাহিনী।

বিপত্তি ঘটে যখন আবৃত্তির শৈল্পিক অভ্যাসে পড়া হয় লিরিক কবিতা। কবিতাকে ছাড়িয়ে তখন অন্য শিল্প শ্রোতার মন জুড়ে বসে, কবিতা হয়ে যায় উপলক্ষ্য মাত্র। এবং কবিতার গুণাগুণে আর কিছু আসে যায় না। এর নিদর্শন আকছার পাওয়া যায়। যিনি ক্ষমতাবান শিল্পী, অর্থাৎ যাঁর কণ্ঠস্বর চমৎকার, যিনি তা ইচ্ছেমতো ওঠাতে নামাতে পারেন এবং সেই সঙ্গে মুখে নানারকম অভিব্যক্তি ফোটাতে পারেন এমন শিল্পী যখন কোনো ভালো কবিতা আবৃত্তি করেন তখন স্বভাবতই তুমুল হাততালি পান। তারপরই যদি তিনি এমন কোনো কবিতা পড়েন যা আগেরটির মতো উৎকৃষ্ট নয় (কবিতারও তো গুণের তারতম্য আছে, উৎকৃষ্ট অনুৎকৃষ্ট আছে, তাই না কি ?), তখনও তিনি সমপরিমাণ অভিনন্দন পান। এটা তো হামেশা দেখাও যায়। এমনকি তিনি যদি সঙ্কল্প ক'রে কোনো বাজে কবিতা পড়েন তাহলেও যে একই রকম তারিফ পাবেন একথা নিশ্চয় ক'রে বলা যায়। তাহলে কবিতার ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অন্য শিল্পের একটা অবলম্বন হওয়া ছাড়া আর কী ?

সন্দেহ নেই যে, এই অবলম্বনের মূল হল শব্দ-ধ্বনি। শব্দের ধ্বনি সব কবিতার মতো লিরিক কবিতারও এক মুখ্য উপাদান। তা থেকে তার চলনটা ধরা পড়ে, তার অঙ্গ-বিন্যাস ফুটে ওঠে এবং তার নির্ভরে ছন্দ এক বিশেষ আন্দোলন শ্রুতির মাধ্যমে মনে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু এ কবিতার আব এক ধ্বনি আছে যা ভেতর থেকে উঠে আসে, যা শব্দসমূহের প্রয়োগ ও অন্বয় এবং তাদের অর্থ ও ব্যঞ্জনাকে আশ্রয় ক'রে রূপ নেয়। কবিতার আসল অভিঘাত তা থেকেই উৎপন্ন হয়। কবিতার সার্থক পাঠে এই অর্থব্যঞ্জনা-সমন্বিত ধ্বনিরূপই মূর্ত হয়ে ওঠে। তখন উচ্চারণকর্তার উপস্থাপনার দিকে শ্রোতার আর মন যায় না, কবিতাটাই তাঁর সামনে চলে আসে।

আসলে অন্যের সামনে লিরিক কবিতাপাঠের প্রথম প্রেরণাই হল নিজের একান্ত ভালো-লাগা। এবং পাঠের ইচ্ছেটা স্বতোৎসারিত। পঠিতব্য কবিতার সঙ্গে নিজের আবেগ ও অনুভূতি জড়িত হয়েছে ব'লে একটা আত্মগত মনোভঙ্গি এই পাঠের পেছনে থাকে। সচরাচর যে আবৃত্তি-অনুষ্ঠান হয় তার সঙ্গে এই পাঠের পার্থক্য এই দুই কারণেই ঘটে অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ততা বা স্বতঃপ্রণোদন এবং

আত্মগত মনোভঙ্গি। অবশ্য এমন তর্ক করা যায় যে, অনুষ্ঠানের আবৃত্তিকার যখন কোনো কবিতা আবৃত্তি করেন তখন সে-কবিতা তাঁর ভালো লাগে ব'লেই করেন এবং ভালো-লাগার কোনো পরিমাপ-যন্ত্র নেই যা ব'লে দেবে কার কতখানি ভালো লেগেছে এবং কার ভালো-লাগাটা খাঁটি আর কারটা নয়। এ যুক্তি সরাসরি উড়িয়ে না দিয়ে একটু বিচার ক'রে দেখা যেতে পারে। পাঠক অথবা আবৃত্তিকার, প্রত্যেকেই তাঁর ভালো লাগে ব'লেই কোনো কবিতা পড়েন বা আবৃত্তি করেন, এ কথা মেনে নিলে'ও কিন্তুটা থেকে যায়। কেননা মনোভাব হিসেবে ভালো-লাগা যতই বিমূর্ত হোক, সব ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও তা প্রকাশ পায় বিশেষ বিষয়কে ভিত্তি ক'রে। তার এই প্রকাশরূপ নানারকম হতে পারে। সেটাকেই পরিমাপ-যন্ত্র ব'লে ধরা যায়, যা ঠিক-বেঠিকের হদিশ দিয়ে দেয়। তারপর আর পরিমাপের প্রশ্ন থাকে না। সব আবৃত্তিকার অবশ্যই নয়, কিন্তু অনেকেই তাঁদের ভালো-লাগা প্রকাশ করতে গিয়ে নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করেন, যা পঠিত কবিতাকে অতিক্রম ক'রে যায় এবং যার জন্যে কবিতা তাঁরা যাই পড়ুন না কেন তারিফ পান সমান। অর্থাৎ কবিতাকে উপলক্ষ্য ক'রে সৃষ্টি হয় অন্য শিল্প। কিন্তু কবি নিজে অথবা কবিতার একান্ত পাঠক যখন কবিতা শোনান তখন তাঁর নিঃসঙ্গ অনুভূতির সংযোগ থাকে তাতে। কবিতাটাই তখন তাঁর কাছে সর্বস্ব, কোনো করতালির প্রত্যাশা নিয়ে তিনি তা পড়েন না। কবিতার গুণাগুণ শুধু সেইভাবেই প্রকাশ পেতে পারে।

এইখানে কবিতা পাঠ বা আবৃত্তির সঙ্গে গানের অর্থাৎ যে-গানের কথায় কবিতা থাকে, যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত, সেই গানের এক অনতিক্রম্য পার্থক্য আছে। গানে অনুমোদিত স্বরলিপি দিয়ে কণ্ঠের চলাফেরা সম্পূর্ণ বাঁধা থাকে, তার বাইরে গায়ক বা গায়িকার যাওয়ার অধিকার নেই। কিন্তু আবৃত্তিতে কণ্ঠ-বিচরণের কোনো পথ ছ'কে দেওয়া থাকে না। আবৃত্তিতে স্বরলিপির কোনো প্রশ্ন নেই। সেখানে পাঠক বা আবৃত্তিকার নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন। অতএব তিনি স্বেচ্ছাচারীও হতে পারেন। তবু যে সঙ্গীতে বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার ভিন্নতা প্রকাশ পায়, একই গানের আবেদনে তারতম্য ঘটে, আমার ধারণা, তার মূলে থাকে গায়ক-গায়িকার অনুভূতি ও সংবেদনার ভিন্নতা। কোনো স্বরলিপির নির্দেশ সেখানে দেওয়া যায় না। গায়নে এবং আবেদনে যে-বিভিন্নতা হয় তাকে সৃষ্টি করে গায়ক বা গায়িকার সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব, তাঁর মনোভঙ্গি, গানের ভাবমণ্ডলে তাঁর প্রবেশ করার সামর্থ্য এবং রচিত শব্দাবলীর

ভাবে তাঁর সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। এদিক থেকে লিরিক কবিতার উপযুক্ত পাঠের সঙ্গে তার কিছু মিল আছে। আবার কণ্ঠসাধনা ও চর্চার দিক থেকে তার কিছু মিল আছে আনুষ্ঠানিক আবৃত্তির সঙ্গে।

আনুষ্ঠানিক আবৃত্তি যে ব্যক্তিগতভাবে কবিতা পাঠের থেকে অন্য প্রকৃতির, প্রস্তুতির প্রক্রিয়াই তা চিহ্নিত ক'রে দেয়। বৃহৎ জনসমষ্টির সামনে performance হিসেবে কবিতা পড়তে হলে তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার। ফলে শুরু হয় মহড়া। কণ্ঠকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, ভঙ্গিগুলো কোথায় কেমন হবে, এ সব নিয়মিত চর্চায় রপ্ত করেন শিল্পী। এই প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি কবিতাপাঠকে অন্য এলাকায় নিয়ে যায়, যা হল অভিনয়ের এলাকা। এই কারণে আবৃত্তিকে এক পৃথক শিল্প বলা যায় কিনা সে-প্রশ্নও আসে। পৃথক শিল্প, না অভিনয়-শিল্পের এক অঙ্গ? নাট্যাভিনয়ে যেমন থাকে স্বগতোক্তি অথবা একক কথন, তেমন কিছু? মোট কথা, এই আবৃত্তিতে আবৃত্তিকার জনসমক্ষে উপস্থাপনের জন্যে হিসেব ক'রে অভ্যেস ক'রে কবিতার এমন এক শিল্পরূপ দিতে চান যা তাঁর স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মূলত এই প্রস্তুতি, এই প্রশিক্ষণ, আনুষঙ্গিকের এই গুরুত্ব কবিতাপাঠের প্রকৃতি বদলে দেয়, কবিতার অবলম্বনে সৃষ্ট হয় এক বিশেষ শিল্পরূপ। অবশ্য performing art-এর বৈশিষ্ট্যই তাই। সেটা শ্রোতা ও দর্শক সাধারণের কাছে নিশ্চয়ই খুব চিত্তাকর্ষক হতে পারে, কিন্তু কবিতার নিজস্ব ভূমিকা সেখানে গৌণ। ফলে কবিতার effect-এর দিক থেকে মুড়ি-মিছরির সমান দর হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের নয়, যেমন বাজারদরে হয়েছে আজকাল। তর্ক ওঠানো যায়, কবিরাও তো নির্দিষ্ট কোনো দিনে জনসমাবেশে কবিতা প'ড়ে থাকেন, যেমন কবি-সম্মেলনে, তাহলে সে-পাঠও এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। কিন্তু তা যায় না এই কারণে যে, তাঁদের উপস্থাপনায় কবিতার শিল্পরূপ দানের কোনো প্রয়াস থাকে না। সব ক্ষেত্রেই তাতে স্বতঃস্ফূর্ততার একটা উপাদান থাকে। হয়তো কোনো কবি কবিতা ভালো পড়েন, কোনো কবি ভালো পড়েন না। কিন্তু এই ভালো বা মন্দ পাঠের মধ্যে দিয়ে কবিতাটাই তিনি আঁকড়ে থাকেন, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাঁর নিজের আবেগ। সুতরাং কবিতার গুণাগুণ শ্রোতার কান থেকে মুছে যায় না।

এমন দেখা যায় যে, কবিতার নিভৃত অনুরাগীরা যখন সেই অনুরাগবশে কোনো বিশেষ কবির কবিতা অন্যদের প'ড়ে শোনান তখন তাঁদের পাঠের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হয়। সুতরাং কবিতার পাঠে সেক্ষেত্রেও কি গোলমাল

থাকে না? এ সম্বন্ধে বলা যায়, যে-পার্থক্য ঘটে তা কবিতার প্রকৃতির জন্যেই ঘটে। আমরা জানি, লিরিক কবিতা, বিশেষত আধুনিক কালের কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই জটিল এবং গূঢ়সঞ্চারী। বিশিষ্ট শব্দ-সংযোগের মাধ্যমে তার তাৎপর্য এক একজনের কাছে এক একরকম প্রতিভাত হতে পারে। সুতরাং এ রকম কবিতা যাঁরা অন্যের কাছে পড়েন তাঁরা নিজের নিজের উপলব্ধি অনুসারেই পড়েন, যা সাধারণত এক হয় না। তাছাড়া, প্রত্যেকেরই পড়ার একটা ভঙ্গি থাকে, যা তাকে অন্যদের পড়ার থেকে পৃথক করে। এর সঙ্গে ঠিক পড়া বা বেঠিক পড়ার সম্পর্ক আছে ব'লে মনে হয় না।

আধুনিক লিরিক কবিতা বড়ো হতভাগিনী। ছাপার অক্ষরে তার দিকে তাকিয়ে দেখার মানুষ খুব কম। সুতরাং সাধারণ্যে তার প্রচারের প্রয়োজন আছে। তার একমাত্র উপায় হল কণ্ঠের আশ্রয় নেওয়া। অর্থাৎ লোককে প'ড়ে শোনানো। সে-কারণে কবিতা পাঠের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়। কবিতা জিনিসটা যে ফ্যাল্‌না নয় তার চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে তাকে জনপ্রিয় করার জন্যে আলো, সঙ্গীত, নাটকীয় কলাকৌশল ইত্যাদিও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সেজন্যে বেছে নেওয়া উচিত বিশেষ ধরনের কবিতা: যে-সব কবিতা উপলক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলেও কোনো কাব্যিক ক্ষতি হয় না। কিন্তু সাধারণভাবে লিরিক কবিতা ঐ উপায়ে জনপ্রিয় করতে গেলে ফল উল্টো হবে: কবিতাই মারা পড়বে। আমি মনে করি জনসমক্ষে কবিতার সংবেদনশীল পাঠই যথেষ্ট কার্যকর। অবশ্য 'জন' বলতে আমি শিক্ষিত জন বোঝাচ্ছি না। কেননা কবিতায় সাড়া দেওয়ার সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষার কোনো যোগ আছে ব'লে মনে হয় না। কবিতার সংবেদনা যাদের থাকে তাদের জন্ম থেকেই থাকে, যাদের থাকে না তাদের হাজার পরীক্ষাপাসেও গজায় না। সুতরাং এ বিষয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বাছবিচার না করাই উচিত। পাবলো নেরুদার আত্মজীবনী থেকে আমরা তো জেনেছি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের বিচারে তাঁর যে-কবিতাগুচ্ছ জটিল সাব্যস্ত হয়েছিল সেই কবিতা তাঁর মুখে শুনে খনি-শ্রমিকরা কতখানি অভিভূত হয়ে পড়েছিল। আমাদের দেশে যেহেতু শিক্ষিতদের চেয়ে অশিক্ষিতদের সংখ্যা অনেক বেশি, সেহেতু অশিক্ষিতদের মধ্যে কাব্য-সংবেদীর সংখ্যা অনেক বেশি, এটা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। অতএব শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদ না ক'রে সর্বত্র সর্বসমক্ষে কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করা উচিত। আমার বিশ্বাস, তাতে কবিতার পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হবে।

কবিতার পাঠ নিয়ে ভাববার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, বিশেষত যখন তাকে ক্রমশই বেশি ক'রে জনসমক্ষে নিয়ে আসা হচ্ছে। আমার ভাবনাগুলো এখানে নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করলাম। এমন দাবি করি না যে, আমার দৃষ্টিকোণ অভ্রান্ত। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে তা কি কখনো করা যায়? অন্য দৃষ্টিকোণ, অন্য ভাবনা থাকতে পারে। যদি থাকে, চলুক না আলোচনা। তাতে তো আমরা লাভবানই হব।

কবিতার গান

এককালে যারা এক ছিল সেই কবিতা ও গানকে আবার একাত্ম ক'রে তুলতে ইদানীং অনেকেই বেশ উৎসাহী। অবশ্য এক ধরনের একাত্মতা স্থাপনে সমালোচকরা ইতিপূর্বেই লেগে পড়েছেন। তাঁরা কোনো কোনো কবিতার ভাব অনুযায়ী তার গঠনে সাঙ্গীতিক বিন্যাস, অর্কেস্ট্রেশন ইত্যাদি আবিষ্কার ক'রে খুব ফলাও ব্যাখ্যা করেছেন। সম্প্রতি আবার অভিনয় কলাতেও এই সঙ্গীত-চরিত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার সামান্য বক্তব্য তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। ওটা সাহিত্য-বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবনী এলাকা, তাঁদের কল্পনার লীলাক্ষেত্র। সেখানে প্রবেশ করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার আলোচ্য এক সাধারণ বিষয়: কবিতায় গানের সুর দেওয়ার বিষয়। বর্তমানে কবিতায় সুরারোপের প্রচলন হয়েছে। অবশ্য তার চেয়েও বেশি প্রচলিত কবিতার আবৃত্তি। চর্চা এবং অনুষ্ঠান হিসেবে। সমবেত শ্রোতাদের সামনে কবিতার গান অথবা আবৃত্তি করা হয়। এ দুই জিনিসের চাহিদা যে আছে তা শ্রোতা-সমাগমে প্রকাশ পায়। উভয়কেই আমি অভ্যর্থনা করি কবিতার মুখ চেয়ে।

আমরা সবাই জানি বর্তমান কালে কবিতার পাঠক সংখ্যায় খুব অল্প। মুদ্রিত অক্ষরের উপরই আধুনিক কাব্যের নির্ভর। একে তো লিখিত রচনা এ দেশে অধিকাংশ মানুষের নাগালের বাইরে। তার উপর যাঁরা পড়তে পারেন তাঁদের অধিকাংশও কবিতা সম্বন্ধে আগ্রহী নন। আধুনিক কবিতার প্রতি এই ঔদাসীন্যের জন্যে লেখক এবং পাঠক দুই তরফকেই দায়ী করা যায়। তার ব্যাখ্যা পৃথক আলোচনার বিষয়। মুদ্রিত কবিতার পাঠক-সংখ্যা যে সীমিত তা স্বীকার ক'রে নিয়ে আপাতত এইটুকু বলা যায় যে, এই সীমাবদ্ধতা অনেকখানি কাটানো যায় যদি মুদ্রিত অক্ষরের বাইরে মুখের উচ্চারণকে তার বাহন করি। দুই উপায়ে তা করা সম্ভব। এক, আবৃত্তি, যার প্রচলন এবং জনপ্রিয়তা ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুই, গানের সুর, যা আবৃত্তির চেয়ে আরো শক্তিশালী, কেননা তার দ্বারা অনেক বেশি শ্রোতাকে টানা যায়।

কবিতাকে সুরের মাধ্যমে উপস্থিত করার ব্যাপারে পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'ছবি' এবং 'কৃষ্ণকলি' সকলেরই মনে পড়বে। তার পরে অন্যদের কিছু কবিতাতেও সুরারোপ করা হয়েছে, যেমন সত্যেন দত্তর 'পাল্কির গান', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার'। তবে একটা পার্থক্য এ বিষয়ে স্মরণীয়। কবিতার মতোই কবিতার সুরের উপর রবীন্দ্রনাথের নিজের কর্তৃত্ব ছিল প্রত্যক্ষ, সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত। তাঁর গীতরচনা ও তার সুরারোপের সঙ্গে তা তুলনীয়। কিন্তু অন্যদের কবিতার সঙ্গীতায়নে কর্তৃত্ব নিয়েছে অপরের ব্যক্তিত্ব। সত্যেন দত্ত বা সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁদের কবিতার সাঙ্গীতিক প্রকাশে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট হননি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। সে-সঙ্গীতরূপ সম্পূর্ণভাবে অন্যের সৃষ্টি। বর্তমানে যে-সব কবিতায় সুর দেওয়া হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। এইখানে কিছু বিপদের আশঙ্কা আছে। ফলে আমি আনন্দিত অবস্থায় কিঞ্চিৎ আতঙ্কিতও বটে।

প্রশ্নটা গীতিকার ও সুরকারের নয়, কবি ও সুরকারের। সুর দেওয়া হবে ভেবে নিয়ে এক্ষেত্রে শব্দগুলো বসানো হয়নি, সুরের কথা না ভেবেই শব্দগুলো লেখা হয়েছে। কবিতায় এই সুরারোপ এখানে যদিও আবৃত্তিচর্চার মতো ব্যাপক এখনো হয়নি, তবু তার উদ্যম ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এ সময় ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তার দরকার আছে। একটা দেশ জানি যেখানে এই উদ্যম বেশ একটা সংগঠিত রূপ নিয়েছে। সুতরাং তার কথা একটু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, লাভজনকও হতে পারে। ফ্রান্সে, গত মহাযুদ্ধের আগেই, কবিতায় গানের সুর দেওয়ার রেওয়াজ হয়। মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে তা প্রায় এক আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক ফরাসী কাব্যে অন্যতম প্রধান কবি ঝাক প্রেভের-এর নাম (১৯৭৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে) এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর বন্ধু ছিলেন সুরকার ঝোজেফ কসমা। তিনি কবির সহযোগিতায় তাঁর কবিতায় সুর বসাতে আরম্ভ করেন। এইসব কবিতা-গান ফরাসীদের একেবারে মাতিয়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে গত মহাযুদ্ধের পরে একটা প্রজন্মের প্রায় সমস্ত ছেলেমেয়ের মুখে মুখে গানের সুরে ঘুরতে থাকে প্রেভের-এর কবিতা। এবং তাঁর কবিতার বই বিক্রি হতে থাকে হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন জনপ্রিয় কবি আর জন্মাননি। প্রেভের-এর জনপ্রিয়তার একটা বড়ো কারণ নিশ্চয় তাঁর কবিতার গীত রূপ, তবে সমস্ত কারণ নয়। তাঁর কবিতার কিছু বৈশিষ্ট্যও তার আকর্ষণ সৃষ্টিতে অংশ

নিয়েছে। সে অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ। যাইহোক, ঐ থেকেই কবিতায় সুর দেওয়া ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়ে যায় ফ্রান্সে। প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত নানা কবির কবিতা গানের রূপ পায়। যেমন, ভীঁয়, য়্যুগো, আপলিনের, ফর, আরাগঁ, দেস্‌নস্‌। অনেকে গানের জন্যেই কবিতা রচনা করেন। যেমন, সাত্র্‌। অবশ্য শেষোক্তকে কবিতা না ব'লে বলা উচিত গীতি, যে-অর্থে তার লেখককে আমরা কবির বদলে বলি গীতিকার। এর সমস্যা অন্য।

কবিতায় সুরারোপ নিয়ে একটা প্রশ্ন প্রথমেই আমার মনে আসে। তা হল: সব কবিতাকেই কি সুর দিয়ে কবিতা হিসেবে হৃদয়গ্রাহী করা যায়? আমার ধারণা, যায় না। সুর জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু কবিতার নিজস্ব আবেদন সব ক্ষেত্রে থাকবে ব'লে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, জটিল কোনো আধুনিক কবিতায় সুর দিয়ে তার প্রতি সর্বসাধারণকে আকৃষ্ট করা প্রায় অসম্ভব। অন্য কথায় বলতে গেলে, কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে সুরারোপিত কবিতা শ্রোতাসাধারণকে নাড়াতে পারে। যথা, কবিতায় ব্যক্ত আবেগের বা অনুভূতির একটা প্রত্যক্ষতা থাকা দরকার। তার মানে, কবিতায় আমি যাই বলি না কেন তা সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মনে কোনো ছবি তৈরি করবে অথবা তার অভিজ্ঞতাকে অনুরণিত করবে। তাছাড়া, শব্দাবলী সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। লোকে যে-সব শব্দের সঙ্গে পরিচিত, সেগুলোই তাদের মনে সরাসরি পৌঁছয়। লোক-ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ তাদের আরো বেশি আকর্ষণ করে। এইসব অবলম্বন ক'রেই বা এইসব অবলম্বন ক'রেও কবিতায় মৌলিকতা আনা সম্ভব, যেমন এনেছিলেন প্রেভের।

সুতরাং কবিতা নির্বাচনের সমস্যা অপরিহার্যভাবেই এসে পড়ে। কোনো কবির কবিতা নির্বাচনে সেই কবিই যে সুরকারকে বিশেষরকম সাহায্য করতে পারেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেক্ষেত্রে কবি অনুপস্থিত সেক্ষেত্রে সব নির্ভর করে সুরকারের বোধের উপর। সেটা এক মূল কথা। দ্বিতীয়ত, কবিতার সুরারোপে নিছক সুরের বৈশিষ্ট্য, অভিনবত্ব বা আবেদন ভাববার বিষয় নয়, ভাববার বিষয় হল কবিতার কথা আর বক্তব্যের সঙ্গে সুরকে যুক্ত করা (যা অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো খুব কঠিন কাজ)। কেননা যে-কবিতা গান হিসেবে লেখা হয়নি তার ভাবকে শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করাই এখানে আসল লক্ষ্য। এমনভাবে সুরারোপ করা দরকার যে, কবিতার ভাব বা বক্তব্য সুরের

অবলম্বনে মূর্ত হয়ে উঠবে। নইলে গানের শেষে গায়কের কণ্ঠস্বর, সুরের কায়দা, এমনকি নিজস্বতার তারিফ হবে, কিন্তু কবিতা বেচারা মাঠে মারা যাবে। এ ক্ষেত্রে কবির সহযোগিতা খুব মূল্যবান। কারণ কোথায় সে-কবিতার প্রাণ, তার অন্তর্লীন ওঠাপড়া, কোন্ কোন্ শব্দ বা শব্দসমষ্টি তার চরিত্রচিহ্ন, সে-হদিস লেখকই সবচেয়ে ভালো দিতে পারেন। কিন্তু তিনি না থাকলে কবিতার মরণ-বাঁচন সুরকারের হাতে। সে-অবস্থায় সুরকারের কাব্যবোধ তাঁর একমাত্র পথ-প্রদর্শক। অতএব যেমন কবিতা নির্বাচনের বেলায়, তেমন কবিতার সুরারোপের বেলায়, সুরকারের কাব্যবোধই প্রথম আবশ্যকীয় বস্তু। কবিতা-গানে গায়কের কণ্ঠসম্পদ আর সঙ্গীতপটুতা শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে কবিতাকে মেরেও ফেলতে পারে। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে শুধু সুরকারের কাব্যিক উপলব্ধি। অর্থাৎ কবিতায় যিনি সুর বসাবেন, একটা সহজাত কাব্যবোধ তাঁর না থাকলে চলবে না। না থাকলে কবিতার গান কী দাঁড়ায় তার নমুনা আমরা অনেক সময়ই পাই। বুঝতে পারি না কেন এ কবিতা বাছা হল, কেন গলা এখানে চড়ল ওখানে নামল, কেন এই ক্ষিপ্রতা এই মন্থরতা, কেন এত কারিকুরি এবং, শেষ পর্যন্ত, কবিতা কোথায় গেল।

সাহিত্য অনুবাদের সমস্যা

অনুবাদ অর্থাৎ এক ভাষাকে আর এক ভাষায় রূপান্তরিত কবা এমন এক কাজ যার প্রতি পদেই সমস্যা। একদিকে যেমন যান্ত্রিক হবার তাগিদ, অন্যদিকে তেমনি মৌলিক হবার আহ্বান, এই দুই পরস্পর-বিরোধিতার মাঝখানে তার পথ চলতে হয়। এ কাজের প্রকৃতি প্রথম থেকেই দ্বৈত। নিজের ভাষায় মগ্ন হয়ে নিজের খুশিতে লিখে যাওয়া নয়, একই সঙ্গে দুই ভাষার স্তরে মনকে নিযুক্ত রাখা, দুই ভাষা নিয়ে মাথা ঘামানো এবং দুই ভাষার চালচলন পদ্ধতিপ্রকরণের উপর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখা। সুতরাং অনুবাদকর্মের প্রথম শর্তই হল দুটি ভাষা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান। সমান জ্ঞান বলব না। কারণ এ কাজের একদিকে পাল্লা ভারী হবেই, যে-দিকটায় জ্ঞানের সঙ্গে অনুভবও যুক্ত হয়। যে-ভাষা থেকে অনুবাদ কবা হয় সেই ভাষা প'ড়ে তার সঠিক অর্থ বোঝাই আসল, যেহেতু সেই ভাষায় অনুবাদক লিখছেন না, তিনি পড়ছেন। কিন্তু যে-ভাষায় অনুবাদ করা হয় সেই ভাষায় অনুবাদকের নিগূঢ় জ্ঞান থাকা দরকার, যেহেতু সেই ভাষায় তিনি লিখছেন। শব্দার্থ ও বাক্যার্থের সূক্ষ্ম তারতম্য বা 'ন্যুয়ান্স' নিয়ে অনুবাদকের কারবার উভয় ক্ষেত্রেই। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে তাঁকে শুধু প'ড়ে উপলব্ধি করতে হয়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁকে লিখে প্রকাশ করতে হয়। এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আকাশ-পাতাল। প্রকাশ-ক্ষমতার দিক থেকে দুই ভাষায় সমান স্বভাবজ অধিকাব যদি কারো থাকে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু তেমন সব্যসাচী অনুবাদকেব জন্মেব জন্যে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষায় থেকে অনুবাদকর্ম স্থগিত রাখা কোনো কাজের কথা নয়। সুতরাং দুই ভাষায় অধিকারেব অসমতা মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই কারণে আমার বদ্ধমূল ধারণা, যথার্থ অনুবাদ, বিশেষত সাহিত্যের অনুবাদ, একমাত্র সম্ভব অনুবাদকের মাতৃভাষায় বা যা তাঁর মাতৃভাষায় পরিণত হয়েছে এমন ভাষায়।

কিন্তু যে-ভাষা অনুবাদ করার দায়িত্ব নেওয়া, সেই ভাষা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অপরিহার্য। নইলে হৃদয়বিদারক ঘটনার সম্ভাবনা মোড়ে মোড়ে। বিদেশী ভাষার শব্দসমষ্টির বিশেষ বিশেষ প্রয়োগার্থে যথেষ্ট অনুপ্রবেশ না থাকলে অনুবাদ

নানান্ মিথ্যার জন্ম দেয়। যাকে বলা হয় 'ক্রিয়েটিভ লিটারেচার', সৃজন-সাহিত্য, তার অনুবাদে এই জ্ঞানাভাব রচনাকে স্থূলতম অর্থে নিষ্ফল ক'রে দেয়। আমাদের বিনীত বাংলা ভাষার কথা ছেড়েই দিলাম, জ্ঞানে গরিমায় সেরা ইংরিজী ভাষাতেই এ দুর্ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটতে দেখা যায়। কয়েক বছর আগে আমেরিকার এক বিখ্যাত প্রকাশন-সংস্থার উদ্যোগে ফরাসী কবি পল এলুয়ার-এর কবিতাবলীর একটি অনুবাদ-গ্রন্থ বেরোয়। সেখানে দেখা গেল ইংরিজী ভাষান্তরে কোনো কোনো জায়গায় মূল ছত্রের যে-মানে করা হয়েছে তা মোটেই ঠিক নয়। অনুবাদক যে ফরাসী বাক্‌রীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন তা স্পষ্ট। বোদলের-কাব্যের ইংরিজী অনুবাদেও ঐ ধরনের ভুল লক্ষ্য করা গিয়েছে। অবশ্য যে-ভাষা অনুবাদকের নিজের ভাষা নয়, তার বিষয়ে ভ্রান্তি ঘটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। সেই জন্যেই কিন্তু আক্ষরিক অর্থারোপে অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন, যাতে লেখক যা বলেননি তাঁকে দিয়ে তা বলানো না হয় অথবা তিনি যা বলেছেন তা অকথিত না রাখা হয়। ভ্রান্তি ঘটা খুবই স্বাভাবিক। এমনকি টি. এস. এলিয়ট-এর মতো ফরাসী জানা অসাধারণ অনুবাদকও তা এড়াতে পারেননি। ফরাসী কবি স্যাঁ-ঝন পের্স-এর 'আনাবাজ' কাব্যের প্রথম অনুবাদে তিনি কয়েকটা ভুল যে করেছিলেন তা তিনি নিজেই ঐ গ্রন্থের নতুন সংস্করণের ভূমিকায় স্বীকার করেন। এও তাঁর এক মহত্ত্ব। এই স্বীকৃতি এবং ভ্রমসংশোধন অনুবাদক হিসেবে তাঁর দায়িত্ববোধেরই পরিচায়ক।

এলিয়ট তাঁর ভূমিকায় এ কথাও বলেন যে, তিনি প্রথম অনুবাদে অনেক স্বাধীনতা নিয়েছিলেন যা তিনি অতঃপর বর্জন করলেন। তাঁর এই ঘোষণায় অনুবাদবিষয়ক এক বিশেষ প্রশ্ন প্রতিফলিত হয়েছে, যা অনুবাদ-সমস্যার এক অন্তর্নিহিত মূল প্রশ্ন: সৃজন-সাহিত্যের ভাষান্তরের কাজে অনুবাদক কতখানি স্বাধীনতা নিতে পারেন?

সাহিত্যের অনুবাদ এবং অ-সাহিত্যের অনুবাদ জাত হিসেবে আলাদা। যে-রচনা সৃজনধর্মী নয় তার অনুবাদ আক্ষরিকতায় বিশ্বস্ত হলেই সফল হয়। তার ক্ষেত্রে মোটামুটি বাক্যের স্থূল বা সাধারণ বা বাস্তব বা বৈষয়িক অর্থ প্রকাশ ছাড়া অন্য সমস্যা নেই। কিন্তু সৃজনধর্মী সাহিত্যের অনুবাদও এক সৃজনধর্মী কর্ম। অথচ, কী বিড়ম্বনা, তা পূর্ণ সৃজন নয়। এই দুই অর্ধ-চারিত্র্যের সংযোগ থেকেই অধিকাংশ সমস্যার উদ্ভব। মূল রচনার বক্তব্য, শৈলী, আঙ্গিকগত

বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি তার ভাবমণ্ডল অনুবাদে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা অবশ্য-কর্তব্য। ভাষাজ্ঞানের প্রশ্নটা এক্ষেত্রে আরো বিশদ ও সূক্ষ্ম। শুধু মূল ভাষাটা জানলেই চলে না; যে-লেখকের অনুবাদ করতে যাওয়া, তাঁর বিশিষ্ট ভাষাও জানা দরকার, এমনকি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর সেই গ্রন্থটির বিশিষ্ট ভাষাও। এবং এ কাজের পক্ষে শুধু ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, কারণ নিছক আক্ষরিকতা এখানে মূল রচনাকে অন্য ভাষায় বাহন করতে পারে না। ভাষাজ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে প্রয়োজন হয় লেখন-কুশলতার। অর্থাৎ সাহিত্যের অনুবাদ যদি কেউ গ্রহণযোগ্যভাবে করতে পারেন তো সাহিত্যিকই পারেন। অন্যে নয়। কেননা সাহিত্যরচনায় তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তাঁকে বিবিধ অন্তর্লীন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে, যা অন্যের অধিগত নয়।

কিন্তু অনুবাদে যতই সাহিত্যিক ক্ষমতার প্রয়োজন হোক না কেন সাহিত্য সৃজনের সঙ্গে তার পার্থক্য মৌল। অনুবাদ নিজস্ব কোনো সৃষ্টি নয়, ধার-করা সৃষ্টি। মূলত তা সৃজন-সাহিত্য নয়, যেহেতু তার প্রেরণা, আবেগ, বিষয়বস্তু, বক্তব্য এবং আঙ্গিক কিছুই অনুবাদকের নয়, সবই লেখকের। এক ফরাসী প্রাবন্ধিকের উক্তি অনুসারে বলা যায়, অনুবাদ কখনো কখনো শিল্পকর্মের মর্যাদা লাভ করতে পারে, কিন্তু অনুবাদ নিজ অধিকারে শিল্পসৃষ্টি নয়। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল অন্য এক জগতে অন্য এক যুগে পাঠককে নিয়ে যাওয়া অথবা অন্য এক জগৎকে অন্য এক যুগকে পাঠকের কাছে নিয়ে আসা, অন্য এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটানো যে-ব্যক্তিত্ব অনুবাদকের নয়, লেখকের।

লেখক সম্পূর্ণ স্বাধীন, অনুবাদক আদৌ স্বাধীন নন। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আছে, কিন্তু তার প্রকৃতি একেবারে আলাদা। লেখকের আত্মনিয়ন্ত্রণ স্বতোদ্ভূত, তাঁর প্রতিভার স্বভাবে তা নিহিত; পক্ষান্তরে অনুবাদকের আত্মনিয়ন্ত্রণ যান্ত্রিক, তার নির্দেশ বাইরে থেকে আসে। অনুবাদক নিজের সামনে নিজে নন, অন্যের সামনে নিজে। এক আত্ম-অবলোপের দায় যেন তাঁকে টেনে নিয়ে চলে। অনুবাদককে নিজের ব্যক্তিত্ব লেখকের ব্যক্তিত্বের আধারে রাখতে হয়, তা ছাপিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। আর মজার কথা এই যে, অনুবাদকের এ আত্মসমর্পণ যত নিঃশর্ত হয় ততই তিনি জয়লাভ করেন। কারণ তাঁর অনুবাদ মূল রচনাকে ততই বেশি প্রতিফলিত করতে পারে। এজন্যে অনুবাদককে বাস করতে হয় লেখকের সৃষ্টির মধ্যে, তার আবহাওয়ায় তাঁকে নিঃশ্বাস নিতে হয়। তবেই তাঁর কলমে লেখকের ভাব-ভাষার কিছু

গুণ ভর করতে পারে। এই কারণেই সাহিত্য-অনুবাদকের পক্ষে সাহিত্যিক সত্তার এমন প্রয়োজন। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে এই জাতবিচার হয়তো খানিকটা পরিহার করা চলে, কিন্তু কবিতা অনুবাদের যোগ্যতা কবি ছাড়া, অন্তত কাব্যপ্রবণতা যাঁর আছে এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

সৃজনধর্মী সাহিত্যের সব শাখায় অনুবাদ-সমস্যা স্বভাবতই একরকম নয়। কাহিনীভিত্তিক উপন্যাস বা গল্পের অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ। তাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদে রচনার রূপ মোটামুটি বজায় রাখা যায়, অবশ্য মূল ভাষার শব্দসমষ্টির প্রয়োগার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই আপেক্ষিক সহজসাধ্যতার কারণ, এই সব রচনার বাক্য-বিন্যাস সাধারণত প্রথানুগ এবং বিষয়বস্তু সর্বজনবোধের সীমানার মধ্যে। কিন্তু এমন সব রচনাও আছে যাদের বেলায় সমাধান অমন সহজ নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, জেম্‌স্‌ জয়েস-এর 'ইউলিসিস'। আধুনিক কালের বহু উপন্যাসে ও নাটকে এই দুরূহতা। তবে নাটকের সমস্যা একটু আলাদা ব'লেই মনে হয়। নাটক তো কথোপকথন। সেখানে বিভিন্ন চরিত্র এবং তাদের কথাবার্তার সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাদের সংযোগ প্রত্যক্ষ। এই ঘনিষ্ঠতা অটুট রাখবার জন্যে বিদেশীয়ানা এড়ানোর ঝোঁক দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এই কারণেই বোধহয় নাটকের ক্ষেত্রে অনুবাদের চেয়ে অনুসরণের বেশি রেওয়াজ। অনুবাদের কথাই যদি ধরা যায় তাহলে সাধারণ সামাজিক নাটকের ভাষান্তর অনেকটা সহজসাধ্য। কিন্তু প্রতীকী বা গূঢ়ার্থ নাটক? সেখানে যে শব্দ ও অর্থের বিচিত্র লীলা! অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন, ইওনেস্কো, যাঁর নামে আজকাল অনেকে বিহ্বল হন, তাঁর নাটক ভাষা এবং বিষয়-উপস্থাপন উভয়তই অত্যন্ত দুরূহ নয় কি বাংলায় অনুবাদের পক্ষে? এই সব রচনার অনুবাদকর্মে কাব্য অনুবাদের সমস্যাই অনেকটা এসে পড়ে। শব্দ, তার অন্তরঙ্গ প্রতিধ্বনি, তার প্রয়োগের অভিনবত্ব এবং তাদের সমন্বয়ে বাক্যের তাৎপর্য অনুবাদে প্রকাশ করতে গেলে দরকার হয় নানান ওলটপালটের, নানারকম ছাঁটাইবাছাইয়ের, এমনকি কখনো কখনো নতুন শব্দ নির্মাণের। যেমন, কবিতার, বিশেষত আধুনিক কবিতার বেলায় হয়।

আক্ষরিক ভাষান্তর কখনোই সাহিত্য-অনুবাদের এক সাধারণ বিধানরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প যাই হোক না কেন,

সম্পূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদ কদাচ সম্ভব নয়, এমনকি যেখানে প্রয়োগসিদ্ধতার সূত্রে শব্দ বদলের প্রয়োজন নেই সেখানেও। প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, এক ভাষার সমস্ত শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ আর এক ভাষায় নেই। দ্বিতীয়ত, একটি শব্দের প্রতিশব্দ সবসময় মূল ভাষার শব্দের মতো জীবন্ত হয় না, যেহেতু দুই জাতির সাধারণ অভিজ্ঞতা, যা থেকে সেই শব্দের উৎপত্তি, হুবহু একরকম নয়। তৃতীয়ত, এক ভাষার শব্দাবলীর কোনো গ্রন্থন যে-আন্দোলন সৃষ্টি করে তা অন্য ভাষায় তাদের প্রতিশব্দের গ্রন্থনে হারিয়ে যায়, যেহেতু পরস্পর-ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ধ্বনি ও অর্থের প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না। তৃতীয় ব্যাপারটা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘ'টে থাকে।

তাৎপর্য প্রকাশই প্রধান কথা। মূল রচনার বিকিরণ-কেন্দ্রগুলো যদি কোনো অনুবাদে চাপা প'ড়ে যায় তাহলে সে-অনুবাদ মূল্যহীন। অনুবাদে কী তাৎপর্য প্রকাশ পাবে তা অবশ্যই সম্পূর্ণ নির্ভর করে অনুবাদকের বোধ ও উপলব্ধির উপর। অর্থাৎ তিনি রচনার কী ভাষ্য করলেন তার উপর। অনুবাদকের উপলব্ধিই সমগ্রভাবে রচনার অনুবাদকে নিয়ন্ত্রিত করে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দের মনোগত ব্যাখ্যাও রচনার উপস্থাপনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তার ফলেই মূলের যে রূপ অনুবাদক দেখেছেন, অনুবাদে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এইখানেই অনুবাদকের স্বাধীনতার প্রশ্ন, কেননা এইখানেই তাঁর কল্পনার উদার ক্ষেত্র। প্রখ্যাত ফরাসী কবি পল ক্লোদেল একদা ইংরিজী থেকে কভেন্ট্রি প্যাটামার-এর একটি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। কবিতাটির এক জায়গায় ছিল "প্যাথেটিক ল্যাশ", তার অনুবাদ ক্লোদেল ফরাসীতে করেছিলেন "পাতেতিক পোপিয়ের"। কিন্তু 'পোপিয়েব' তো 'ল্যাশ' নয়, 'আইলিড'। ফরাসীতে 'ল্যাশ'-এর প্রতিশব্দ 'সিল'। ভালেরি লারবো-র মুখে ফরাসী অনুবাদটা শুনে অ্যালিস মেনেল ঐ পরিবর্তনে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন ক্লোদেল এক চিঠিতে জবাব দিয়েছিলেন এই: "দুর্ভাগ্যের বিষয় 'ল্যাশ'-কে 'সিল' দিয়ে অনুবাদ করা অসম্ভব। একটা হল সেই 'সিল' যা বিদ্যুৎস্ফুরণ ক'রে উপরে ওঠে, আর একটা হল সেই ঝালর যা নিচে নামে, সে এক ছায়ার শব্দ, প্রায় নির্বাক। গম্ভীর 'পোপিয়ের' শব্দটি বেশি উপযোগী, বিশেষত 'পাতেতিক'-এর সঙ্গে অনুপ্রাসে।"

এখানে শব্দের যে-অনুষঙ্গ ক্লোদেল-এর মনে এসেছিল এবং ধ্বনির যে-

আবেদন তিনি শুনেছিলেন, তার ফলে মূল শব্দকে তিনি অনুবাদে বদলে দেন। প্রতিভাবান লেখকের এই উপলব্ধি এবং তার জন্যে তাঁর স্বাধীনতাগ্রহণ আপত্তিকর না হতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার সুযোগ থাকলে তার অপব্যবহারেরও সুযোগ থাকে। সে-বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রচনার তাৎপর্য যেখানে বহুমুখী, যেমন কবিতায় অনেক সময়, সেখানে স্বাধীনতার ক্ষেত্র খুব প্রশস্ত। অনুবাদকের নিজস্ব ভাবনার ছাপ তাতে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তা কখনোই এমন হওয়া উচিত নয় যাতে লেখকের স্বতন্ত্র মানসচরিত্র এবং প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। অনুবাদে এমন শব্দব্যবহারও উচিত মনে হয় না যার দ্বারা মূল ভাষার বহির্ভূত কোনো অনুষঙ্গ এসে উপস্থিত হয়। কেউ কেউ কবিতার বা কাব্যধর্মী রচনার অনুবাদে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তাঁরা সাধারণত নিজেরাই লেখক। তাঁরা মূল লেখক সম্বন্ধে তাঁদের বিশিষ্ট উপলব্ধি প্রকাশে এত ব্যগ্র হয়ে পড়েন যে, লেখকের ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য, এমনকি রচনাংশ ছাঁটাই ক'রে সে-জায়গায় নিজের নিজের ইচ্ছা ও অভ্যাস অনুযায়ী শব্দ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। ক্লোদেল বিবেক-তাড়িত হয়ে যে-পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, এ তা নয়। এ হল লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর অনুবাদকের ব্যক্তিত্বকে চাপিয়ে দেওয়া। এই অনুবাদকরা মনে রাখেন না যে, অনুবাদ এক শিল্পকর্মের পরিচয়মাত্র, তা স্বাধীন শিল্পকর্ম নয়। এর ফলে যে-অনুবাদ আমরা পাই, তা অনুবাদকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত, লেখকের গুণাগুণ তাতে দুর্নিরীক্ষ্য। রচনা হিসেবে তা প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু অনুবাদ হিসেবে নয়। কোনো অসুবিধার কারণেই, কোনো অপূর্ণতার ভয়েই অনুবাদে রচনার পুনর্লেখন চলে না। যতই ক্ষীণভাবে হোক, অনুবাদ যদি লেখকের স্বতন্ত্র মৌলিকত্বার পরিচয় উপস্থিত করতে না পারে, তাহলে তাকে অনুবাদ নাম দেওয়া যায় না।

অনুবাদকর্মের পরিকল্পনায় দুই রকম পদ্ধতির কথা উঠে থাকে। এক পদ্ধতি হল ভিন্‌দেশী লেখককে পাঠকের ভাষার জগতে নিয়ে আসা। অন্যটি হল পাঠককে ভিন্‌দেশী লেখকের ভাষার জগতে নিয়ে যাওয়া। প্রথম পদ্ধতি একান্তভাবে অনুসরণ করলে স্বাধীনতার সীমা থাকে না। নামধাম পাল্টে দেওয়া যায়, অনুষঙ্গ বদলে দেওয়া যায়, সবরকম বিদেশীয়ানা দূর করা যায়। সন্দেহ নেই, এর ফলে অনুবাদ সাবলীল ও সুপাঠ্য হওয়ার সুযোগ পায় এবং তার চেহারাটা বেশ দেশীয় হয়। একেই বুঝি বলে 'সুন্দরী বিচারিণী'। অন্য

পদ্ধতিতে অনুবাদকে অনুবাদই মনে হয়। কারণ তাতে পাঠককে এক বিদেশী লেখকের কাছে সরাসরি উপস্থিত করা হয়, তাকে অন্য এক সংস্কৃতির আবহাওয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়, এক ভিন্‌দেশী আস্বাদ তাকে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিরও একটা ঝুঁকি আছে। অনুবাদ বহিরঙ্গসর্বস্ব হয়ে পড়তে পারে।

আমার ধারণা, সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নির্বাচন ক'রে অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার বিশেষ দরকার হয় না। দুই পদ্ধতির মধ্যে পাঁচিল তোলার কোনো মানে নেই। অনুবাদ যদি মূলকে বিকৃত না ক'রে স্বাভাবিকভাবে দেশীয় হয়ে ওঠে, তাতে আপত্তির কী আছে? কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তার বিদেশী চেহারা থাকলেই বা ক্ষতি কী? পাঠক তো জেনেশুনেই অনুবাদ পড়ছেন, মৌলিক স্বদেশী রচনা পড়ছেন না। জায়গাবিশেষে প্রয়োজন হলে ব্যাখ্যাত্মক শব্দও জোড়া যেতে পারে যদি তাতে লেখকের প্রকাশভঙ্গি না বদলে যায়। অবশ্য এসবই ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।

রচনার বিশেষ প্রকৃতি অথবা বিষয়বস্তুর জন্যে অনেক সময় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা পরিবর্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে এক ভিন্ন প্রশ্ন। যেমন ধরুন মলিয়ের-এর 'ল্য বুরঝোয়া ঝাঁতিয়ম'। এই নাটকের যে-সব দৃশ্যে নায়ক মঃ ঝুরদ্যাঁ সঙ্গীত, নৃত্য, অসিবিদ্যা, ফরাসী উচ্চারণ ইত্যাদি বিষয়ের চর্চা বা আলোচনা করছেন, বাংলা তথা কোনো ভারতীয় ভাষায় তা অনুবাদ করা যাবে কী ক'রে? কী ক'রেই বা অনুবাদ করা যাবে শেষ ব্যালে দৃশ্যটির? এমন ক্ষেত্রে মনে হয়, ভাষান্তরের পরিবর্তে রূপান্তরই একমাত্র পথ, যেমন করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপভাষা (ডায়ালেক্‌ট্) এবং অপভাষা (স্ল্যাং) আর এক সমস্যার উৎস। কীভাবে তাদের অনুবাদ করা যাবে? উপভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সরল। কোনো বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি কাহিনীর পাত্রপাত্রী হয়, তাহলে লেখক অনেক সময় সংলাপে তাদের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার ক'রে থাকেন। অনুবাদে তা বজায় রাখার প্রশ্ন নেই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো গ্রাম্যতা প্রকাশের জন্যে অনুবাদের ভাষায় একটা গ্রাম্যতা আনা যায়। অপভাষার ব্যবহার দুই কারণে হতে পারে। হয়, সেই স্তরের মানুষদের কথাবার্তার জন্যে তার প্রয়োগ; নয়, অপভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা অনেক ব্যাপারে শিক্ষিত ভাষার চেয়ে বেশি ব'লে তার প্রয়োগ। এই দুই ক্ষেত্রেই সমস্যার মোকাবিলা করা খুব কঠিন মনে হয় না। অপভাষা মানব-সমাজের সর্বত্রই আছে, যা এক বিশেষ স্তরের ভাষা। এবং সর্বত্রই

তাতে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির তীব্র তির্যক প্রকাশ। সুতরাং এক দেশের অপভাষায় ব্যক্ত মনোভাব ও বক্তব্যকে অন্য দেশের অপভাষার শব্দ ও বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যথেষ্ট সম্ভব মনে হয়।

কাব্যে আর এক সমস্যা আছে। ছন্দ ও মিল অনেক কবিতার অমোঘ অস্ত্র। অনুবাদে তাদের যথাযথ রক্ষা করার প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে না। তবে অনুবাদে তাদের একটা সাদৃশ্য প্রবর্তন নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ছন্দ ও মিল আনতে গেলে নতুন শব্দ যোজনা এবং মূলের শব্দ কিছু পরিমাণে বর্জন না ক'রে পারা যায় না। তাহলে অনুবাদ কীভাবে করা হবে? গদ্যে? কোনো কোনো অনুবাদক শব্দাশ্রয়ী মূল বক্তব্যকে অবিকৃতভাবে পাঠকের কাছে উপস্থিত করার জন্যে গদ্য ব্যবহার সমীচীন মনে করেন। কিন্তু ছন্দ ও মিল যেখানে কবিতার এক প্রধান অঙ্গ, সেখানে নিছক গদ্য কি বিকৃতি নয়? আমার বিশ্বাস, কাব্যের অন্তরে যদি প্রবেশ করা যায় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে সমস্ত শব্দ ও বাক্যকে যদি অনুধাবন করা হয়, তাহলে লেখকের ব্যবহৃত শব্দ থেকে কিছু স'রে এসেও, অল্পস্বল্প হেরফের ক'রেও তাঁর রচনাব আবেদন অনেকখানি বজায় রাখা যায়। অবশ্য সেজন্যে হয়তো একাধিক দিনরাত্রির আচ্ছন্নতা প্রয়োজন হয়, ব্যর্থতার বিপদ সামনে দেখেও নিষ্ঠায় অবিচল থাকতে হয়। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা এ যাত্রার পাথেয়।

লেখকের রচনার প্রতি বিশ্বস্ততা অনুবাদকর্মের প্রধান দায়িত্ব। যদি লেখকের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ থাকে তাহলে অনুবাদক স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব মেনে নেন। এক বিশেষজ্ঞ অভিমতের প্রতিধ্বনি ক'রে বলি: প্রকৃত অনুবাদ তাঁদেরই কাজ যাঁরা একাগ্র শ্রদ্ধায় মূল রচনার প্রতি মনোযোগী থাকেন এবং জানেন কীভাবে তাঁদের ভাষায় সমার্থক শব্দ ও বাক্য খুঁজে বের করতে হয়।

অনুবাদ ও অনুবাদ-প্রকাশন

কোনো ভাষার ধারাবাহিক মৌলিক রচনাবলীকে যদি নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদকে বলা যায় তার সব শাখানদী, যারা মূল প্রবাহকে পুষ্ট করে, বিস্তৃত করে। অনুবাদের মাধ্যমে আমরা যেমন স্পর্শ পাই প্রতিবেশীর তেমন দূরদেশীর, নীরবে কথোপকথন হয়, শিল্প এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন পট চোখের সামনে খুলে যায়। শিল্প ও জ্ঞানের যা একই সঙ্গে মূল এবং চরম স্তর, সেই মানবিক অস্তিত্বের দিক থেকে আমরা অনুভব করি নিকট ও দূরের হৃৎস্পন্দন : স্বগৃহের বৈশিষ্ট্য নিয়েই তৈরি হয় সেই সংযোগ যা সারা পৃথিবীকে একটি নীড় করে। সুতরাং অনুবাদ ব্যাপারের গুরুত্ব সামান্য নয়। তার তাৎপর্য বোধহয় সবচেয়ে বেশি আমাদের এই দেশে এই সময়ে। কেননা আমাদের দীর্ঘকালের অনগ্রসরতা দ্রুত অপসারণের প্রয়োজন রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে বৃটিশ শাসকদের ব্যবহৃত একপেশে সাংস্কৃতিক ছাঁচ ভেঙে আমাদের মনকে সৌষ্ঠব দেবার। এ কাজে স্বভাবতই দায়িত্বশীলতার ভূমিকা সবচেয়ে বড়। দায়িত্বশীলতা কার্যত এক্ষেত্রে সংগঠনের দায়। দায়িত্ব-শীলতার প্রশ্ন অবশ্য সব সাংস্কৃতিক তৎপরতাতেই নিহিত থাকে। কিন্তু মৌলিক সৃষ্টি এবং অনুবাদ, এ দুয়ের ক্ষেত্রে তার রূপ আলাদা। লেখক ও শিল্পীর নিজের সৃষ্টি সম্পূর্ণ তাঁর মনের অধীন, সেখানে বাইরের কোনো পরিকল্পনা, অন্যের কোনো বিচারবিধান গ্রাহ্য নয়। তাঁর ক্ষেত্রে যে-দায়িত্বের প্রশ্ন থাকে, সে তাঁর নিজের স্বভাবের দায়িত্ব, তাঁর নিজস্ব চেতনাই তা ভিতরে ভিতরে ঠিক ক'রে নেয় এবং তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মে তিনি তা সঞ্চারিত রাখেন। কিন্তু অনুবাদ ব্যাপারটা প্রধানত বহিরাগত। শুধু রচনাই যে অন্যের তা-ই নয়, তার নির্বাচন, ভাষান্তর, প্রকাশন, সবটার মধ্যে দায়িত্বশীল চিন্তা ও কার্যক্রমের প্রয়োজন থাকে। সেই কারণে বাইরের সংগঠন জরুরী এখানে। অবশ্য মৌলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো সময় সংগঠনের প্রশ্ন এসে পড়ে। কিন্তু তার প্রকৃতিও আলাদা। সেটা যেন আত্মরক্ষার জন্যে সংগঠন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈগুণ্যে অনেক লেখক হয়তো তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনাবার সুযোগ পান

না, তখন তাঁদের পক্ষে কিছু সংগঠনের দরকার হয়। তাছাড়া, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনো ভাবনা ও বক্তব্যকে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রেও লেখকরা সেই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হন। তবে এরকম সংগঠন সম্পূর্ণ বহিরঙ্গ। তার সঙ্গে লেখার উৎকর্ষ-অপকর্ষের সম্পর্ক নেই। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিত একেবারে ভিন্ন। এখানে সংগঠন সরাসরি সম্পর্কিত ভাষান্তরের গুণাগুণের সঙ্গে, কেননা মূল রচনা গুণান্বিত ব'লেই তো তার অনুবাদ। এখানে ভালো বচনা, ভালো অনুবাদ এবং ভালো বিপণন একসূত্রে বাঁধতে হয়। কাজেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা অপরিহার্য। অর্থাৎ সংগঠনই অনুবাদ এবং অনুবাদ-প্রকাশন তৎপরতার ভিত। অন্তত ভিত হওয়া উচিত, যদি আমরা অনুবাদকে সাহিত্য ও জ্ঞানের পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করি, যা মনে কবা উচি৲।

দুঃখের কথা, এ বিষয়ে আমাদের বাংলাভাষার ছবিটা এখনো পর্যন্ত উল্টো হয়ে আছে। অনুবাদের রাজ্যে দেখতে পাই সম্পূর্ণ নৈরাজ্য। বিবেকবান অল্প কিছু প্রকাশকের বিচ্ছিন্ন উদ্যম অবস্থার মোড় ঘোরাতে অপারগ। চিন্তা-হীনতা ও যথেচ্ছাচার এক এক সময় বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে। মনে হয়, অর্থাগমের পথ করাই যেন অনুবাদকর্মের একমাত্র সার্থকতা। আজকাল প্রাচীন অর্বাচীন বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থাবলী প্রকাশের একটা রেওয়াজ হয়েছে। বোঝা যায়, চাহিদা রয়েছে। এটা অবশ্যই সুলক্ষণ, এক একজন প্রখ্যাত লেখককে সম্পূর্ণভাবে জানবার এই আগ্রহ। এর ফলে বিভিন্ন দেশের বিশ্রুত লেখকদের অনুবাদ-গ্রন্থাবলী দ্রুত প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে। শিহরিত হবার মতো সংবাদ। পুলকে ও আতঙ্কে। বিশ্ববন্দিত লেখকদের এবার বাঙালী পাঠক-সাধারণ বাংলা ভাষায় পড়তে পারবে ভেবে আনন্দ হয়। সেই সঙ্গে এই ভয়, এমন ঢালাও অনুবাদ কী ক'রে সম্ভব? যেমন ধরুন, শেক্‌স্‌পীয়ার। আমাদের বড় ছোট অনেক লেখকই এ যাবৎ তাঁর নাটক ও কবিতা কিছু কিছু অনুবাদ করেছেন। সে-সব অনুবাদের দোষগুণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ওঠানো যায়, উঠেওছে। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক-অনুবাদ তো এক সাধনার ব্যাপার, হয়তো জীবনব্যাপী সাধনার। সে-অনুবাদকের যে-প্রতিভা প্রয়োজন, তা নিশ্চয় খুব সুলভ নয়। সুতরাং এই জিজ্ঞাসা পীড়া দেয়, এ কাজের জন্যে সে-প্রতিভা কি আবিষ্কৃত ও নিয়োজিত হয়েছে? অর্থাৎ এ কাজকে কি উপযুক্তভাবে সংগঠন করা হয়েছে? তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে অনুবাদের চেহারা কী দাঁড়াবে এবং বাঙালী

পাঠকসাধারণ শেক্স্পীয়ারকে কতখানি জানবেন? এছাড়াও সাধারণভাবে অনুবাদবিষয়ে আর একটা প্রশ্ন আছে। যেসব বিদেশী লেখককে অনুবাদ করা হচ্ছে, তাঁরা সবাই ইংরিজীতে লেখেননি, অনেকেই লিখেছেন অন্য ভাষায়, যা তাঁদের মাতৃভাষা: ফরাসীতে, জার্মানে, রুশে, নরউইজানে, জাপানীতে। আমরা সকলেরই অনুবাদ করছি ইংরিজী থেকে, তার মানে অনেকের অনুবাদের অনুবাদ। তাতে আসলের কতটা বজায় থাকছে, সে এক বড় প্রশ্ন। ঐসব ভাষাভাষী দেশে কিন্তু সাধারণত এমন হয় না, সেখানে মূল ভাষা থেকেই অনুবাদ করা হয়, অনুবাদেব অনুবাদ না, অন্তত তাদের চোখে যে-রচনা গুরুত্বপূর্ণ, সে-রচনার না। আর অনুবাদ মানেই তো আসলে তাই। অবশ্য মূল ভাষার সঙ্গে অনুবাদকের পরিচিতি সময় ও সংগঠন-সাপেক্ষ। ততদিন না হয় ইংরিজী থেকেই করা হোক, তবে তা যেন নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে করা হয়, এইটুকুই আমাদের প্রার্থনা।

মূল ভাষা সম্বন্ধে দৃকপাতহীন মনোভাব, এমনকি অনূদিত গ্রন্থ সম্বন্ধে অনুবাদকের পরম অজ্ঞতা আমাদের দেশে যেমন সচরাচরদৃষ্ট, এমন বোধহয় অন্য কোথাও নয়। আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটে, যা নিয়ে যুগপৎ কৌতুক বোধ করা চলে এবং শোকগ্রস্ত হওয়া যায়। একদা ভিক্তর হ্যুগোর বিখ্যাত উপন্যাসের এক সংক্ষিপ্তসার একজন বাংলায় বের করেছিলেন 'লা মিজাবেব্‌ল' নামে, সেই নামের এখনো অব্যাহত ব্যবহার চলছে; পরবর্তী অন্য অনুবাদেরও ঐ একই নাম। অনুবাদকের ধারণা নেই যে, ঐরকম নাম লিখলে যে-ভাষায় হ্যুগো ঐ বই লিখেছেন সেই ভাষায় অর্থাৎ ফরাসীতে দেওয়া নামের উচ্চারণ ও মানে দুই-ই বদলে যায়। আর এক দৃষ্টান্ত, ঝ্যুল ভের্ন-এর এক বই। অনুবাদে বইটার নাম বাংলা অক্ষরে ইংরিজীতে দেওয়া। কেন? ফ্রান্সের অধিবাসী ঝ্যুল ভের্ন নিশ্চয় ইংরিজীতে কথা বলতেন না বা লিখতেন না। এই ধরনের দায়িত্বহীন মনোভাবের ও কাজের যত শীগ্‌গির অবসান হয় ততই মঙ্গল। নইলে সবদিক দিয়েই ক্ষতি। যে-বিদেশী রচনা তার গুণের জন্যে অনুবাদযোগ্য, তার সত্যিকার পরিচয় জানা যায় না, তা এক বিকৃত রূপ নিয়ে পাঠকের সামনে আসে। আর আমাদের জ্ঞান ও শিল্পচেতনার যে-সমৃদ্ধি অনুবাদের দ্বারা সাধিত হতে পারে, তার ভরাডুবি হয়।

উৎকৃষ্ট সৃষ্টির ভাষান্তর প্রকাশ করবার আগ্রহটাই প্রথম কথা। সে-মনোভাব কোনো কোনো প্রকাশকের অবশ্যই আছে। কিন্তু কার্যত অনেক

সময়ই অভিপ্রায় এবং অভিপ্রায়-সাধনের মধ্যে ব্যবধান থেকে যায়। কেউ কেউ খানিকটা অগ্রসর হন, তারপর পিছিয়ে যান। সম্ভবত ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক সাফল্য-অসাফল্যের চিন্তা তাঁদের আর অগ্রসর হতে দেয় না। এখানে আমার এক অভিজ্ঞতার কথা বলা যেতে পারে। কিছুকাল আগে এক প্রকাশন-সংস্থার প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা ক'রে জানান যে উৎকৃষ্ট বিদেশী গ্রন্থের, প্রধানত উপন্যাস ও নাটকের, অনুবাদ প্রকাশে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন এবং ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ আমাকে দিয়ে করাতে চান। আমি সোৎসাহে বলি যে, বিশাল ফরাসী উপন্যাস-সাহিত্যের অনুবাদ বাংলায় নেই বললেই চলে এবং হওয়া খুব দরকার; আমি দু'একটা বই অনুবাদ করতে পারি এবং অন্য কী কী করা উচিত তার প্রস্তাব দিতে পারি। আমি প্রথমে স্তঁ্যাদাল এবং বালজাকের উপন্যাসে হাত দিতে বলি। স্তঁ্যাদালের 'ল্য রুজ এ ল্য নোয়ার' নিয়ে কথা হয়। কিন্তু গ্রন্থের আকার এবং অনুবাদককে দেয় অর্থ সম্পর্কে আলোচনা হতেই সমস্যা দেখা দেয়। অতঃপর তাঁরা একটা ছোট বই অনুবাদ করার কথা তোলেন। আমি তখন আবে প্রভো-র 'মানঁ লেস্‌কো' অনুবাদ করবার ইচ্ছে জানাই এই যুক্তি দেখিয়ে যে আঠার শতকের ঐ বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসে মানব-মানবীর প্রণয়-চিত্রণ সাহিত্যে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবেও তাঁরা পিছিয়ে যান। এই আশঙ্কা তাঁরা ব্যক্ত করেন যে, বইটি এবং তার লেখক যেহেতু বাঙালী পাঠকদের কাছে অজানা সেজন্যে তেমন বিক্রি হবে না। আমি আশ্চর্য হই, কারণ কথাটা অনুবাদ-দর্শনের বিপরীত। রচনা অনুবাদের প্রথম লক্ষ্যই তো এই যে, আমাদের পাঠকদের কাছে যা অজানা তা তাদের জানানো আর যে-ক্ষেত্রে লেখক ও বইয়ের নাম ধাম তাদের পরিচিত সে-ক্ষেত্রে মূলের প্রতিচ্ছবি তাদের সামনে উপস্থিত করা। বাজারের কথা নিশ্চয় ভাবা দরকার, কিন্তু সে-ভাবনা চলতি বাজারের স্রোতে গা ভাসানোর নয়, বাজারে অন্য স্রোত সৃষ্টি করার। সেভাবে যদি না ভাবা হয়, তাহলে সুস্থ কিছুই করার থাকে না। তাহলে আজকের দিনের শিল্পে সাহিত্যে বিপুল বিকৃত রুচিকে নিরন্তর খোরাক জোগানো এবং তার খিদে বাড়িয়ে তোলাই একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাজার সম্বন্ধে অত ভয় অযৌক্তিক। যে-প্রকাশকেরা যে-কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে নামেন, তাঁদের অবশ্য কোনোই ভাবনা নেই, তাঁদের বাজার তৈরি। কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রকাশকদের পক্ষেও অবস্থা

নৈরাশ্যজনক নয়। ভালো বই তো বাজারে বেরোয় এবং বিক্রি হয়। আর, অনুবাদের ক্ষেত্রেই তো দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাবলী প্রকাশের এবং নামী লেখকদের রচনা প্রচারের উৎসাহ। এটাই তো প্রমাণ করে যে, চাহিদা যথেষ্ট আছে এবং সব পাঠক অন্ধ হয়ে যায়নি। তবে এখানে বলা উচিত যে, জাতীয় স্বার্থে এমন গ্রন্থেরও অনুবাদ অবশ্যকর্তব্য, যার প্রকাশন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য অথচ সে-তুলনায় যার ব্যবসায়িক সাফল্য সুদূরপরাহত। সে-ক্ষেত্রে কোনো আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সে-অনুবাদ প্রকাশের দায়িত্ব না নিলে চলে না। অথবা সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করতে হয়। তবে সাধারণভাবে অনুবাদের চাহিদা যখন রয়েছে তখন প্রয়োজন অনুবাদ-প্রকাশনের সমগ্র ব্যাপারকে সুসংগঠিত করা: যে-চাহিদা রয়েছে তা সার্থকভাবে পূরণ করা এবং আরো বাড়ানো। এ সংগঠনের শিকড় হল উৎকৃষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য অনুবাদ। অতএব তার পরিকল্পনাই হল প্রথম পদক্ষেপ। বিষয়বস্তু অনুসারে অনুবাদকার্যের শ্রেণী বিভাগ করা, গ্রন্থ নির্বাচন করা, অনুবাদক নির্বাচন করা, উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা, অনূদিত রচনা নিখুঁতভাবে ছাপানো ও শোভন প্রচ্ছদে বাঁধানো এবং অবশেষে বিক্রির ভালো ব্যবস্থা করা, এই সংযুক্ত কার্যক্রমকে রূপায়িত করতে হবে। সেই জন্যেই সংগঠন। প্রকাশন-কার্যক্রমের সাফল্যের জন্যে বিক্রয় ও বণ্টন ব্যবস্থায় প্রকাশকদের যৌথ উদ্যম অপরিহার্য মনে হয়। কিন্তু তা ছাড়াও আমি মনে করি, অনুবাদ-বিষয়েই যদি বিভিন্ন প্রকাশকদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের কোনো ব্যবস্থা হয়, তাহলে অনুবাদ সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি আরো সহজসাধ্য হবে, নইলে অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শ্রম ও অর্থের অপচয় ঘটাতে পারে। অবশ্য এটা হবে এক সাধারণ ব্যবস্থা, যা কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে শুধু এক সীমাবদ্ধ সময়ে প্রযোজ্য। কোনো বইয়ের নতুন অনুবাদ পরবর্তী সময়ে হতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উৎকর্ষের দিক থেকে তার প্রয়োজনও মাঝে মাঝে হয়। অনুবাদ-প্রকাশনের এই পরিকল্পনা এক অনড় কাঠামো হওয়া ঠিক নয়। পরিকল্পিত হয়নি এমন কোনো বিশেষ অনুবাদ মনোনয়নেরও সুযোগ থাকা উচিত। যেমন, কেউ যদি নিজের উদ্যোগে কোনো রচনা অনুবাদ করেন এবং কোনো প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে তাঁর সেই অনুবাদ বিবেচনা করবার এবং প্রকাশযোগ্য হলে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তা না হলে সমগ্র অনুবাদকার্য এক সঙ্কীর্ণ খাতে বাঁধা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং ক্ষমতাশালী লেখক-অনুবাদকের

নিজস্ব উপলব্ধি ও উদ্ভব কোণঠাসা হয়ে যাবে, যা কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

অনুবাদক নির্বাচন এক জটিল সমস্যা অথচ তার সমাধানেই অনুবাদ-পরিকল্পনার সার্থকতা নিহিত। সুতরাং কাকে কী অনুবাদ করতে বলা হবে সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। যিনি যে-বিষয় অনুবাদ করবেন সে-বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে, কিন্তু সে-বিষয়ে তাঁর মোটামুটি জ্ঞান বা ধারণা না থাকলে চলে না। সে-জ্ঞান বা ধারণা তাঁর আগে থেকেই না থাকতে পারে, কিন্তু অনুবাদে হাত দেবার আগে কিছু তাঁকে জেনেশুনে নিতেই হবে। জ্ঞানআহরণ অনুবাদকের এক অপরিহার্য কর্তব্য। তবে আমার মনে হয়, সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অনুবাদক নিজেই লেখক হবেন। এটাই প্রথম শর্ত। যতই জ্ঞান থাকুক না কেন, তা বিফল হয়ে যাবে যদি ভাষা সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রকাশের মাধ্যম সম্বন্ধে তাঁর সহজাত বোধ না থাকে এবং নিজের লিপিকুশলতা না থাকে। এ প্রসঙ্গে আমার আর এক অভিজ্ঞতার কথা বলি। একবার এক প্রকাশন-সংস্থা আমাকে লিখলেন, আমি যদি ইচ্ছে করি তবে তাঁদের নির্বাচিত ফরাসী বই অনুবাদ ক'রে তাঁদের পাঠাতে পারি, অবশ্য তাঁদের অনুমোদন সাপেক্ষে, এবং ইচ্ছে করলে আমার ছাত্ররাও পাঠাতে পারে। প্রস্তাবের প্রথম অংশ আমাকে একটু বিস্মিত করেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ করেছিল সম্পূর্ণ বিমূঢ়। এইটাই তো ধ'রে নেওয়া হয়েছিল যে, ফরাসীর মাস্টারি করা যেহেতু আমার পেশা অতএব আমি ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদ করতে পারি এবং আমার ছাত্রেরা যেহেতু ফরাসী শিখেছে অতএব তারাও পারে। কোনো ভাষা কিছু জানলেই তার সাহিত্য অনুবাদ করা যায় এমন হাস্যকর ধারণা আর হতে পারে না। ভাষা ভালো জানলেও অনুবাদ করার সাধ্য হয় না যদি না নিজের লেখকসুলভ বোধ ও ক্ষমতা থাকে। ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই যদি অনুবাদ করা যেত, তাহলে ভারতবর্ষে যাঁরা ইংরিজী জানেন, ইংরিজী পড়েন এবং পড়ান এমন হাজার হাজার লোক শেক্‌স্‌পীয়ার অনুবাদ করতে পারতেন ; আর, যে-কালা সাহেবরা ইংরিজী কেতায় দুরস্ত এবং ইংরিজী ছাড়া কথাই বলেন না, তাঁরা ক্ষেমাঘেন্না ক'রে মাতৃভাষায় তর্জমা করলে তা একেবারে অনবদ্য হত। না, ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয়, অনুবাদককে তাঁর মাতৃভাষায় লেখক হতে হবে। তা না হলে অনুবাদ অপাঠ্য হবারই সম্ভাবনা বেশি। অতএব আমার নিবেদন, যাঁরা অনুবাদ করাবেন তাঁরা যেন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার

ভূমিকাকে অযথা গুরুত্ব না দেন, তাঁরা যেন জেনে নেন তিনি স্বচ্ছ বাংলায় লিখিতভাবে বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন কিনা। এই জেনে নেওয়ার দায়িত্বটা অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশন-উদ্যোক্তাদেরই নিতে হবে, কেননা সব যোগ্য ব্যক্তি সব সময় আবেদন নিয়ে এগিয়ে আসবেন না। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রয়োজনে যোগ্যতার অনুসন্ধান এক প্রকাশন-কর্তব্য।

পারিশ্রমিক সম্বন্ধেও ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন আছে। আমার মনে হয় না সব রকম অনুবাদের জন্যে একটা গড়পড়তা হার বেঁধে দেওয়া ঠিক। সব অনুবাদ সমান সহজ অথবা সমান কঠিন নয়। যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো তত্ত্বগ্রন্থ অনুবাদ করা কাহিনী অনুবাদ করার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। তাছাড়া বিভিন্ন লেখকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে মূল রচনায় সহজতা-কঠিনতায় পার্থক্য হয়। অতএব যুক্তিসঙ্গতভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অনুবাদের পারিশ্রমিকে তারতম্য হওয়া উচিত।

অনুবাদকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে প্রকাশন-সংস্থার অনুবাদবিষয়ে আলোচনার একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার মনে হয়। একটা প্রাথমিক আলোচনা, যখন উভয় পক্ষ কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের মতবিনিময় করবেন। পরবর্তী আলোচনা, যদি অনুবাদক প্রয়োজন বোধ করেন। কারণ, ভাষান্তর করতে গিয়ে অনুবাদক নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন (অনেক সময় হন), সে-সম্পর্কে তিনি তাঁর সমাধানের প্রস্তাব প্রকাশককে জানাবেন এবং তাঁর অভিমত জানবেন।

অনুবাদ-প্রকাশনের চূড়ান্ত পর্যায় বিক্রির ও বণ্টনের ব্যবস্থা। এর উপর সমগ্র উদ্যমের সফলতা নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে প্রকাশকদের সহযোগিতা এবং সম্মিলিত প্রয়াসের গুরুত্ব আগেই উল্লেখ করেছি। এর অঙ্গ হিসেবে প্রচারের দিকে যেন বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ঘোষণা না করলে প্রচার হয় না। কী বই এবং কেমন বই বের হল তার হদিস তো লোককে দিতে হবে। অতএব বিজ্ঞাপন ছাড়া উপায় নেই। যথেষ্ট বিজ্ঞাপন। যে-যুগে লেখকের প্রতিভা পর্যন্ত বিজ্ঞাপনের দ্বারা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে, সে-যুগে তার ক্ষমতা-শালিতার প্রতি উদাসীন থাকা আত্মহত্যারই সামিল। এত আয়োজন, এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি বিজ্ঞাপন যথেষ্ট না দেওয়া হয়। তখন মূল্যবান অনুবাদ বাজারে কাটবে না, কাটবে পোকায়।

গ্রহণ বর্জন পালা

সাহিত্যে, শিল্পে ও সঙ্গীতে খ্যাতি আর খ্যাতিহীনতার অথবা কখনো অখ্যাতির যে-রদবদল চলতে থাকে, তা প্রায় ম্যাজিক-দৃশ্যের মতো। আমির হয়ে যান ফকির এবং ফকির আমির। কিন্তু 'কী মজা' বলতে গিয়ে আমরা থম্‌কে যাই, বুঝতে পারি কৌতুকের মধ্যে মিশে রয়েছে ট্র্যাজিডি। কেননা খেলাটা অযথা সমাদর এবং অযথা অবহেলা দিয়ে তৈরি। খ্যাতি লাভ ক'রে যাঁরা বিস্মৃতি-সমুদ্রে তলিয়ে যান, ধীরে ধীরে অথবা দ্রুত, তাঁরাই অবশ্য সংখ্যাধিক, কিন্তু অবহেলা থেকে সমাদরে যাঁরা উঠে আসেন, তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও অবস্থার তীব্রতা তাঁদের ক্ষেত্রেই বেশি, অনেক বেশি। তবে উভয় ক্ষেত্রেই নিহিত থাকে ভাগ্যবিড়ম্বনা। আবার ব্যতিক্রমের মতো গ্রহণ-বর্জন-পুনর্গ্রহণ, এমন এক চক্রও কোনো বিরল মুহূর্তে ঘুরে যায়। এই মজাদার শোচনীয় পালাটা চলে সময়ের মঞ্চে, যা আয়তনে কখনো ছোট হয়, কখনো বা বড়।

যে-সব দেশে সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে ব'য়ে এসেছে, সেখানেই এই ওলটপালটটা স্পষ্ট ধরা যায়। মোৎসার্ট আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতস্রষ্টা হিসেবে বন্দিত। পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে তাঁর সৃষ্টি পরিমাণে ও স্বকীয়তায় বিস্ময়কর। কিন্তু যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তিনি ক্রমাগত বাধাই পেয়েছেন, কোনো স্থায়ী কাজ পাননি এবং শরীর ভেঙে পড়ায় যখন তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে তখন তাঁকে মাটিচাপা দেওয়া হয় বিত্তহীনের কবরে। আর সেজান? আধুনিক চিত্রকলার বিরাট পুরুষ, নতুন শিল্পভাবনার অসাধারণ রূপকার সেজান? সারা জীবন তিনি কেবল বিড়ম্বিতই হয়েছেন। সরকারী প্রদর্শনকক্ষে ছবি রাখার অনুমতি তাঁকে কখনো দেওয়া হয়নি, যদিও আজ তাঁর ছবি লুভ্‌র্‌ মিউজিয়মের এক সম্পদ। তাঁর ছবির ক্রেতা জোটেনি কখনো, শেষ পর্যন্ত দোকানীর নীলামে তাঁর ছয়খানি ছবির দামের অঙ্ক হয়েছিল ৯৫ থেকে ২১৫ ফ্রাঁ পর্যন্ত, যাদের প্রত্যেকটির মূল্য এখন লক্ষ লক্ষ ডলার। এই অবস্থার কথা ভাবলে বিমূঢ় হতে হয়।

এই গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারটা সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সাহিত্যের রাজ্যে। কীটস্-এর অদৃষ্টে তাঁর জীবনকালে যে-ঔদাসীন্য ও বিরুদ্ধতা হয়েছিল তা অনেকেই অবগত আছেন। কেউ কেউ বলেন সেইজন্যেই তাঁর অকালমৃত্যু হয়। তা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু সেই সংবেদনশীল মন ঐ আঘাতে যে ক্লিষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অথচ এই কীট্স্‌কে পরে ইংরিজী কাব্যে সমসাময়িক মহৎদের মধ্যে মহত্তম ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। কীট্স্-এর কবিতা Ode to Melancholy-র মধ্যে যে ফরাসী কবির কাব্যের কিছু পূর্বস্বাদ পাওয়া যায় সেই বোদলেরই বা কতটা গৃহীত হন তাঁর সময়ে? এটা ঠিক যে তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু তা তাঁর কাব্যসংক্রান্ত অন্য কারণে। তাঁর উপর সকলের নজর পড়েছিল যেহেতু তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ Les Fleurs du Mal-এর জন্যে অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সাধারণভাবে প্রকাশকরা তাঁর প্রতি বিমুখ ছিলেন। একমাত্র পুলে-মালাসিস, যিনি ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় অবিচল ছিলেন। অবশ্য ঐ আদর্শবাদী প্রকাশকের ব্যবসা শেষ পর্যন্ত লাটে উঠেছিল এবং তিনি আত্মগোপন করেছিলেন বেলজিয়ামে। ভিক্তর য়্যুগো এবং আরো কোনো কোনো কবি তাঁর প্রতিভা স্বীকার করলেও বোদলের যে বেশি পাঠক পাননি তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। পৃথিবীর সর্বত্র আজ তাঁর কাব্যের অগণিত পাঠক, কিন্তু তাঁর সমকালে তাঁর স্বদেশে ছিল কতজন? এ সম্বন্ধে বোদলের নিজে যে শ্লেষোক্তি করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। আদালত তার রায়ে বোদলের ও পুলে-মালাসিসকে জরিমানা করেছিল এবং Les Fleurs du Mal-এর কিছু কবিতা বাতিল করার হুকুম দিয়েছিল। সেই বর্জিত কবিতা কয়টির (সংখ্যায় ছয়) সঙ্গে আরো কিছু কবিতা যোগ ক'রে পুলে-মালাসিস গোপনে বেলজিয়ামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন Les Epaves নামে। তাতে প্রকাশকের ক্ষুদ্র নিবেদনটি লিখে দেন স্বয়ং বোদলের। তার শেষাংশটি এই: "এই প্রকাশনার সংবাদ গ্রন্থকারকে জানানো হবে এবং সেই সঙ্গে জানানো হবে সম্ভাব্য দুইশ ষাটজন পাঠককে। যখন থেকে জন্তুরা সন্দেহাতীতভাবে মানুষের বাক্য জবরদখল করেছে তখন থেকে ফ্রান্সে সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণ বলতে মোটামুটি ঐ দুইশ ষাট জনকেই বোঝায়।" মালার্মের পাঠকসংখ্যা খুবই সীমিত ছিল। মনে হয়, শেষ পর্যন্ত প্যারিসের রোম সরণিতে তাঁর বাসগৃহে মঙ্গলবারের সাপ্তাহিক বৈঠকে যে-গুণমুগ্ধরা জড়ো

হতেন, তাঁরাই ছিলেন তাঁর প্রধান পাঠক। তাঁদের বাদ দিলে তাঁর কবিতা পড়বার লোক আর কতজন ছিল তা অনুবীক্ষণ-পরীক্ষার বিষয়। এই প্রসঙ্গে মালার্মের রচনা প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবি-জীবনের প্রথম দিকে Le Parnasse contemporain নামে তখনকার নবকাব্যের সঙ্কলন বের হয় ক্রমান্বয়ে তিনটি। প্রথম দুটি সঙ্কলনে মালার্মের কবিতা ছিল, কিন্তু তৃতীয় সঙ্কলনে তাঁকে বর্জন করা হয়। এটি সম্পাদনা করেছিলেন আনাতল ফ্রাঁস! আবার অন্য দিকের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত স্যুলি-প্র্যুদম। তাঁর কাব্যের জন্যে ১৯০১ সালে নোবেল প্রাইজ পান এই ফরাসী ভদ্রলোক—সাহিত্যে প্রথম নোবেল লরিয়েট। তাঁর কবিতা পড়া দূরে থাক, তাঁর নামটাই বা কজন জানে আজ? হায় নোবেল!

আমির-ফকির নাটকের সবচেয়ে বিস্ময়কর নায়ক বোধহয় পিয়ের দ্য রঁসার। ষোড়শ শতকে 'প্লেইয়াদ' গোষ্ঠীর নেতা এই ফরাসী কবি তাঁর জীবনকালে অতুল খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেন। শুধু ফ্রান্স নয়, সারা ইয়োরোপ তাঁকে কবিশ্রেষ্ঠরূপে বরণ করে। কিন্তু সপ্তদশ শতকের আরম্ভেই তাঁর প্রতি সবাই বিরূপ হয়ে যায়। এবং দুই শতাব্দীর অধিককাল তিনি বিস্মৃত হয়ে থাকেন। মাত্র গত শতাব্দীতে প্রভাবশালী রোমান্টিক লেখকরা সেই বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তাঁকে উদ্ধার ক'রে আবার তাঁর সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সমাদর ও অবহেলার এই অন্তহীন পালা আমাদের আরো আশ্চর্য করে এই কারণে যে, এরই সঙ্গে দেখা যায় বহু মহৎ প্রতিভা স্বকালেই স্বীকৃত হয়েছেন এবং সে-স্বীকৃতি আর প্রত্যাহৃত হয়নি। তাহলে ওলটপালটটা কেন ঘটে? আমার বিশ্বাস, সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনাই শুধু এ রহস্যের কিনারা করতে পারে। রঁসারের ক্ষেত্রে সেটা নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বলা যায়, সতেরো ও আঠারো শতকের ক্লাসিক আদর্শ, সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান, নৈর্ব্যক্তিক সত্যসন্ধান এবং যুক্তিবাদ রঁসার-যুগের ব্যক্তিগত আবেগ ও নিসর্গ-অনুভূতি থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং উনিশ শতকে রোমান্টিকরা আবার তা ফিরিয়ে আনেন। তাই এই উত্থান-পতন-পুনরুত্থান। মহত্ত্বের সুস্থির স্বীকৃতির ক্ষেত্রে হয়তো একথা বলা যায় যে, কোনো কোনো প্রতিভার বহুকোণ বিকিরণে এমন কিছু রশ্মি থাকে যা মানুষের গতানুগতিক মনকেও স্পর্শ করে, সুতরাং সে-প্রতিভার পূর্ণ

উপলব্ধি ভবিষ্যতের জন্যে জমা থাকলেও সমসাময়িক কাল তাকে স্বীকার ক'রে নেয়। এ ছাড়া, সাধারণভাবে বোধহয় এটুকু বলা যায় যে, নতুন ভাব বা ভাবনা এবং নতুন বাক্‌ভঙ্গি সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সমসাময়িক অভ্যাসে ঠিকমতো ধরা পড়ে না, ফলে স্বীকৃতির জন্যে তাদের অপেক্ষা করতে হয়। সমসাময়িক সমাদরের ঘটা এই মানসিক অবস্থারই আর এক দিক। যে-রীতিপদ্ধতি এবং চিন্তার গতির সঙ্গে মানুষ পরিচিত, এমনকি তা যদি যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায় তবুও, তাকে অভ্যর্থনা করতে তার বাধে না, যে-কারণে তুচ্ছও মহত্তের মর্যাদা পেয়ে যায়। বর্তমানকালে এই শোচনীয়তা আরো বিস্তৃত হয়েছে, কেননা মানুষের সাহিত্য-কৌতূহলী মনের পরিচালনায় নেমেছে প্রচারযন্ত্রের ক্ষমতা। এই বিভ্রান্তির আর এক উৎস শিল্পবোধহীন পণ্ডিতী আলোচনা, যা সাধারণত গতানুগতিকতারই এক গুরুগম্ভীর প্রকাশ। এ বিষয়ে নতুন ক'রে কিছু না বললেও চলে। ইতিপূর্বে, বিশেষত উনিশ শতকের ফ্রান্সে তুমুল বাদানুবাদ হয়েছে এ নিয়ে। বোদলের প্রমুখ অনেক কবি-সাহিত্যিক, প্রধানত নব কাব্যের যাঁরা শরিক তাঁরা, এই সাহিত্য-সমালোচনার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানিয়ে গিয়েছেন। এ সব বলার পরও কিন্তু রহস্য কিছু থেকেই যায়। গ্রহণ-বর্জনের আসল কারণ সব ক্ষেত্রে সঠিক বোঝা যায় না। সেজন্যে বোধ হয় আরো গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। নাকি আমার এক কবি-বন্ধুর মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে শেষ পর্যন্ত বলতে হবে: "সবই কপাল, বুঝলেন, কপাল"।

এই অবস্থার হাস্যকরতা উপলব্ধি ক'রেই, মনে হয়, বহু প্রতিভাবান স্রষ্টা খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে মুখ একেবারে ঘুরিয়ে নেন। বিশেষ ক'রে ফ্রান্সের লেখকদের মধ্যে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন বোদলের, মালার্মে, ভালেরি, সার্ত্র্ এবং আরো অনেকে। তাঁদের এই মনোভাব বিশদ আলোচনার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে আমার শুধু বারবার মনে ভেসে ওঠে র‍্যাঁবোর এক চলমান ছবি। মা'র বাড়ি রশ থেকে তিনি চলেছেন মার্সেইতে। অনেক বছর ধ'রে আফ্রিকা ও এশিয়া পর্যটনের পর এ তাঁর অন্তিম ভ্রমণ। মার্সেই-এর হাসপাতাল তাঁর গন্তব্য। প্যারিসের এক স্টেশনে নেমে শহরের মাঝখান দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে তিনি চলেছেন আর এক স্টেশনে ট্রেন ধরতে। গাড়ির জানলা দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে ছিলেন সেই রোগজর্জর সাঁইত্রিশ বছরের যুবক, যিনি উনিশ বছর বয়সে কবিতাকে বিসর্জন দিয়েছেন।

সেদিন প্যারিসের কেউ জানতে পারেনি কে গেল রাস্তা দিয়ে, অথচ সেই মুহূর্তে প্যারিসের তথা ফ্রান্সের সমগ্র সাহিত্য-জগৎ তাঁর নামে আলোড়িত, তাঁর প্রতিভার কীর্তনে মুখর, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তাঁর নিঃশব্দ অলক্ষিত গমনের পথে তার মৃদুতম রেশও তিনি শোনেননি, শুনতে চানও নি। তিনি তার আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন শুধু খ্যাতির দিক থেকেই নয়, কাব্যসাহিত্যের দিক থেকেও। অবশ্য এ বিদায় অন্য এক স্তরে, তবু সাহিত্যের সঙ্গে জড়ানো খ্যাতি-সমাদরের বন্ধন ছিন্ন করা তো বটে।

তবে এইসব লেখক ব্যক্তিগত গৌরবের প্রতি উদাসীন হয়েও অবশেষে গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কী বৈপরীত্য! কী অপরূপতা!

অভিনয়ের শিল্প-রহস্য

অভিনয় এক শিল্প যার ওপর আমার কোনো দখল নেই, যেমন অন্য অনেক শিল্পের ওপর নেই। কিন্তু অভিনয় সম্বন্ধে এমন কিছু প্রশ্ন আমার মনে দেখা দেয় যা অন্যগুলোর বেলায় দেখা দেয় না এবং আমি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত বোধ করি। অর্থাৎ ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় থেকে যায়। ভালো অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করে, বিচলিত করে, এবং অক্ষম অভিনয় দেখলে আমি প্রায় শারীরিক যন্ত্রণা পাই। এ থেকে বুঝতে পারি তার উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিষয়টা কত গুরুত্বপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট অভিনয় কত বড় শিল্প। কিন্তু দুটো জিনিষ আমার কাছে কিছুতেই স্পষ্ট হয় না, আমাকে সবসময় জিজ্ঞাসু ক'রে রাখে। একটা হল দিনের পর দিন অনেকের একসঙ্গে মহলা দেওয়া এবং অন্যটা হল পুনরাবৃত্তি।

সাহিত্যে এবং চিত্রকলায় এ দুটোর কোনোটাই নেই। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় লোকের সামনে উপস্থিত করবার আগে তার নিয়মিত অভ্যাসের কোনো প্রশ্নই সেখানে ওঠে না। চিত্রশিল্পে অবশ্য আঁকার কিছু কলাকৌশল শিখতে হয় লেখাপড়া শেখার মতো। কিন্তু তা শুধু শিক্ষণপর্বেই। ছাত্র যখন শিল্পীতে পরিণত হয় তখন তার এরকম অভ্যাস করার কোনো ব্যাপার থাকে না। কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত পূর্বাভ্যাস পরিণত শিল্পীর সক্রিয় শিল্পচর্চার অঙ্গ। এ বিষয়ে সঙ্গীত তার সঙ্গে খানিকটা তুলনীয়। তবে তুলনাটা বেশিদূর টানা যায় না। প্রথম থেকেই একটা ব্যাপারে এ দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থেকে যায়। অভিনয়ে কোনো নাটক নিয়ে দিনের পর দিন যে-মহলা দিতে হয় তা একলার নয়, সকলের একসঙ্গে। কিন্তু সঙ্গীতে কোনো গান বা বাজনার যে-অভ্যাস করতে হয়, তাকে একক সাধনা বলাই সঙ্গত। সেখানে আর কেউ নেই, নিজেকে নিয়ে শিল্পী একা। এদিক থেকে সঙ্গীত-শিল্পীর মিল বরং সাহিত্য-শিল্পী ও চিত্র-শিল্পীর সঙ্গে। অবশ্য অর্কেস্ট্রায় সকলে একত্রে মহলা দেওয়ার ব্যাপারটা আছে, কিন্তু সেখানেও অভিনয়ের সঙ্গে তার এমন এক পার্থক্য রয়েছে যাকে আরো বেশি মৌলিক বলা যায়। সে-পার্থক্য দ্বিমুখী। প্রথমত,

অর্কেষ্ট্রায় বিভিন্ন যন্ত্রীর পৃথক ব্যক্তিত্ব নেই, তারা সিম্ফনির সম্মিলিত রূপায়ণে বিলীন। কিন্তু অভিনয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব পৃথকভাবে স্পষ্ট এমন কি কাটা সৈনিকেরও। দ্বিতীয়ত, এক যন্ত্রীর কাজের প্রতিক্রিয়ায় অন্য যন্ত্রী তাঁর কাজের রূপ নির্মাণ করেন না। সেরকম প্রতিক্রিয়ার ভাবনা যদি থাকে, তবে তা থাকে অর্কেষ্ট্রার কণ্ডাক্টারের মস্তিষ্কে। মূল ভাবনাটা অবশ্য সঙ্গীত-রচয়িতার। নাটকের কণ্ডাক্টার হলেন পরিচালক। তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সমগ্র নাটকের তাৎপর্য প্রকাশের এবং অভিঘাত সঞ্চারের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত তাঁকেই সাহিত্যিক ও চিত্রকরের সঙ্গে তুলনীয় একক শিল্পকর্মী হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে অর্কেষ্ট্রার কণ্ডাক্টারের মতোই তাঁর কাজ অন্যের সৃষ্টিকে মূর্ত ক'রে তোলা। কিন্তু তিনি কণ্ডাক্টারের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন মনে হয়। কেননা স্বরলিপির নির্দেশের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীত-রচয়িতা যেভাবে সঙ্গীত-রূপায়ণে উপস্থিত থাকেন, নাট্যকার সেভাবে মোটেই থাকেন না। প্রকৃতপক্ষে নাট্য-রূপায়ণে তাঁর কোনো ভূমিকাই নেই, একমাত্র দৃশ্য-অঙ্ক বিভাগের এবং প্রবেশ-প্রস্থানের নির্দেশক শব্দগুলো আগে লিখে রাখা ছাড়া। এবং অনেক ক্ষেত্রে মঞ্চের নাট্য-রূপায়ণে যেভাবে তার অদল-বদল করা হয় তাতে নাট্যকারের জন্যে দুঃখই হয়। অর্থাৎ নাট্যকারের শিল্পী-সত্তার ওপর আধিপত্য করে পরিচালকের শিল্পী-সত্তা। তবে যে-ক্ষেত্রে নাট্যকার স্বয়ং থিয়েটার-দলভুক্ত অথবা থিয়েটার দলের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ আছে, সে-ক্ষেত্রে তাঁকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। অথবা যে-ক্ষেত্রে নাট্যকার লেখক হিসেবে খ্যাতিমান এবং শ্রদ্ধেয়, সে-ক্ষেত্রেও ঐ আধিপত্য খাটে না। তাঁর নাটকে কিছু অদলবদল যদি করাও হয়, তাঁর বিশিষ্টতা যাতে কোনোক্রমে ক্ষুণ্ণ না হয় এমনভাবে করা হয়। অর্থাৎ পরিচালকের মঞ্চ-ভাবনা নাট্যকারের সাহিত্য-ভাবনার ওপর আধিপত্য করতে পারে না। তখন তাঁর ভাষ্যকার-ভূমিকা অনেকটা অর্কেষ্ট্রার কণ্ডাক্টারের মতো।

মোট কথা, অন্যের এক বিশেষ ধরনের শিল্পকর্মকে ভিত্তি ক'রে নিজের এক অন্য ধরনের শিল্প সৃষ্টিই হল অভিনয়ের সারকথা। অবশ্য এই নির্ভরতা এমন নিবিড় যে, আমার ধারণায়, ভালো নাটক ছাড়া ভালো অভিনয়ের সুযোগ নেই, ভালো পরিচালনারও। আর এই অভিনয়-শিল্পের রূপ তৈরি হয় অনেকের সঙ্গে একত্রে ক্রমাগত অভ্যাস করার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ অন্যের বাক্য এবং আচরণের প্রতিক্রিয়ায় এর রূপ গ'ড়ে ওঠে। এবং পুনরাবৃত্তি এর অন্দরমহলে

যেমন, সদরমহলেও তেমন। বারবার অভ্যাস ক'রে যখন সকলের অভিনয় একটা নির্দিষ্ট সুসঙ্গত রূপ নেয়, তখন বারবার বাইরের লোকের সামনে সেই রূপায়ণ প্রদর্শন করা হয়। সাহিত্যে বা চিত্রকলায় তো এ জিনিষ নেই। সেখানে পুনরাবৃত্তি ব'লে কোনো কথাই নেই, বরং পুনরাবৃত্তির কোনো নিদর্শন সেখানে দোষাবহ। অবশ্য আমি একটা নির্দিষ্ট জিনিষের পুনরাবৃত্তির কথা বলছি, কোনো বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের পুনরাবৃত্তি বোঝাচ্ছি না। সেটা অন্য ব্যাপার। সঙ্গীতে অবশ্য পুনরাবৃত্তি আছে। কিন্তু সে-পুনরাবৃত্তি একক প্রদর্শনে (একজনের সঙ্গীত) অথবা একীভূত প্রদর্শনে (অর্কেস্ট্রা সঙ্গীত)। সঙ্গীতজ্ঞ একা যখন গান বা বাজান তখন তিনি নিজের সৃষ্টিতে বিভোর থাকেন, ভারতীয় রাগসঙ্গীতে তো প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টির কাজ চলে (improvisation)। অর্কেস্ট্রায় বোধহয় কণ্ডাকটার সঙ্গীত-রচয়িতার প্রেরণায় সৃষ্টিমগ্ন থাকেন।

অভিনয়ে এই যে একসঙ্গে অভ্যাস করা এবং একসঙ্গে প্রদর্শন করা এবং এই যে অন্যের সঙ্গে পারস্পরিকতায় রূপ গড়া, এতে শিল্প-অনুভবন কীভাবে হয় সেটাই আমার কৌতূহলের বিষয়।

দেখে দেখে আমার মনে হয় যৌথতা এই শিল্পের মূল ধর্ম। সেই যৌথতায় ব্যক্তিগত অবদানকে বিশিষ্ট করাই অভিনয়-ক্ষমতার আসল রহস্য। আর এক দিক থেকেও যৌথতার কথা মনে আসে। সেটা হল নাট্য-শিল্পের জনপ্রিয়তার দিক। সমগ্রভাবে অভিনয় এক যৌথ শিল্পরূপ ব'লে যৌথ সমাজ-জীবনের শরিক মানুষ আপনা থেকেই তার প্রতি এত আকৃষ্ট হয়। সেই কারণে আবার ব্যাপকতার একটা উপাদানও এই শিল্পে রয়েছে। অধিকাংশ লোকের মধ্যে অভিনয়ের প্রবণতা থেকেই তা বোঝা যায়। অভিনয় করার ও অভিনয় দেখার উদ্যম ও আগ্রহ সর্বসাধারণের মধ্যে যেমন পরিব্যাপ্ত, এমন আর কোনো শিল্পের ক্ষেত্রে নেই। যৌথতা ও ব্যাপকতার এই পটভূমিতে ব্যক্তিগতভাবে অভিনয়-শিল্পীর সত্তা অন্য শিল্পকর্মীদের তুলনায় কেমন ক'রে জাগে, সেটাই হল প্রশ্ন। আমাদের দেশে শুধু একজনই হয়তো তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য-চিত্রকলা-সঙ্গীত-অভিনয়ের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সত্যিই কি পারতেন তিনি? তাঁর সাহিত্যিক উপলব্ধি কি সমস্ত শিল্প-উপলব্ধিকে ভেদচিহ্নহীন ক'রে দিত না? যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ যখন আর নেই তখন আমাদের পক্ষে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা শোনা ছাড়া অন্য উপায় দেখি না।

সময় ও সাহিত্যের আরেক অধ্যায়

কালিঘাটের সদানন্দ রোডে আমাদের বাড়িতে খুব আড্ডা হত। ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ-সালাপের যেন বিরাম ছিল না। বাঁধাধরা মাপাজোকা কথা নয়, সবরকম হৈচৈ : গান, কবিতা, গল্প, রাজনীতি, সব। বিজন ভট্টাচর্য, আমাদের মুখে যার নাম ছিল গোষ্ঠ (আত্মীয় হলেও তার সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধুত্বের বলাই ঠিক), প্রায় রোজ আসত। সে এলেই শুরু হয়ে যেত গান আর মজাদার সব গল্প। তার গানের ক্ষমতা ছিল জন্মগত। তাকে দেখে তখন আমার মনে হত, সঙ্গীত-সত্তা বুঝি এমন মানুষকেই বলে। নিয়ম টিয়মের বালাই নেই, ভেতরের তাগিদে তার গলায় সুর আসত অনবরত। পরবর্তী জীবনে তার নাট্যকার-অভিনেতা পরিচিতিই অবশ্য বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গীতে একাগ্র থাকলে সেখানেও যে সে সৃজনী শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় দিত তাতে সন্দেহ নেই। ভাগ্যক্রমে তার এই শক্তির একটা নিদর্শন সে রেখে গিয়েছে তার "জীয়নকন্যা" গীতিনাট্যে।

পরে আমাদের আড্ডায় আরেক জন ঘন ঘন দেখা দিতেন। তিনি স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, ঋজু সরল মানুষ, সাহিত্যিক এবং সঙ্গীত নাট্যপ্রেমিক। আসতেন বিনয় ঘোষও। এর আরো পরে প্রায়ই আসতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং তার সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনেক সময়।

সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু ভাবনা চিন্তা তখনই আমাদের মধ্যে আরম্ভ হয়েছে। সাহিত্য এবং শিল্পকলা যে ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব এক সাধনার বস্তু, এটা আমরা বুঝতাম ; কিন্তু তা যে কৃত্রিম কিছু নয়, চারপাশের মানুষ এবং বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এ বোধটা ক্রমেই আমাদের মনে শিকড় গাড়তে থাকে। এর ফলে মানব সমাজ এবং তার বিপদ সম্বন্ধে এক চেতনাও এল আমাদের মধ্যে। এর একটা বিশেষ বাস্তব কারণও সে-সময় ঘটেছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধ সেই কারণ। আমরা ফ্যাশিজ্‌ম্‌-এর চেহারার একটা আন্দাজ পেলাম। ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদের চরম রূপ ফ্যাশিজ্‌ম্‌ কীভাবে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা গুঁড়িয়ে দেয়, তাদের অধিকার কেড়ে নেয়, তাদূর থেকে দেখা গেল

স্পেনের গৃহযুদ্ধে। ইয়োরোপের সাহিত্যিকরা, প্রকৃত সাহিত্যিক যাঁরা অর্থাৎ ফ্যাশিজ্ম্-এর ভাড়াটে লেখক নন যাঁরা, তাঁরা এই বিপদ সম্বন্ধে আমাদের আগেই অবহিত হন। কেননা তাঁরা ছিলেন একেবারে তার মুখোমুখি। রম্যাঁ রলাঁ ও আঁরি বারব্যুস ঐ বিপদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন "ফ্যাসিজম্ ও যুদ্ধ বিরোধী লীগ"। তাঁদের প্রস্তাবে আমাদের দেশে ঐ সংস্থার সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয় ১৯৩৭ সালে, সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ।

এর দু বছর পরেই বেধে গেল বিশ্বযুদ্ধ। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ আর সময় দিতে চাইছিল না। এবার ফ্যাশিজ্ম্-এর বিকট দানবমূর্তি হাঁ ক'রে এগিয়ে এল আমাদের সকলকে গিলে খেতে। আমরা নিঃসংশয়ে বুঝলাম, কোনো মানবিক মূল্যই আর রক্ষা পাবে না, সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি সবই এখন বিপন্ন শিল্পী-সাহিত্যিকরা যতই বাস্তবের দিকে চোখ বন্ধ ক'রে থাকুন না কেন, এই বাস্তব তাঁদের রেহাই দেবে না। এর আগেই অবশ্য সামাজিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের দশায় সাহিত্য-শিল্পের মানবিক মূল্য এবং মানুষের প্রতি তার অন্তর্নিহিত দায়িত্ব পুনরুজ্জীবিত করার অভিপ্রায়ে গঠিত হয়েছিল প্রগতি লেখক সঙ্ঘ।

আমাদের আড্ডার ভাবনাচিন্তাই আমাদের টেনে নিয়ে গেল প্রগতি লেখক সঙ্ঘের কর্মকেন্দ্র ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপরতলার এক ঘরে। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ ফ্যাশিস্ট বিপদ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করার এবং প্রতিরোধের মনোভাব তাদের উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে অতঃপর সঙ্ঘের নাম বদলে করা হয় ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের আর এক অমানবিকতা এই সময় আমাদের এই বাংলাদেশেই জনসাধারণকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর মুখে। সে হল ১৯৪৩-এর মন্বন্তর।

দেশ, পৃথিবী, মানুষ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের ভাবনা এই কেন্দ্রে যেন এক বৃহৎ সঙ্গ পেল। আমাদের কয়েকজনের সেই আড্ডা মিশে গেল এক মস্ত প্রবাহে। সরকারী ঠিকানা অবশ্য ছিল ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট, আসলে ঠিকানা ছিল সর্বত্র: কখনো ট্রামে, কখনো সদানন্দ রোডের বাড়িতে, কখনো বা অন্য কোথাও। মনে পড়ে, ধর্মতলার ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা দক্ষিণ কলকাতাবাসী কয়েকজন, যেমন বিজন, জ্যোতিরিন্দ্র, সুভাষ, স্বর্ণবাবু, আমি রাত্তিরে প্রায়ই একসঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসে ট্রামে বাড়ি ফিরতাম। গাড়ির মধ্যে চলত আমাদের যৌথগান, তখনকার সব বিখ্যাত গণসঙ্গীত। অবশ্য সুরে

বেহুদে। তবে তাতে আমাদের পরোয়া ছিল না। এবং প্রায়ই কণ্ডাক্টর মশায় আমাদের টিকিট কাটতে ভুলে যেতেন।

মিলবার জায়গাটা সব দিক থেকে পরিসর পাওয়ায় নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। দেখলাম শম্ভু মিত্রকে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে, সুধী প্রধানকে, চিন্মোহন সেহানবিশকে। দেখা মানে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আগেকার পরিচিত মানুষদেরও দেখলাম নতুন পটভূমিতে। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আগে থেকেই বিষ্ণু দের সঙ্গে আমার সংযোগটা ছিল ব্যক্তিগত সম্প্রীতির। এখন দেখলাম আমরা আরো গভীর আত্মীয়তায় রয়েছি। এই রকম।

যে-শিল্প এক সঙ্গে মিলে করতে হয় বা করা সম্ভব, তার চর্চাই স্বভাবত এবার জোরদার হল। অর্থাৎ অভিনয়, গান, আবৃত্তি। নাট্যাভিনয় নিয়ে ব্যাপৃত হলেন বিজন ভট্টাচার্য এবং শম্ভু মিত্র। গান নিয়ে বিনয় রায় এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। গল্প কবিতার লোকেরা রইলেন আশে পাশে, যেমন ছবির লোকেরা। তাঁরাও নিষ্ক্রিয় নন কেউ। তবে লেখকদের কেরামতি ছাপার হরফে, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগ তো হয় না। কবিতায় অবশ্য কিছু হতে পারে আবৃত্তি মারফৎ। তা এখানে হত। কিন্তু তার আবেদন কতখানি নির্ভর করছে কাব্যগুণের ওপর আর কতখানি কণ্ঠগুণের ওপর, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যেত। কিন্তু তা নিয়ে আমরা বিচলিত ছিলাম না। সকলের উৎসাহটাই ছিল বড় কথা। আর আমার মন তো আলাদা ক'রে ভাবতই না। যার স্বভাব থেকে যা আসে, সেটাই হোক। এবং যে-শিল্পের যেরকম সাড়া জাগানোর ক্ষমতা, সেইভাবেই তা প্রযুক্ত হোক। হওয়াটাই আসল।

থিয়েটারের প্রবণতা আমার নেই। তার কলাকৌশল নিয়ে মাথা ঘামানোর তাগিদ আমি অনুভব করি না। আমাব স্বভাবের বহু ঘাটতির মধ্যে এটা একটা। কারো কারো কথা বলা শুনেই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই, নাটক দেখার মতো তারিফ করতে ইচ্ছে করে। Berliner Ensemble-এর কীর্তিকলাপ আমি দেখিনি। কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কারণ ব্রেষ্‌ট্‌-এর নাটক প'ড়েই আমি অভিভূত হই। তবু আমি কিশোর বয়েস থেকেই অভিনয় দেখে আসছি এবং অসাধারণ অভিনয় কতবার যে আমাকে তছনছ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এটা বাইরে থেকে। বিজন ভট্টাচার্য বা শম্ভু মিত্র থিয়েটারের পদ্ধতিপ্রকরণে কী যুগান্তর আনছেন তা আলোচনা

করার বাসনা আমার হত না করার বাসনা আমার হত না। তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে তাঁরা যে আমার সঙ্গে একই প্রবাহে রয়েছেন, এটাই ছিল আমার কাছে প্রধান।

নাট্যই সবচেয়ে প্রবল শিল্পকর্ম। প্রত্যক্ষতার দিক থেকে। তারপরই বোধহয় যৌথ সঙ্গীত। বিজনের নাটক এবং জ্যোতিরিন্দ্রের গান অবলম্বন ক'রে এ-দুটোই শুরু হল প্রবলভাবে। বিজন লিখল প্রথমে "আগুন", তারপর "জবান বন্দী", তারপর "নবান্ন"। জ্যোতিরিন্দ্র লিখল "নবজীবনের গান"। মুষ্টিমেয় মানুষের ক্ষমতা লোভ, অর্থলোভ, আর দুর্নীতি যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের মূর্তি ধ'রে তখন আমাদের মেরে ফেলবার উপক্রম করেছে। কিন্তু বাঁচতে তো আমাদের হবেই। সেই ভীষণ বাস্তব এবং তার মধ্যে জীবনের সংগ্রাম তারা নাটকে ও গানে ফুটিয়ে তুলল। আমাদের বাড়ির আড্ডা তো ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড হয়ে গিয়েছিল, এখন নাটক আর গানের মহলার এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল আমাদের বাড়ি। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন সংসারে কর্তা, তাঁব এতে একটুও আপত্তি ছিল না। আমরা যে এই উদ্যমে জড়িত আছি তাই জেনেই তিনি সন্তুষ্ট। আমার স্ত্রীব ভগ্নীমণি (তৃপ্তি ভাদুড়ী, পরে মিত্র) তখন আমাদেব কাছে থাকত। থিয়েটার সম্বন্ধে তার দিদি শান্তির উৎসাহ ছিল খুব। বোনের যখন নাটকে পার্ট করবার কথা উঠল তখন দিদির পূর্ণ সমর্থন সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল। মণিকে আর ঠেকায় কে? তার অভিনয়-ক্ষমতা কতখানি তা আমাদের জানা ছিল না। আমাদের সঙ্গে তো সে অভিনয় করত না। কী ক্ষমতা তার ছিল তা তো সে সকলকে দেখিয়ে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত বলি, এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় বের হয় সাপ্তাহিক "অরণি", যার সঙ্গে আমরা একান্তভাবে যুক্ত হই। অনেকের নিশ্চয় স্মরণে আছে, অল্প দিনের মধ্যে প্রগতিমুখী সমাজ ভাবনা এবং সুস্থ সাহিত্য চেতনার কী শক্তিশালী বাহন হয়ে ওঠে এই পত্রিকা। বয়োজ্যেষ্ঠরা ছাড়াও প্রায় সমস্ত বিবেকবান তরুণ সাহিত্যিক তখন "অরণি"-কেই তাঁদের আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করেন। পরে বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন এমন অনেক কবির প্রথম রচনা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। কয়েক জনের নাম মনে পড়ছে: সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন।

সঙ্ঘের পক্ষ থেকে নাটক করার উৎসাহ এবং প্রয়োজন এমন বেড়ে চলল, যে, অচিরেই দেখা গেল, পাঁচমিশেলি সংগঠনের মধ্যে তা আর আঁটছে না। সুতরাং তৈরি হল গণনাট্য সঙ্ঘ। আমরা যারা নাটকের নই বা নাটক যাদের নয়, আমরা পৃথক হয়ে গেলাম। সরকারী ভাবে। আমার কাছে তাতে কোনো তারতম্য ঘটল না। কারণ আমার চেতনার একটা অংশ হয়েই তা রইল। এবং ব্যক্তিগত সংযোগগুলো একই থেকে গেল। শুধু শরীরটাকে ব'য়ে আর একটু দূরে হ্যারিসন রোড পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া, এই যা। ইতিমধ্যে বিজন লিখেছে "নবান্ন" এবং আমাদের তা প'ড়েও শুনিয়েছে। তার সেই আশ্চর্য পড়া যাতে পুরো নাটকটা চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠত। অতঃপর মহলা শুরু হল পুরোদমে। তৃপ্তি, শোভা সেন, গঙ্গাপদ বসু, চারুপ্রকাশ ঘোষ নাট্য জীবনে পাকাপাকি এসে গেলেন এইখানে। মহলার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের উপস্থাপনা সম্পর্কে সহযোগীদের সাহচর্যে চলল বিজন ও শম্ভুবাবুর কল্পনা পরিকল্পনা ভাবনা উদ্ভাবনা। দিনের পর দিন। সে যেন এক অজানা সমুদ্র যাত্রা। কিন্তু নাবিকদের চোখে নতুন তীরে পৌঁছবার সঙ্কল্প ছিল।

"নবান্ন"র প্রথম অভিনয়েই হুলুস্থুল। এমন বিষয়, এমন উপকরণ, এমন অভিনয় আগে আর কখনো দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে এক বিপ্লব। বিপ্লবই তখন থেকে নাট্যাভিনয় ব্যাপারটার মানেই যেন লোকের কাছে বদ্‌লে গেল। এই বৈপ্লবিক ঘটনাকে যাঁরা সম্ভব করেছিলেন, আমি তাঁদের উদ্দীপনার পরিমণ্ডলে ছিলাম। আমার কাছে তাই ঘটনাটা খুব স্বাভাবিক লেগেছিল।

তারপর অনেক বছর কেটে গিয়েছে। অনেক রকম উদ্যমের, অনেক রকম পরিবর্তনের সাক্ষী এতগুলো বছর। আমি নিজেও সেই উজ্জীবনের আবহাওয়া থেকে অপসৃত। চেনা মানুষদের আমি এই ব্যবধান থেকে কত বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিভিন্ন অবস্থায় দেখলাম। দেখে অনেক সময় আনন্দিত হয়েছি। সব সময় হয়েছি বলতে পারলে আমার আরো ভালো লাগত। কিন্তু আমি নিরুৎসাহ হইনি। বিপ্লব বলতে আমি বুঝি আরম্ভ। তারপরের চলাটা কখনোই সরল পথে এগোয় না। বিবিধ সাফল্যের সঙ্গে বিবিধ বিভ্রান্তি জড়িয়ে যায়। ইতিহাসের এটা নিয়ম। আরম্ভের আলোটা কিন্তু নেভে না। কখনো না। তার দিকে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকালে বেশ জোর পাওয়া যায়।